স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

ভগিনী নিবেদিতা
অনুবাদক—স্বামী মাধবানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

ভগিনী নিবেদিতার অমর গ্রন্থ 'The Master as I saw Him'-এর স্বামী মাধবানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ 'আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ (যেমনটি দেখিয়াছি)' এই নামে উদ্বোধন-এর ১৩২২, আষাঢ় হইতে ১৩২৪, চৈত্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। নানা কারণে উহা এতদিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অনুবাদেরই ঈষৎ সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ। কেবল ইহার নূতন নামকরণ হইল, 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'।

শ্যামাপূজা, ১৩৬১ প্রকাশক

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সহজপাঠ্য করিবার জন্য এই সংস্করণে কোথাও কোথাও ভাষার সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে।

১ বৈশাখ, ১৩৭১ প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম	পরিচ্ছেদ	—লণ্ডনে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে	...	১
দ্বিতীয়	”	—লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে	...	১০
তৃতীয়	”	—বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষ	...	২৩
চতুর্থ	”	—স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ	...	৩৪
পঞ্চম	”	—উত্তরভারত ভ্রমণ	...	৫২
ষষ্ঠ	”	—জীবের চৈতন্যদাতা	...	৫৯
সপ্তম	”	—তত্ত্বালোকের ঝলক	...	৬৪
অষ্টম	”	—অমরনাথ	...	৭০
নবম	”	—ক্ষীরভবানী	...	৭৪
দশম	”	—কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত-পরিবার	...	৮১
একাদশ	”	—শক্তিপূজা ও স্বামীজী	...	৯৪
দ্বাদশ	”	—অর্ধ পৃথিবী অতিক্রম	...	১০১
ত্রয়োদশ	”	—মহাপুরুষদর্শন প্রসঙ্গে	...	১০৯
চতুর্দশ	”	—ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ	...	১১৪
পঞ্চদশ	”	—হিন্দুধর্ম	...	১২০
ষোড়শ	”	—পাশ্চাত্যদেশে স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন	...	১২৯
সপ্তদশ	”	—স্বামীজী-প্রচারিত মতসমূহের সমষ্টিভাবে আলোচনা	...	১৩৬
অষ্টাদশ	”	—স্বামীজী বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন	...	১৫০
ঊনবিংশ	”	—ঐতিহাসিক খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী	...	১৬৩
বিংশ	”	—নারীজাতি ও জনসাধারণ	...	১৬৯
একবিংশ	”	—পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান-প্রণালী	...	১৮২

দ্বাবিংশ	”	—সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য	...	১৯৪
ত্রয়োবিংশ	”	—তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্যদেবের সম্বন্ধ	...	২০৬
চতুর্বিংশ	”	—মৃত্যুসম্বন্ধে স্বামীজীর শিক্ষা	...	২১৪
পঞ্চবিংশ	”	—সমাধি	...	২২৬
ষড়বিংশ	”	—স্বামীজীর মহাসমাধি	...	২৩৭
		উপসংহার	...	২৪৩

পাশ্চাত্য পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন

বৌদ্ধধর্মের প্রচারযুগের অবসান হইবার পর হইতে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর বেশে শিকাগো প্রদর্শনীর অন্তর্গত ধর্মমহাসভার মঞ্চে দণ্ডায়মান হন, সেদিন পর্যন্ত হিন্দুধর্ম নিজেকে প্রচারশীল ধর্ম বলিয়া ভাবে নাই। হিন্দুধর্মের শিক্ষকতা-কার্যই যাঁহাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল, সেই ব্রাহ্মণগণ ছিলেন নাগরিক ও গৃহস্থ এবং সেজন্য হিন্দুসমাজেরই এক অঙ্গস্বরূপ ছিলেন, ফলে সমুদ্রযাত্রার অধিকার হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। আর সিদ্ধপুরুষ বা অবতার পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ অপেক্ষা যতটা উচ্চে অবস্থিত, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চতম অধিকারী, প্রামাণ্য হিসাবে যদিও তাঁহাদের স্থান ব্রাহ্মণজাতি অপেক্ষা ঠিক ততটাই উচ্চে—তথাপি তাঁহারা স্বাধীনতার ঐ প্রকার ব্যবহারের কথা আদৌ ভাবিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দও নিজ বিশ্বস্ততাজ্ঞাপক কোন পরিচয়-পত্র লইয়া শিকাগোর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন নাই। যেমন তিনি ভারতের এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, ঠিক তেমনভাবেই তাঁহার মাদ্রাজের জনকয়েক অনুরাগী ও শ্রদ্ধাবান শিষ্যের আগ্রহে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে আগমন করেন। আমেরিকাবাসিগণও স্বজাতিসুলভ আতিথ্য ও সরলতাগুণে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণপূর্বক বক্তৃতা দিবার সুযোগ দেন। যেমন বৌদ্ধপ্রচারকগণের ক্ষেত্রে, তেমন তাঁহার ক্ষেত্রেও এক মহাপুরুষের শক্তিই তাঁহাকে জোর করিয়া বিদেশে প্রেরণ করে—যে মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে বহু বৎসর বাস করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সঙ্গিস্বরূপ হইয়াছিলেন। তথাপি পাশ্চাত্যদেশে তিনি কোন বিশেষ আচার্যের কথা বলেন নাই, কোন এক সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ঘোষণা করেন নাই। "হিন্দুগণের ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধারণাবলী"—ইহাই ছিল তাঁহার শিকাগো বক্তৃতার বিষয়; এবং ইহার পরেও, যে সকল তত্ত্ব বহু অংশে বিভক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের সাধারণ সম্পত্তি এবং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, কেবল সেইগুলিই তাঁহার বক্তৃতায় স্থান পাইত। সুতরাং ইতিহাসে এই প্রথম একজন অতি উচ্চদরের

মনীষাসম্পন্ন হিন্দু, অন্য সকল বিষয় পরিহারপূর্বক হিন্দুধর্মকেই বিশ্লেষণ ও উহার বিশ্লিষ্ট-অংশগুলির সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করিতে যত্নপর হন।

স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত আমেরিকায় অবস্থান করেন এবং তারপর প্রথমবার ইউরোপে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হন এবং প্রায় একমাস পরে লণ্ডনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে

মনে করিলে আশ্চর্য বোধ হয়, কিন্তু নিশ্চিতই আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী তাঁহার ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড-আগমনকালে—উভয়বারই আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তথাপি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে ভারতে আসিবার পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অতি অল্পই জানিতাম; এমনকি কিছুই জানিতাম না বলিলেও চলে। সৌভাগ্য, কেন না এই পূর্ব পরিচয় না থাকার ফলেই আমি মানসনেত্রে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যে স্বতঃ প্রকাশ ঘটিত তাহার প্রতি পদে, ভারতীয় অরণ্য, নগর ও রাজপথরূপ যথার্থ পরিবেশের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাই—প্রাচ্য আচার্যকে প্রাচ্য জগতের আবেষ্টনীর মধ্যেই দেখিয়া থাকি। এমনকি সুদূর লণ্ডনেও যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি, এখন ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত যেরূপ আলোড়িত হয়, সূর্যালোকমণ্ডিত স্বদেশের বহু স্মৃতিপরম্পরা তাঁহার চিত্তও সেইরূপ আলোড়িত করিয়া থাকিবে। সময়টি ছিল নভেম্বর মাসের এক রবিবারের শীতল অপরাহ্ণ। স্থান ওয়েস্ট-এণ্ডের এক ড্রইংরুম। অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ছিল কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি। আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে উত্তরটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন গোধূলি ও অন্ধকারের মিলন-সম্ভূত সেই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই ভারতের কোন উদ্যানে, অথবা সূর্যাস্তকালে কূপের নিকটে, কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সাধু এবং তাহার চারিদিকে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ—এইরূপ এক দৃশ্যেরই কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডে আচার্য হিসাবে স্বামীজীকে আমি আর কখনও এমন সাদাসিধা ভাবে দেখি নাই। পরবর্তী কালে তিনি সর্বদাই বক্তৃতা দিতেন; অথবা প্রশ্নাদির উত্তর দিতেন। প্রশ্নগুলি সমাগত বহু সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ম-মাফিক উত্থাপন করিতেন।

কেবল এই প্রথমবারেই আমরা মাত্র পনর-ষোল জন অভ্যাগত ছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বামীজী আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন—তাঁহার পরিধানে ছিল গৈরিক পরিচ্ছদ ও কোমরবন্ধ—যেন তিনি আমাদের নিকট কোন্ এক দূর দেশের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত অভ্যাস মতো 'শিব! শিব!' বলিয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার প্রশান্ত আননে বিরাজ করিতেছিল কোমল ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ভাবের সংমিশ্রণ—যাহা সাধারণতঃ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের মুখমণ্ডলে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঐ ভাবই র‍্যাফেল তাঁহার দিব্য শিশুর (Sistine Child-এর[১]) ললাটে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

সে অপরাহ্নের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবং সেদিনকার কথাবার্তার একটু আধটু মাত্র এখন মনে পড়িতেছে। কিন্তু সেই বিস্ময়কর প্রাচ্য সুর সংযোগে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক তিনি আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিবার নহে; ঐ সুরের ঝঙ্কার আমাদের গীর্জায় প্রচলিত গ্রেগরি[২]-প্রবর্তিত সুরের কথা এত মনে করাইয়া দেয়, অথচ উহা হইতে কত ভিন্ন!

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতে তিনি বেশ আগ্রহী ছিলেন, এবং একটি প্রশ্নের উত্তরে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার পাশ্চাত্যে আগমনের কারণ হইল—তিনি বিশ্বাস করেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বর্তমানে যেরূপ পণ্যদ্রব্যের বিনিময় চলিতেছে, ঐরূপ পরস্পরের মধ্যে আদর্শের আদান-প্রদানেরও সময় আসিয়াছে। এই সময় হইতে বরাবর কথাবার্তা বেশ সহজভাবে চলিয়াছিল। তিনি প্রাচ্যের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-রূপ অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বিবিধ ইন্দ্রিয়জ্ঞান এক অদ্বিতীয় সত্তার বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিলেন, এবং গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিলেন—"ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"—সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় এই সকল আমাতে অবস্থিত।

---

১ এই বিখ্যাত চিত্রখানির মধ্যস্থলে শিশু ঈশা ও তাঁহার জননী মেরীর জ্যোতির্মণ্ডিত মূর্তি, বামে সেন্ট সেক্টাসের, দক্ষিণে সেন্ট বারবারাব, এবং নিম্নে দুইটি দেব শিশুর মূর্তি অঙ্কিত আছে। বর্তমানে চিত্রটি ড্রেসডেনে।

২ পোপ প্রথম গ্রেগরি—ইনি খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

তিনি আমাদের বলিলেন, খ্রীস্টধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মেও প্রেমই ধর্মভাবের চরম উৎকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

তিনি আরও বলিলেন, হিন্দুগণ মনে করেন, শরীর ও মন এক তৃতীয় পদার্থ আত্মার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই বিষয়টি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, যাহার ফলে পরবর্তী শীতকালে আমি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করি।

তিনি বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছিলেন এবং আমার মনে আছে, তিনি শান্তভাবে এই কয়টি কথা বলেন, "বৌদ্ধগণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।" সুতরাং এই হিসাবে বৌদ্ধধর্ম ছিল আধুনিক অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism-এর) সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী। বরং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মনেরই খেয়াল মাত্র, অতএব অনুমানও তাহাই, এইরূপ সন্দেহ অজ্ঞেয়বাদের মূলমন্ত্র বলিয়া অজ্ঞেয়বাদ অনেকটা হিন্দুধর্মেরই সদৃশ।

আমার মনে আছে, তিনি বিশ্বাস (faith) শব্দটিতে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং উহার পরিবর্তে প্রত্যক্ষানুভূতি (realisation) শব্দটি ব্যবহার করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি ভারতের একটি প্রবাদ উদ্ধৃত করেন, "কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু উহার গণ্ডির মধ্যেই মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর।"

আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ এই প্রসঙ্গেই পুনর্জন্মবাদও আলোচিত হইয়াছিল। বোধহয় তিনি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনটিকে আত্মজ্ঞান লাভের তিনটি উপায় বলিয়া উল্লেখ করেন। আমার বেশ মনে আছে, তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া মানবের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে বলেন এবং ঘোষণা করেন, সকল ধর্মের একমাত্র শিক্ষা এই—"ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।"

তিনি এই ভাবের দু-একটি কথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে উচ্চতম ধর্মের সহিত পুরোহিত ও মন্দিরাদির কোন সম্পর্ক নাই, এবং তাঁহার দেশের সর্বোচ্চ ধার্মিক ব্যক্তির নিকট স্বর্গকামনা 'কতকটা নিম্নস্তরের' বলিয়াই বিবেচিত হয়।

আত্মার মুক্ত স্বভাবরূপ আদর্শ তিনি নিশ্চয় উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। মানব-সেবাই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া পাশ্চাত্যে আমাদের যে ধারণা, তাহার সহিত তাঁহার মতের আপাতবিরোধও ঘটিয়াছিল। কারণ আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, সেদিন অপরাহ্ণে তিনি সর্বপ্রথম 'সোসাইটি' (society) শব্দটি এমন

এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহা আমি কখনও সঠিকরূপে বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি না। যতদূর মনে পড়ে, তিনি পূর্বোক্ত আদর্শটির উল্লেখ করিয়াই আমাদের দিক হইতে যে সকল প্রতিবাদ উঠিবার সম্ভাবনা তাহা অনুমান করিয়া বলেন, "আপনারা বলবেন এতে সমাজের কোন উপকার হয় না। কিন্তু এই আপত্তি স্বীকার করে নেবার পূর্বে আপনাদের প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, সমাজের স্থায়িত্ব জিনিসটা স্বয়ং একটি উদ্দেশ্যস্বরূপ।"

ঐ সময়ে আমি মনে করিয়াছিলাম, 'সোসাইটি' (সমাজ) অর্থে তিনি সমগ্র মানবজাতির উল্লেখ করিতেছেন, এবং বিচার করিয়া দেখিলে শেষ পর্যন্ত জগৎ নশ্বর, অতএব জগতের উপকারের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাও নশ্বর—এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এই অর্থই কি তাঁহার অভিপ্রেত ছিল ? তাহা হইলে মানবসেবাই যে চিরকাল তাঁহার জীবনব্রত ছিল, তাহার সহিত এই মতের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে ? অথবা, তিনি শুধু একটি ভাবমাত্র বর্ণনা করিতেছিলেন এবং নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঐ ভাবটিকে যতদূর সম্ভব সমর্থন করিতেছিলেন ? অথবা, তাঁহার 'সোসাইটি' শব্দটি সেই অদ্ভুত প্রাচ্যদেশীয় 'সমাজ' শব্দের একটি ভুল অনুবাদমাত্র ? প্রাচ্যে 'সমাজ' বলিলেই তাহার সহিত ঈশতন্ত্র শাসনের[১] কিছু কিছু বুঝায়, এবং অন্য নানা ভাবের সঙ্গে আমাদের দেশে 'চার্চ' বা যাজকসম্প্রদায়ের শাসন সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পরিব্রাজক আচার্য হিসাবে তাঁহার নিজের পদমর্যাদা কি, এই প্রশ্নেরও তিনি কিছু আলোচনা করেন, এবং বলেন, ধর্মসঙ্ঘ সম্পর্কে অথবা একজনের কথায় বলিতে গেলে, "যে ধর্মমত সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ (পরিণতি লাভ করে), তাহার সম্পর্কে ভারতের তেমন আস্থা নাই।" তিনি বলেন, "আমাদের বিশ্বাস 'সঙ্ঘ' থেকে চিরকালই নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, ঐ সময়ে পাশ্চাত্যে বহুল প্রচলিত কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায় কাঞ্চনাসক্তিবশতঃ অচিরে বিনষ্ট হইবে। তিনি ঘোষণা করেন—মানুষ সত্য হইতেই সত্যে অগ্রসর হইয়া থাকে, মিথ্যা হইতে সত্যে নহে।

বস্তুতঃ এই মূল সত্যটিকেই তিনি সর্বদা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে প্রচার করিতেন যে, সকল ধর্মই সমভাবে সত্য, এবং আমাদের পক্ষে কোন অবতারের

---

১ ঈশতন্ত্র শাসন (Theocracy)—যে রাজ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা তৎপ্রতিনিধি যাজকগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এ মতে রাজ্যের আইনগুলি মানব কর্তৃক প্রণীত নহে, পরন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বরাদেশ।

বিরুদ্ধ-সমালোচনা অসম্ভব, যেহেতু অবতারগণ সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এই স্থলে তিনি গীতার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন—

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।"

অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ, এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

এই 'হিন্দু যোগী'-কে (লণ্ডনে তিনি যে নামে অভিহিত হইতেন) দেখিবার জন্য আমরা যে কয়জন আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহারও ধর্মে তেমন আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। স্বামীজীর বামপার্শ্বে বসিয়াছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বংশের এক বৃদ্ধা মহিলা ফ্রেডারিক ডেনিসন মরিসের[১] শিষ্যা ও বন্ধু। অগ্রণী হইয়া তিনিই মার্জিত শিষ্টাচারের সহিত প্রশ্নাদি করিতেছিলেন। বোধ হয়, ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কম উদারভাবাপন্না। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং এবং অপর দুই-একজন, মনস্তত্ত্বই যে ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র—এই প্রচলিত আধুনিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেদিন অপরাহ্ণে আমাদের মধ্যে অনেককেই বাছিয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল যেহেতু আমরা সহজে কোন ধর্মমতে আস্থা স্থাপন করিবার বিরোধী ছিলাম এবং ধর্মপ্রচার ব্যাপারে যে কিছু সত্য থাকিতে পারে, সে বিষয়ে প্রত্যয় জন্মানো ছিল কঠিন। আমার এখন মনে হয়, সেদিন সেই সাক্ষাৎকারের শেষে বক্তা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ দম্ভ ও উদাসীনতার সহিত নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার একমাত্র কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে এই বলিয়া যে, অবিবেচনা-প্রসূত অনুরাগ যাহাতে হৃদয় অধিকার না করে সেজন্য সর্বদা বিচারবুদ্ধিকে বাঁচাইয়া চলিবার অভ্যাস। বিদায় লইবার পূর্বে গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা এক এক করিয়া অভিযোগ করিলাম, "নূতনত্ব কিছুই নেই"—কেহ না কেহ এই সব বিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছেন।

---

১ John Frederick Danison Maurice (১৮০৫-১৮৭২)—বিখ্যাত ইংরেজ ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাতা অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। নিজ প্রখরবুদ্ধি, চরিত্রবল ও নির্যাতিতগণের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতিবশতঃ ইনি লণ্ডনের সামাজিক জীবনে ও পণ্ডিতমহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন—অনুঃ

কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, সেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে আমার নিকট ইহা প্রতিভাত হইল যে, এক অপরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত, এক নূতন ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া কেবল অনুদারতার পরিচয় নহে, পরন্তু উহা অন্যায়। আমার মনে হইল, ইনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কথা পূর্বে আমি শুনিয়া অথবা ভাবিয়া থাকিতে পারি ; কিন্তু এ পর্যন্ত যাহা কিছু আমার নিকট শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে, সে সমস্ত মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার জীবনে ঘটে নাই। সুতরাং স্বামীজীর লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার যে দুইটি মাত্র সুযোগ মিলিয়াছিল, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম।

অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আমাদের মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে, বার বার শ্রবণে তাহা বর্ধিত ও গাঢ় হয়। সেইরূপ, সেই বক্তৃতা দুইটির লিপিবদ্ধ সারাংশ এখন পড়িতে পড়িতে, তখনকার অপেক্ষা বহুগুণ বিস্ময়কর মনে হইতেছে। কারণ, তখন আমি আচার্যদেবের নিকট যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করিতাম, তাহাতে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল, পরে তাহার জন্য আমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। যখন তিনি বলিতেছিলেন, "জগৎ হইল মাকড়সার জালের মতো, এবং মনগুলি সব মাকড়সা ; কারণ মন এক, আবাব বহু"—তখন তিনি এরূপ ভাষায় কথা বলিতেছিলেন, যাহা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। তাঁহার বক্তৃতা আমি টুকিয়া লইয়াছিলাম, ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই; মানিয়া লওয়া দূরের কথা। তাঁহার উপদেশাবলী আমি কি ভাবে গ্রহণ করিতাম ইহাই তাহার সঠিক বর্ণনা ; এমনকি, পর বৎসরেও যখন তাঁহার ঐবারকার সমুদয় বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি—কেবল তাহা কেন, বলা চলে, যেদিন আমি ভারতে পদার্পণ করি, সম্ভবতঃ সেইদিন পর্যন্ত, আমার এইরূপ মনোভাবই ছিল।

স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে এমন বহু বিষয় ছিল, যাহার সত্যতা শ্রবণমাত্রেই সকলের বোধগম্য হইত। যেমন, সাধারণতঃ যেভাবে সত্য বলিয়া দাবি করা হয়, কোন ধর্মই সেভাবে সত্য না হইলেও সকল ধর্মই এক হিসাবে সমভাবে সত্য—এই মতটিকে আমাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যখন তিনি বলিলেন, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিরাকার, কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপ কুহেলিকার মধ্য দিয়া

দেখার জন্য তিনিই সাকাররূপে প্রতিভাত হন, তখন ভাবটির সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলাম। যখন তিনি বলিলেন, কোন কার্যের পশ্চাতে অবস্থিত ভাবটি ঐ কার্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী, অথবা যখন তিনি নিরামিষ-ভোজনের প্রশংসা করিলেন, তখন আমরা ভাবিলাম, সহজেই উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে তাঁহার সমগ্র মতবাদকেই আমি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। জগতের কতকগুলি ধর্মমত এইরূপ যে, যদি কেহ প্রথমে ঐগুলি মানিয়া লয়, তবে পরে নিশ্চিতই তাহাকে উহাদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অবশেষে পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার মনে হইল, স্বামীজীর ধর্মমতও ঐরূপ ধর্মমতের অন্যতম। আর এইভাবে মত পরিবর্তনের ফলে কতটা যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিলে আর কেহ ওপথে অগ্রসর হইতে চাহে না।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই সকল কথা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। স্বামীজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্বেই এমন দিন আসিয়াছিল, যখন আমি তাঁহাকে 'গুরুদেব' (Master) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন তাহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই আনুগত্য স্বীকার শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই। আমি দেখিতে পাইলাম যে, ধর্মোপদেষ্টারূপে জগৎকে দিবার জন্য তাঁহার একটি স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু যদি তিনি অন্য কোথাও সত্যের প্রকাশ দেখেন, তাহা হইলে মুহূর্তের জন্যও তিনি ঐ মতবাদের কোন অংশ সমর্থন করিবেন না। আর এই বিষয়টি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ততদূর পর্যন্তই আমি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম। বাকি যাহা কিছু, তাহার জন্য আমি তাঁহার উপদেশাবলী বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার প্রচারিত তত্ত্বের মধ্যে কোন অসংলগ্ন ভাব নাই; কিন্তু হাতে-কলমে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমি চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। আর যদিও তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্যে আমি অতীব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, তথাপি আমার পরিচিত যেকোন চিন্তাশীল বা প্রতিভাবান ব্যক্তির এবং তাঁহার মধ্যে চরিত্রবিকাশের দিক দিয়া যে বিপুল পার্থক্য আমি পরে দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করি, ঐ সময়ে তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই।

ক্লাসের অপর সকলে আমার এই সন্দেহের ভাব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান এক শিষ্য বহু পরে স্বামীজীর সমক্ষে এই বিষয় লইয়া

আমাকে পরিহাস করিয়া বলিতেছিলেন যে, তিনি কিন্তু বরাবরই স্বামীজীর মুখে শোনা প্রত্যেকটি কথা মানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামীজী সে সময়ে এই কথাবার্তায় কোন মনোযোগ দেন নাই বলিলেই হয়. কিন্তু পরে এক সুযোগে আমাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "কেহ যেন এই ভেবে দুঃখ না করে যে, তাকে বোঝাবার জন্য অপর কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে। আমি দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে আমার গুরুদেবের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, ফলে পথের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে।"

এই প্রথম কথাবার্তার মধ্যে দুই-একটি বিষয় স্মৃতিপটে স্পষ্টভাবে জাগ্রত আছে। এককালে খ্রীস্টধর্ম বলিতে আমি বুঝিতাম ঈশ্বরকে জগৎপিতা জ্ঞানে উপলব্ধি করা। কিন্তু বহুকাল এই ভাবের উপাসনায় বিশ্বাস হারাইবার ফলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম। ঐরূপ ধারণার বাস্তব সত্যতা বা অসত্যতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ধারণা বা কল্পনা হিসাবে ইহার মূল্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কারণ আমি অনুমান করিয়াছিলাম, যাহারা ঐরূপ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের চরিত্রের উপর এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের সভ্যতার উপরেও উহা নিজের একটি প্রভাব বিস্তার করিবে। তুলনা করিয়া দেখিবার উপাদানের অভাববশতঃ বিষয়টি আমি বেশি দূর অনুধাবন করিতে পারি নাই। আর, আশ্চর্যের বিষয়, এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, যিনি আমাদের নিকট পাঁচরকম উপাসনা-প্রণালীর কথা বলিলেন, যাহাতে ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা বা ধারণা করা হইয়া থাকে। তিনি এমন একটি ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন যাহার প্রথম সোপান হইল ধর্মভাবগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা।

কয়েকটি ভারতীয় ভাবের নূতনত্ব ও গাম্ভীর্যে আমি বিশেষ আকৃষ্ট হই—ঐ সকল ভাবের সহিত আমার এই প্রথম পরিচয়। বস্তুতঃ রূপকের অন্তর্গত নূতনত্ব ও চিন্তাপ্রণালীর ভিন্ন গতি যেন সম্পদ বলিয়া মনে হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সাধুর গল্পটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক চোর—ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া ভয়ে চুরিকরা বাসন-পত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, আর সাধুটি সেই সব লইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেছেন। অবশেষে তাহার পায়ের নিকট সমস্ত জিনিসগুলি রাখিয়া সজলনয়নে সাধু বলিলেন, "প্রভু, আমি জানতাম না আপনি ওখানে ছিলেন। এসব জিনিস আপনার, গ্রহণ করুন। সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করুন।" সেই সাধুটির সম্পর্কেই আর একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গোখুরা সাপের দংশন হইতে রাত্রিকালে যখন তিনি

আরোগ্যলাভ করেন তখন এই বলিয়া উহার বর্ণনা দেন, "প্রিয়তমের নিকট থেকে দূত এসেছিল।" মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনে জগৎ সম্বন্ধে স্বামীজী অনুমান দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহার কথাও বলা যাইতে পারে। পনর দিন ধরিয়া মরীচিকা দর্শন করেন এবং সর্বক্ষণই উহা জল বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। কিন্তু একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া জল ভাবিয়া উহা পান করিতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন উহা মিথ্যা। ইহার পর পুনরায় পনর দিন ধরিয়া ঐ মরীচিকা দেখিতে পাইলেও বরাবরই তিনি উহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতেন। যে উপলব্ধির ফলে তাঁহার এই অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, যে দর্শনের ফলে এই মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা ও জীবনযাত্রা এই উভয়ের মধ্যে তিনি একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন, তাহা বুঝিতে পারাই একটা যথার্থ শিক্ষা!

কিন্তু স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে এই দুইটি ব্যতীত আর একটি তৃতীয় জিনিস ছিল—যাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং সেজন্যই আমার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। উচ্চ উচ্চ ভাবের ব্যাখ্যাতা বহু বক্তাকে ধর্মমন্দিরের বেদী হইতেও বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি—স্বামীজী ঠিক তাঁহাদের মতো একজন বক্তা মাত্র ছিলেন না, তাহা আমি সহজেই ধরিতে পারিয়াছিলাম। ধনী ও অলস উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের তৃপ্তির জন্য তাহাদের সামনে কাব্য ও তর্কযুক্তির সৌখীন খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপিত করা স্বামীজীর একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না। খ্রীস্টধর্মের একজন নগণ্য প্রচারক অথবা 'মুক্তিফৌজের' (Salvation Army) কোন কর্মচারী যেমন জগতের সকল নরনারীকে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন, অন্ততঃ তাঁহার নিজের দিক দিয়া চিন্তা করিলে স্বামীজী ঠিক সেইরূপ একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবেই সকল নরনারীকে ধর্মের নামে আহ্বান করিতেছিলেন। তথাপি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'পাপ একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র' তাঁহার এই ঘোষণার কথা বলিতেছি না। এইরূপ একটি মতবাদ কোন জটিল ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার অঙ্গমাত্র হইতে পারে তাহা আমার জানা ছিল। 'কেহ আমাদের জামা চুরি করিলে আলখাল্লাটিও তাহাকে দেওয়া উচিত' এই মতবাদ আমাদের নিকট যতটা সত্য, বাস্তব জগতে পূর্বোক্ত মতটি উহার ব্যাখ্যাতার নিকট ততটাই সত্য। তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয় অল্পবয়স্কা জননী। রাস্তায় তাঁহাদের সামনে সহসা একটি বাঘ আসিয়া পড়িলে তাঁহারা কিরূপ ভীত হইয়া পলায়নে তৎপর হইবেন, সেই কথা তিনি বলিতেছিলেন। হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মনে কর, একটি শিশু বাঘটার সামনে পড়েছে;

তখন তোমরা কোথায় থাকবে বল দেখি? বাঘের মুখে—তোমাদের প্রত্যেকেই—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

সুতরাং সেই শীতকালে স্বামীজী ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করিবার পর, আমি তাঁহার সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিতাম। প্রথমতঃ তাঁহার উদার ধর্মবিষয়ক-শিক্ষা; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ভাবগুলির মধ্যে যে যুক্তিবিচার ছিল, তাহার অপূর্ব নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য; তৃতীয়তঃ তাঁহার আহ্বান ছিল মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর তাহার প্রতি এবং কোন ক্রমেই তাহার নিকৃষ্ট ভাবগুলির প্রতি নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে

পর বৎসর এপ্রিল মাসে স্বামীজী লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেন্ট জর্জেস রোডের যে বাড়িতে তিনি তাঁহার সদাশয় বন্ধু মিঃ ই. টি. স্টার্ডির সহিত বাস করেন, সেখানে ও গ্রীষ্মাবকাশের পর পুনরায় ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের নিকট এক বৃহৎ ক্লাসরুমে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দেন। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার ও মিস এইচ্. এফ. মুলারের সহিত ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজর্লণ্ডে ভ্রমণ করেন। ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন শিষ্যসহ রোম হইয়া তিনি ভারত যাত্রা করেন এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী সিংহলের অন্তর্গত কলম্বো শহরে উপনীত হন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর অধিকাংশ পরে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া সকলে অবগত হইতে পারেন, জগৎকে তাঁহার কি দিবার ছিল এবং কিরূপে উহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, যাহাতে সকলের বোধগম্য হয়।

ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজ করেন—হিন্দুগণের এই যে বিশ্বাস, তাহারই প্রচারকরূপে স্বামীজী আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মের (gospel) সত্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনি সকলকে উহা পরীক্ষা করিয়া লইতে আহ্বান করেন। তখনই বা কি, আর পরেই বা কি, আমি তাঁহাকে কখনও শ্রোতৃবর্গের নিকট কোন বিশেষ ধর্মমতের পক্ষ সমর্থন করিতে শুনি নাই। বক্তব্য বিষয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে গিয়া তিনি অসঙ্কোচে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (sects) উল্লেখ করিতেন—উহাদিগকে 'সম্প্রদায়' না বলিয়া বিভিন্ন ধর্মমত (churches) বলিলেই ভাল হয়। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীতে যে দর্শন সমুদয় ধর্মমতের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা ব্যতীত তিনি অপর কিছু কদাপি প্রচার করেন নাই। বেদ, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ হইতে কখনও কোন অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। জনসমক্ষে তিনি কখনও তাঁহার গুরুদেবের উল্লেখ করেন নাই, অথবা হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানসমূহের অংশবিশেষ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামতও প্রকাশ করেন নাই।

তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন যে, যাহাতে পাশ্চাত্য ধর্মচেতনা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ সাদরে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিতে পারে, এবং সমগ্র জগৎ একসূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ স্থানীয় পৌরাণিক আখ্যানসমূহের অবলুপ্তির পরেও টিকিয়া থাকিতে পারে, সেজন্য ভারতীয় চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মমতকে (faith) এমন রূপ দিতে হইবে যাহাতে উহার অনুগামিগণ কিছুতেই সত্যকে ভয় করিবে না! এক বক্তৃতায় তিনি আবেগভরে বলেন, "বিচারমূলক ধর্মের উপরেই ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।" আবার বহুবার তিনি বলিয়াছেন, "জড়বাদী ঠিকই বলেন, জগতে মাত্র একটি বস্তুই বিদ্যমান। কেবল সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে তিনি জড় বলিতেছেন, আর আমি উহাকেই ঈশ্বর বলি।" আর একস্থলে তিনি বিস্তৃতভাবে ধর্মভাবের বিকাশ ও উহার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "প্রথমে লক্ষ্যবস্তু বহুদূরে, জড়প্রকৃতির বাহিরে, এবং উহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের উহার প্রতি আকৃষ্ট করে। লক্ষ্যবস্তুকে ক্রমশঃ নিকটে আনিতে হয়, কিন্তু হীন বা নিকৃষ্ট করিয়া নহে। নিকটতর হইতে হইতে অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর জড়প্রকৃতির ঈশ্বররূপে পরিণত হন; জড়প্রকৃতির মধ্যগত ঈশ্বরই আবার এই প্রকৃতিরূপী ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ান; ক্রমে যে ঈশ্বর এই প্রকৃতিরূপী, তিনিই এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হন; তারপর এই দেহমন্দিরই তিনি এবং সর্বশেষে তিনিই মানবাত্মা, এইরূপ হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞান চরমসীমায় উপস্থিত হয়।

ঋষিগণ যাঁহাকে এই সকল স্থানে অন্বেষণ করিয়াছেন, সেই আত্মা আমাদের হৃদয়েই অবস্থিত। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই, হে মানব, তুমিই সেই।

স্বামীজী নিজে মনে করিতেন, এইকালে মায়াসম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলির মধ্যেই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটিয়াছে। মনোযোগ সহকারে ঐগুলি পাঠ করিলেই ধারণা করিতে পারা যায় যে, আধুনিক ইংরেজী ভাষায় ঐসকল ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি কি দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ অধ্যায়গুলি আগাগোড়া পাঠ করিলে আমাদের মনে হয়, সুস্পষ্টভাবে অনুভূত একটি ভাবকে প্রকাশের অনুপযোগী এক ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। স্বামীজী বলেন, "'মায়া' শব্দটি ভুল করিয়া মিথ্যাজ্ঞান (delusion) অর্থে বুঝা হয়।" সর্বপ্রথম উহা দ্বারা ইন্দ্রজালের (magic) মতো একটা কিছু বুঝাইত, যেমন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়ায় নানা রূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই অর্থ লোপ পায়, এবং শব্দটির এক এক করিয়া বহু অর্থান্তর ঘটে। কিরূপে এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে একটি অর্থ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল, তাহার নিদর্শন নিম্নোক্ত বাক্যে পাওয়া যায়—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অসুতৃপ উক্থাশাসশ্চরন্তি।"—অর্থাৎ, যেহেতু আমরা বৃথা বাক্যালাপ করিয়া থাকি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি এবং বাসনারই অনুবর্তন করি—সেই হেতু সত্য বস্তুকে যেন কুয়াসার দ্বারা আচ্ছাদিত করি। অবশেষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকেই দেখা যায়, শব্দটি উহার সর্বশেষ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্", অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর যিনি মায়াধীশ, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। স্বামীজী বলেন, বেদান্তে 'মায়া' শব্দ সর্বশেষ যে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার অর্থ—যাহা ঘটিতেছে তাহার উল্লেখমাত্র—প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা এবং আমাদের চতুর্দিকে যাহা দেখিয়া থাকি, তাহারই উল্লেখ।

কিন্তু এই কথাগুলি যে সংজ্ঞানির্দেশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা যে কেহ তাঁহার মায়া-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মায়া শব্দে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎকে যেরূপে জানা যায়, তাহাই নির্দেশ করে না, পরন্তু ঐ জ্ঞান যে কুটিল-পথগামী, ভ্রমপূর্ণ ও স্ববিরোধী, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। স্বামীজী বলেন, "এই জগৎ যে 'ধোঁকার টাটি', ইহাতে যে সুখের লেশমাত্র নাই, কেবল পরিশ্রমই সার, আমরা যে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, অথচ জানি না, ইহাও বলিতে পারি না—ইহা কোন মতবাদ নহে, পরন্তু প্রকৃত ঘটনাসমূহের উল্লেখমাত্র।

স্বপ্নের মধ্যে অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত অবস্থায় সঞ্চরণ, সমগ্র জীবন এক অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে যাপন—ইহাই প্রত্যেকের অদৃষ্ট। সমগ্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই এই পরিণতি। আর ইহারই নাম জগৎ।" তাঁহার ব্যাখ্যার অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় শব্দবিশেষকে সঠিকভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যায় না ; এবং উহা বোধগম্য করিবার একমাত্র উপায় হইল—এখানে সেখানে এক-আধটি বাক্যের উপর সমগ্র মনোযোগ না দিয়া, বক্তা যে ভাবটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ধরিবার চেষ্টা করা। সুতরাং মায়া অর্থে সেই চকিতের ন্যায় প্রকাশমান, এই আছে, এই নাই, অর্ধ সত্য, অর্ধ মিথ্যা, জটিল কোন কিছু, যাহাতে বিশ্রাম নাই, তৃপ্তিও নাই, কোন চরম নিশ্চয়তা নাই, যাহা আমরা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় নির্ভরশীল মনের সাহায্যেই জানিতে পারি। অথচ "আর এই সকলের মধ্যে যিনি ওতপ্রোত রহিয়াছেন, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিও"—'মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'। পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সমগ্র হিন্দুধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা পাশাপাশি অবস্থিত এই দুইটি ভাবের মধ্যেই বিদ্যমান। অন্যান্য উপদেশ ও ভাবগুলি ইহাদের অনুবর্তী মাত্র। ধর্ম হইল ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ব্যাপার "ক্রমাগত সত্তা ও পরিণাম (being and becoming) থাকা ও হওয়া।" কিন্তু এই ক্রমবিকাশের মূলে ঐ দুটি মুখ্য ঘটনা থাকা চাই, এবং ভরকেন্দ্রটি যেন একটি হইতে অপরটিতে—মায়া হইতে আত্মায় ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়। প্রাচ্যমতে মায়াতে তন্ময় হইয়া থাকার নামই 'বন্ধন'। আর এই বন্ধন ভাঙিয়া ফেলার নামই 'মুক্তি' ; এমনকি, উহাকে 'নির্বাণ' পর্যন্ত বলা হয়। এই বন্ধন যিনি ভাঙিয়া ফেলিতে চাহেন, তাঁহাকে সর্বদা ত্যাগের পথ অন্বেষণ করিতে হইবে—ভোগের অন্বেষণ করিলে চলিবে না। স্বামীজী বলেন, এই বিষয়ে তিনি সকল ধর্মের যাহা মূলমন্ত্র, তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। কারণ, ভারতীয় ও অন্যান্য সকল ধর্মই সুখের অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কোন এক স্থলে 'আর নয়' বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। সকল ধর্মই সংসারকে নাচঘরে পরিণত না করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সকল ধর্মই মানবকে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য শক্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে অন্যান্য আচার্যগণ হইতে স্বামীজীর পার্থক্য বোধ হয় এইখানে যে, তিনি সকল প্রকার প্রভুত্বকে ত্যাগের কোন না কোন রূপান্তর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষপ্রান্তে আমি একদিন বলি যে, তাঁহার মুখ হইতে আমি শুধু 'ত্যাগ' শব্দই শুনিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মনে হয় 'জয় কর' কথাটিই তাঁহার প্রকৃতির অধিকতর অনুগামী ছিল। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্টিফেনসনের উল্লেখ করিয়া

বলেন, ত্যাগের দ্বারাই তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারে সমর্থ হন—অর্থাৎ তাঁহার ঐ আবিষ্কারের পিছনে ছিল বহুদিনব্যাপি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে কঠিন সমস্যার সমাধানে তন্ময় হইয়া থাকা এবং সর্বপ্রকার দেহসুখ পরিহারপূর্বক ক্লেশ বরণ করিয়া লওয়া। তিনি দেখাইয়া দেন যে,প্রার্থনা বা চিন্তা দ্বারা রোগ আরাম করিবার জন্য চিত্তের যতটা একাগ্রতার প্রয়োজন, আরোগ্য-সম্পাদনের জন্য ভেষজ-বিজ্ঞানও মানবমনের ততটা একাগ্রতারই পরিচয় দেয়। তিনি আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করাইয়া দেন যে, অধ্যয়ন মাত্রেই বিশেষ কোন জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তপস্যা। সর্বোপরি, তিনি প্রচার করেন যে, ধর্মভাবের বন্যাকে স্থায়ী করিবার শক্তি একমাত্র চরিত্রেই বর্তমান। তাঁহার মতে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা গৃহীর ধর্ম, আর সাধুর ধর্ম হইল অপ্রতিকার। কারণ সকলের পক্ষেই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হইল শক্তিলাভ। তিনি বলেন, "যখন তুমি অসংখ্য দেবসেনাকেও সহজে জয়লাভ করতে পারবে, তখনই ক্ষমা করো।" কিন্তু জয় সম্বন্ধে যতক্ষণ সন্দেহ আছে, ততক্ষণ তাঁহার মতে কেবল কাপুরুষ ব্যক্তিই একগালে চড় খাইয়া অপর গাল ফিরাইয়া দিবে।

তাঁহার গুরুদেব একটি বালকের সম্বন্ধে যে গল্প বলিতেন, তাহার মধ্যেও ঐ উপদেশ পাওয়া যায়। বালকটি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার জন্য কুড়ি বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করে। এক সাধু তাহাকে বলেন, "বাঃ, মাঝিকে এক পয়সা দিয়ে লোকে যা করে, তুমি সেই কাজ করবার জন্য কুড়ি বছর পরিশ্রম করলে?" বালকটি উত্তরে বলিতে পারিত, কুড়ি বছর সহিষ্ণুতাব সহিত পরিশ্রমের ফলে সে চরিত্রে যে-সব সদ্গুণ লাভ করিয়াছে, কোন মাঝি তাহার আরোহিগণকে তাহা দিতে পারিবে না। কিন্তু একথা সত্য যে, পরম বিবেচক এই ধরনের আচার্যগণের নিকট জাগতিক নৌবিদ্যারও যথোচিত পূর্ণ মূল্য ও উপযুক্ত স্থান আছে। বহু বৎসর পরে প্যারিসে এক ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে ভারতীয় চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের সাধারণ ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রশ্ন লইয়া তাঁহার নিকট আসেন। প্রশ্নটি এই—"সনাতন হিন্দুধর্ম একেকে সৎ (real) ও বহুকে অসৎ (unreal) বলেছেন, আবার বুদ্ধ কি বহুকেই সৎ ও (তদধিষ্ঠান) অহংকে (ego) অসৎ বলেননি?" স্বামীজী উত্তর দেন, "হাঁ, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি কেবল এইটুকু তার সঙ্গে যোগ করেছি যে, বহু ও এক উভয়ে একই মনের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধ সেই একই সত্য।"

অধ্যাত্ম বিষয়ে জ্বলন্ত ভাষায় বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা হেতু এবং অদ্ভুত গভীর ও গাম্ভীর্যময় এক প্রাচীন সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি

আমাদের নিকট সর্বোপরি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রচারকরূপে, বহির্জীবন অন্তর্জীবন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত—এই মতবাদ প্রচারের ঋষিরূপে প্রতিভাত হইতেন। একবার তিনি জনৈক শিষ্যকে বলেন, "মনে রেখো, 'আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতিই আত্মার জন্য'—ভারত সর্বদা এই বাণী ঘোষণা করছে।" বস্তুতঃ ইহাই যেন ছিল মূল সুর, সুগম্ভীর ধ্বনি—তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপভোগ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করিতেন, বা যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করিতেন, তাহার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ ইহাই শ্রুতিগোচর হইত। দীর্ঘকাল ধরিয়া যিনি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, হয়তো তাঁহার নিকট পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদ এইরূপ বোধ হইবে—একটি বাঁশীর সুরের মতো—অতি প্রত্যূষে বহুদূরে কোন নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে, অতি সুমিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক অন্যান্য সুমধুর সঙ্গীতের অন্যতম। আর একটি, সেই সুরলহরীই, কিন্তু শ্রোতা ক্রমশঃ তাহার সমীপবর্তী হইয়া অবশেষে এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, তাঁহার সমগ্র সত্তা সেই সুরে বিলীন হইয়া যায়—শ্রোতা পরিণত হন গায়কে। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পায় ত্যাগের মাহাত্ম্য। এমন নহে যে, ত্যাগ শব্দটি তাঁহার উপদেশসমূহে পূর্বাপেক্ষা অধিকবার প্রযুক্ত হয় ; কিন্তু সেই মুক্ত, অপরিসীম, অপ্রতিহত জীবনের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর জীবনযাপনের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার এবং অসহ্য বোধ হইলেও আত্মনিবেদনরূপ শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়।

অবশেষে এমন সময় উপস্থিত হইল, যখন এই আহ্বান অতি গম্ভীর নির্ঘোষে উচ্চারিত হইল। একদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে কথায় কথায় কিছু বাদানুবাদ ঘটে। সহসা স্বামীজী, যাহাকে 'তিনি বোমা ছুড়িয়া লোককে চমৎকৃত করা বলিতেন' সেইরূপ এক সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জগতে আজ কিসের অভাব জানো ? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।' কে কে যেতে প্রস্তুত ?" বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কাহাকে কাহাকেও তিনি ইঙ্গিত করিতেছেন তাঁহার সহিত যোগদান করিতে। 'কিসের ভয় ?' তার পর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত তিনি যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখনও আমার কানে বাজিতেছে, "যদি ঈশ্বর আছেন একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন ? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কি ?"

তাঁহার ক্লাসের এক সদস্যকে তিনি এই সময় এক পত্রে লেখেন, "জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ মানুষেরই প্রয়োজন, যাদের জীবন জ্বলন্ত প্রেমস্বরূপ, যারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রত্যেক বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে। জাগো, জাগো, মহাপ্রাণ, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে ?"

আমার মনে আছে, চরিত্রই সত্যকে সজীব করিয়া তোলে, সর্বপ্রকার সাহায্যের সফলতা নির্ভর করে প্রেমের উপর, কোন বাক্যের পিছনে চিত্তের যতটা একাগ্রতা থাকে, তাহাই বাক্যটিকে শক্তিপ্রদান করে—ভারতীয় এই ধারণা সেই সময় আমার নিকট কিরূপ নূতন বোধ হইয়াছিল। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "এইজন্য বাইবেলের এই উক্তি 'কুমুদফুলগুলির কথা ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেমন স্বতই বিকাশপ্রাপ্ত হয়' কেবল উহার সৌন্দর্যের জন্য নহে, পরন্তু উহাতে যে গভীর ত্যাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, সেজন্যই আমাদিগকে মুগ্ধ করে।"

ইহা কি সত্য ? আমার মনে হইল, পরীক্ষা দ্বারা প্রশ্নটির সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে ; এবং কিছুকাল পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, উহা সত্যই। যাঁহার ভাষার অন্তরালে চিন্তাশক্তি বিদ্যমান, এমন ব্যক্তির একটি মাত্র মৃদু বাক্যের দ্বারা তৎক্ষণাৎ কাজ হইয়া যায়, কিন্তু যিনি চিন্তার ধার ধারেন না, এমন ব্যক্তির মুখে ঐ কথাটিই উচ্চারিত হইলে কেহ তাহাতে কর্ণপাতও করে না। এই সম্পর্কে খলিফা আলির একটি উক্তি অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর কোন উদাহরণ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। "সংসারে তুমি যে পদ লাভ করিবে, তাহা তোমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, অতএব, তুমি উহার অন্বেষণ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান কর"—অনেকেই ইসলামধর্মের এই পুরুষসিংহের এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমরা কথাগুলিকে বক্তার জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া না দেখি—যাঁহাকে চার বার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত খলিফার পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরকে ঐ পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল—যতদিন পর্যন্ত আমরা জানিতে না পারি যে, কিরূপে এই ব্যক্তির সমগ্র জীবনের স্পন্দন ঐ কথা কয়টির মধ্যে অনুভূত হইতেছে, ততদিন আমরা ঐ সামান্য বাক্যটির মধ্যে যে অসাধারণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না।

আমি আরও দেখিলাম, যে উক্তি শুধু শ্রোতার শ্রবণগোচর না করাইয়া যত্নপূর্বক তাহার মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। আর এই সকল মনস্তত্ত্ববিষয়ক আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম, যদিও একথা বহুপূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, বিচারের দ্বারা চৈতন্য ও জড়ের

মধ্যে রেখা টানিয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া ফেলা অসম্ভব, তথাপি ইহাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, এই দুইটির মধ্যে অদ্বিতীয় সত্তার যে-দিকটা আমরা জড় বলি, তাহা চৈতন্য বলিয়া যাহাকে অভিহিত করি তাহারই পরিণামস্বরূপ, কিন্তু কোনক্রমেই উহার বিপরীত নহে। ইচ্ছাশক্তি নয়, পরন্তু শরীরকেই জীবত্বের একটি গৌণ ফল মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা হইতে দেহাতিরিক্ত উচ্চতর এক চৈতন্যের ধারণা আসিল—যাহা জড়ের অধীন না হইয়া বরং জড়কে পরিচালিত করে ; সুতরাং শরীর যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ উহা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্রও গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ এই পরিচিত শরীরকেই পরিত্যাগ করিতে পারে। অবশেষে আমি দেখিতে পাইলাম, আমার নিজের মনই "শরীর আসে ও যায়"—স্বামীজীর অমরত্বজ্ঞাপক এই মহান উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছে। কিন্তু চিন্তার এই পরিণতি ধীরে ধীরে সংসাধিত হইয়াছিল, এবং পূর্ণতালাভ করিতে অনেক মাস লাগিয়াছিল।

ইতোমধ্যে যখন আমি পশ্চাতে ফিরিয়া এই সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন অনুভব করি যে, স্বামীজীর ক্লাসগুলিতে আমরা যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহা প্রকৃতপক্ষে তর্কযুক্তিমূলক ব্যাখ্যা নয় বরং বলা যায়, নূতন ও উচ্চভাবময় এক জীবন লাভ, অথবা ভারতে যাহাকে দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতি বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহাই।

ভগবানকে গোপালভাবে উপাসনা করার বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা স্বামীজীর বিস্ময়কর উক্তি শ্রবণ করিলাম, "তাঁহার নিকট আমরা কিছু চাই না কি ?" "প্রেম চিরকালই আনন্দের বিকাশমাত্র", সুতরাং কোনপ্রকার যন্ত্রণা বা অনুশোচনা, স্বার্থপরতা ও দেহসুখসর্বস্বতারই নিদর্শন মাত্র—এই উপদেশ আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম। আমাদের ও অপরের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভেদদৃষ্টি 'ঘৃণা' পদবাচ্য এবং উহার বিপরীতই প্রেম—এই কঠোর নির্দেশ আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। শৈশবের ধর্মমতে যাঁহারা বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অনুভব করিতেন যে, অন্ততঃ পরোপকার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জীবসেবার সম্ভাবনাটা থাকিয়াই যায়। পূর্বোক্তমতে বিশ্বাসী হওয়ায়, "ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাদান একধাপ নিম্নস্তরের, আর যে কোন প্রকারের দৈহিক বা জাগতিক দান সর্বাপেক্ষা নিম্নস্থানীয়"—এই প্রাচ্যদেশীয় উপদেশটি শুনিয়া আমরা যে বিস্মিত হইয়াছিলাম, আজ দশ বৎসর পরে তাহা স্মরণ করিয়া আমার নিকট কৌতুককর বোধ হইতেছে। ব্যাধি ও দারিদ্র্যপীড়িতের প্রতি আমাদের যে উদ্বেলিত

দয়া—এইভাবে তাহার স্থান নির্দেশ করা! এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বহু বৎসর লাগিয়াছে, কিন্তু এখন আমি জানি যে, উচ্চতর দানের পশ্চাতে নিম্নতর দানটি আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। অনুরূপভাবে, বিশুদ্ধ বায়ু আবশ্যক, এবং আশেপাশের বসতিসমূহ যেন স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়, এই নীতির প্রতি পাশ্চাত্য দেশে যে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ—যেন ঐগুলিই সাধুত্বের লক্ষণ—তাহার বিরুদ্ধে আমরা কঠোর শিক্ষা পাইলাম—'জগতের প্রতি উদাসীন হও।' বস্তুতঃ আমাদের মনে হইল, এই শিক্ষার রহস্য ভেদ করা সাধ্যাতীত। আপাততঃ অসংলগ্ন বোধ হইবে জানিয়াও স্বামীজী যখন সদর্পে বলিলেন, ঋষিরা 'দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্যই' পর্বতশিখরে বাস করিতেন, এবং যখন তিনি শ্রোতৃবর্গকে পূজার ঘরে পুষ্পাদি রাখিতে ও ধূপধুনা দিতে বলিলেন, আহার ও শরীর বিষয়ে শুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশেষ যত্ন লইতে উপদেশ দিলেন, তখন এই ধর্মসম্বন্ধীয় দুই বিপরীত ভাবকে কিরূপে সংযুক্ত করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের দেশে প্রচলিত দৈহিক পারিপাট্য নীতিটি ভারতীয় আকারে প্রচার করিতেছিলেন। আর ইহা কি সত্য নহে যে, যতদিন পাশ্চাত্যে আমরা বড় বড় শহরে অবস্থিত বস্তিসমূহ (slums) পরিষ্কার করিতে সমর্থ না হই, ততদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আমাদের অত্যধিক আগ্রহ বিশেষ সুবিধাভোগী একশ্রেণীর আত্মপূজারই অনুরূপ!

যে-সব মহাপুরুষ বিশেষ কুশলতা ও হিসাবী বুদ্ধির সহিত সাংসারিক সকল কাজের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারও এইরূপ দুর্গতি ঘটিল। প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যক্তি জাগতিক বিষয়ের প্রতি কেবল যে উদাসীন, তাহা নহে, ঐগুলির প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং কোনক্রমেই উহা সহ্য করিতে পারেন না। এই উপদেশ স্বামীজী কদাপি খর্ব করিতেন না। এই উপদেশ ঘোষণা করিবার সময় তিনি কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না। উচ্চতম আধ্যাত্মিকতায় সাংসারিকতার স্থান নাই।

আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এগুলি সাধুত্বেরই আদর্শস্বরূপ। আমরা অধ্যায়ের পর অধ্যায় এক মহতী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলাম, যাহা দ্বারা জগতের উদ্দেশ্যগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। যে বিষয়গুলি নাগরিক জীবন ও গৃহস্থালী ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং যাহাদের আত্মোন্নতির হাতেখড়ি (কিণ্ডারগার্টেন) স্বরূপ বলা যাইতে পারে, তাহাদের সম্পর্কে

আমাদের কোনরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হয় নাই। অপরদেশের গৌরবস্থল শৃঙ্খলা ও দায়িত্বজ্ঞানের আদর্শ সমাদর করিতে শিখিয়াই যে একটি দেশ সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে পারে, এ ধারণা তিনি আদৌ অবিশ্বাস করেন নাই। সেই সঙ্গে আবার ভারতীয় আদর্শসমূহের চিরন্তন মূলমন্ত্রস্বরূপ এই কথাগুলিও আমাদের বলা হয়, "আধ্যাত্মিকতা সাংসারিকতা সহ্য করিতে পারে না।" ইহার প্রতিবাদস্বরূপ আমরা সুপরিচালিত, সুসংবদ্ধ জনকল্যাণরত সন্ন্যাসি-সঙ্ঘগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং প্রাচ্যের জনকয়েক জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত, ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত ভিক্ষুকের তুলনায় আমাদের বহু বহু মঠাধ্যক্ষ যাজক, মহাসাধিকা মঠাধ্যক্ষাগণের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছিলাম। তথাপি আমাদের স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, এমনকি পাশ্চাত্যেও যখনই ধর্মবহ্নি সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই উহা প্রাচ্য আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ, যাঁহারা মীরাবাঈ ও চৈতন্য, তুকারাম ও রামানুজের জন্মভূমি ভারতকে জানেন , তাঁহাদের পক্ষে আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসকেও গৈরিকমণ্ডিত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধজাতকগুলির ইংরেজী অনুবাদেব কোন একখণ্ডে এই কথাগুলি বার বার উল্লেখ দেখা যায়, "যখন মানব সেইস্থানে উপনীত হয়, যেখানে সে স্বর্গকে নরকের মতোই ভয় করে"—স্বামীজীর উপস্থিতি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আনয়ন করিত, তাহার পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টভাবে আর কিরূপে দেওয়া যায়, তাহা আমার অজ্ঞাত। যাঁহারা ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে লণ্ডনে বক্তৃতা কবিতে শুনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমন কিছু আভাস পান, যাহা দ্বারা প্রাচ্যবাসিগণ কেন জন্মান্তর পরিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে চাহেন, তাহার কিছুটা অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু এই সকল মানসিক অবস্থার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া অপর অবস্থাগুলিকে পরিচালিত করিত, তাহার আভাসমাত্র ইতঃপূর্বে এই কথাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে—"যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আর কোন্ বস্তুতে প্রয়োজন ? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী ?" কারণ, তিনি স্বয়ং যে সকল সত্য শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, এবং নিজে যে সর্বোচ্চ আশা পোষণ করিতেন, তাহাদের একত্র করিয়া এবং অপরের কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে ঐগুলিকে হীন উৎকোচস্বরূপ জ্ঞান করিয়া নির্ভীকভাবে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা এই আচার্যের ছিল। বহু বৎসর পরে আমার কোন এক

মন্তব্যের উত্তরে তিনি সক্রোধে যাহা বলেন, তাহা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—"যদি আমি কোন গুরুতর অপরাধ করলে, বাস্তবিক কাহারও উপকার হয়, তবে আমি নিশ্চয় এখনই তা করে অনন্ত নরকভোগ করতে প্রস্তুত!" আবার তিনি আমাদের মধ্যে কয়েক জনকে বহুবার সেই বোধিসত্ত্বের যে কাহিনী বলিতেন—যেন উহা বর্তমান যুগের বিশেষ উপযোগী—তাহাতেও এই আবেগই প্রকাশ পাইত। এই বোধিসত্ত্ব যতদিন জগতের শেষ ধূলিকণাটি পর্যন্ত মুক্তিলাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত নিজে নির্বাণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ইহার অর্থ কি এই যে, মুক্তিলাভের শেষ লক্ষণ হইল মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা হইতে বিরত হওয়া? তখন হইতে ভারতে প্রচলিত বহু কাহিনীর মধ্যে আমি এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামানুজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া পারিয়াদিগের নিকট পবিত্র মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা, বুদ্ধের কোন কিছু গোপন না রাখিয়া সমগ্র জীবন কর্মে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া, শিশুপালের শীঘ্র শীঘ্র ভগবৎ সকাশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ভগবানকে শত্রুভাবে বরণ করিয়া লওয়া; এবং সাধুগণের নিজ নিজ ইষ্টের সহিত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি অসংখ্য কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সকল সময়েই যে স্বামীজী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া চলিতেন, তাহা নহে। একদিন বক্তৃতান্তে তিনি আমাদের একটি ছোটখাট দলের নিকট আসিয়া যে প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছিল তাহারই সম্বন্ধে বলেন, "আমার একটা কুসংস্কার আছে—অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়—যিনি একসময়ে বুদ্ধরূপে এসেছিলেন, তিনিই পরে খ্রীস্টরূপে এসেছেন।" অতঃপর ঐ বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহার গুরুদেবের কথা আসিয়া পড়িল। এই প্রথম আমরা তাঁহার এবং বিবাহের পর স্বামী কর্তৃক বিস্মৃত হইয়াও যিনি সজলনয়নে তাঁহাকে নিজ অভীষ্ট পথে চলিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সেই বালিকার কথা শুনিতে পাইলাম। কথা কহিতে কহিতে ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদুতর হইয়া অবশেষে স্বপ্নাবিষ্টের মতো হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষে যেন স্বগতোক্তির মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে এই কথা বলিয়া তিনি উক্ত আবেশ হইতে নিজেকে জোর করিয়া মুক্ত করিলেন—"সত্যই, এসব ঘটনা ঘটে গেছে, এবং আবার ঘটবে। যাও বৎসে, শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে যাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রোগমুক্ত করেছে।"[১]

---

১ বাইবেল—সেন্ট ম্যাথু, ৯ম অধ্যায়।—অনুঃ

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে ইহা অপেক্ষা সামান্য এক ঘটনা উপলক্ষে তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সঙ্কল্প আছে। আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।" আমি বুঝিলাম, আমার নিকট এমন এক আহ্বান আসিয়াছে, যাহা জীবনকে পরিবর্তিত করিয়া দিবে। এই সঙ্কল্পগুলি কী ধরনের তাহা আমি জানিতাম না, এবং ভাবী জীবনের যে চিত্র অঙ্কনে আমি অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা ত্যাগ করা সেই সময়ে এত কষ্টকর বোধ হইয়াছিল যে, ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেও চাহি নাই। কিন্তু ইতঃপূর্বেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম, জগৎ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, অন্যান্য জাতির দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে গেলে আমাকে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে। একবার আমি লণ্ডন নগরীকে সৌন্দর্যশালিনী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। স্বামীজী তীব্রস্বরে উত্তর দেন, "আর তোমরা অন্য শহরগুলিকে শ্মশান করে তুলেছ।" আমার নিকট লণ্ডন নগরীর রহস্যময়তা ও দুঃখপূর্ণতা বহুদিন হইতে সমগ্র মানবজাতির সমস্যা বলিয়াই বোধ হইত—সমগ্র জগৎ যাহা চাহিতেছে তাহারই একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। "আর তোমরা তোমাদের এই নগরীকে সৌন্দর্যশালিনী করবার জন্য অন্য নগরগুলিকে শ্মশানপুরী করে তুলেছ।" তিনি আর বেশি কিছু বলিলেন না, কিন্তু কথাগুলি বহুদিন ধরিয়া আমার কানে বাজিতে লাগিল। আমার চক্ষে আমাদের নগরী সৌন্দর্যশালিনী ছিল না। আমার প্রশ্নটি স্বামীজী ভুল বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভুল বোঝা হইতেই আমি দেখিতে পাইলাম, ইহাকে অপর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দেখা যায়। স্বামীজী একদিন আমাকে বলেন, "ইংরেজরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সর্বদা তাদের চেষ্টা দ্বীপেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।" আমার সম্পর্কে এই মন্তব্য যথার্থই সত্য ছিল। পিছনে ফিরিয়া আমার জীবনের ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারি, আমার আদর্শগুলি তখন পর্যন্ত কতদূর সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমি আর বেশি কিছু জানিতে পারি নাই। যে মহিলা বন্ধু আমায় পরে ভারতে তাঁহার সহকর্মিণী হইবার জন্য আহ্বান করেন, এক সন্ধ্যাকালে স্বামীজী ও আমি ঘণ্টাখানেকের জন্য লণ্ডনে তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে, আমি স্বামীজীকে জানাই যে, তাঁহার কার্যে যোগদান করিতে আমার আগ্রহ আছে। স্পষ্টতই তিনি ইহা শুনিয়া বিস্মিত হন, কিন্তু শান্তভাবে বলেন, "আমার কথা বলতে গেলে, আমি স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যে কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তা সম্পন্ন করবার জন্য প্রয়োজন হলে দু শবার জন্মগ্রহণ করব।" এই কথাগুলি এবং অপর কয়েকটি কথা, যাহা তিনি

আমার যাত্রার প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন, আমার মানসপটে চিরবিরাজমান রহিয়াছে, "তুমি ভারতের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্তধর্ম ত্যাগই কর আর ধরিয়াই থাক, আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করিব। 'মরদকী বাত, হাথীকা দাঁত।' হাতির দাঁত একবার বাহির হইলে আর ভিতরে যায় না। পুরুষের কথাও সেইরূপ।"

কিন্তু স্বামীজীর আপনজন সম্পর্কে এই উল্লেখগুলি ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং সেজন্য উহারা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ গৌণস্থান অধিকার করিত। তাঁহার ক্লাসগুলিতে এবং উপদেশসমূহে মানুষকে অজ্ঞানের হস্ত হইতে রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বলিয়া বোধ হইত। যাঁহারা তাঁহার কথা বা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ প্রেম, এরূপ অনুকম্পা আর কোথাও দেখেন নাই। তাঁহার নিকট সকল শিষ্যই শিষ্যমাত্র ; সেখানে ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় বলিয়া কোন ভেদ ছিল না। আবার তিনি নিজের প্রচারকার্যের ঐতিহাসিক অর্থ বা গুরুত্ব সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। লণ্ডনে তাঁহার শেষ বক্তৃতায় (১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণে 'রয়েল সোসাইটি অব পেন্টার্স ইন্ ওয়াটার কলার্স' নামক চিত্রশিল্পি-সঙ্ঘ-মন্দিরে) তিনি দেখাইয়া দেন যে, ইতিহাসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং রোমরাজ্যে শান্তি বিরাজ করার ফলেই খ্রীস্টধর্ম সংস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। দূরদৃষ্টির ফলে তাঁহার স্থির ধারণা ছিল, তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, ভবিষ্যতে বিরাট একদল ভারতীয় প্রচারক পাশ্চাত্যে আগমন করিয়া তাহার ফল উপভোগ করিবেন, এবং তাঁহারাও আবার ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্য নূতন নূতন বীজ বপন করিয়া যাইবেন। সম্ভবতঃ. তাঁহার চালচলনে বুদ্ধের ন্যায় যে প্রশান্ত-গম্ভীর ভাব আমাদের এত মুগ্ধ করিয়াছিল, উহা তাঁহার ঐ দূরদৃষ্টি ও স্থির ধারণারই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে একবার এইরূপ বলেন, "তিনি বেদান্তের অথবা নানা তত্ত্বের ধার ধারতেন না। তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করতেন এবং তার ব্যাখ্যার ভার অন্যের উপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন।" কোনও মহাপুরুষের জীবনে এমন কোন অংশ থাকিতে পারে, যাহার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না—স্বামীজীর নিজ জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে এই অর্থে ঐ কথাগুলি আমার বহুবার মনে পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্যে আমাদের নিকট স্বামীজী শুধু ধর্মাচার্যরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এখনও ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই আমরা তাঁহাকে সেই পুরাতন বক্তৃতাগৃহে ছাত্রমণ্ডলীর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই; দেখিতে পাই, তিনি বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্তভাবে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আর একবার এই আধুনিক জগৎ সুদূর অতীতের সেই বাণী শ্রবণ করিতেছে। ত্যাগ, মুক্তি-পিপাসা, বন্ধনক্ষয়, অগ্নিতুল্য পবিত্রতা, সাক্ষিস্বরূপ হইবার আনন্দ, নিরাকারে সাকারের পর্যাবসান—কেবল এইগুলিই ছিল সেই আলোচনার বিষয়। সত্য বটে, চকিতের ন্যায় এক-আধবার আমরা তাঁহাকে মহাদেশপ্রেমিকরূপে দেখিয়াছি। তথাপি নিয়তি আহ্বান করিলে গোপন ইঙ্গিতমাত্রই যথেষ্ট, এবং যে-সব মুহূর্ত একজনের জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়া দেয়, তাহারা শতজনের চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেলেও কেহ ধরিতে পারে না। পাশ্চাত্যে আমরা স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছি, ভারতের উন্নতিকামী কর্মিরূপে নহে। আবেগভরে তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আহা! মানবের দেবত্ব যিনি প্রকৃত উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাজ কতই না শান্তিপূর্ণ! কারণ, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মানুষের চোখ খুলে দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করবার নেই; বাকি সব আপনা থেকেই হয়ে যায়।" সন্দেহ নাই, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহা এইরূপ কোন অগাধ শান্তিরই ফলস্বরূপ।

কিন্তু আমার ভারতে পদার্পণের মুহূর্ত হইতে এই সকল ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক বস্তু দেখিতে পাইলাম। এইরূপ অদ্ভুতভাবে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা তাঁহার সম্পর্কিত কোন বিষয় নহে ; উহা আমার গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব—যাহা জালবদ্ধ সিংহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে এবং সেজন্য দুঃসহ ক্লেশ বোধ করিতেছে। কারণ, যেদিন জাহাজ হইতে অবতরণকালে জেটিতে তাঁহাকে দেখি, সেদিন হইতে সেই শেষ শান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত—যখন গোধূলি সময়ে দেহটিকে ভাঁজকরা পোশাকের ন্যায় ফেলিয়া রাখিয়া তিনি এই জগৎরূপ গ্রামখানি চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করিয়া যান—এই ভাবটি যে তাঁহার জীবনের অপর ভাবের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, সে বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম।

কিন্তু কোথায় এই সংঘর্ষের মূল ? কেন তিনি নিজেকে উদ্দেশ্যসাধনে বার বার বিফলপ্রযত্ন ও বাধাপ্রাপ্ত বোধ করিতেন ? এক মহান উদ্দেশ্যের ধারণা যতই তাঁহার নিকট স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার শারীরিক দুর্বলতাবোধও ততই বাড়িতেছিল—ইহাই কি তাহার কারণ ? ভারতে তাঁহার বিজয়সূচক অভ্যর্থনার যে প্রতিধ্বনি ইংরেজ বন্ধুদের নিকট পৌঁছায়, তাহার সহিত আমি এই বিষয়টিই একজনের নিকট শুনিতে পাই। যে মুহূর্তে তাঁহার ক্ষমতা চরম সীমায় আরোহণ করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া হিমালয়ে নির্বাসিত স্বামীজী তাঁহার বন্ধুকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রে ছিল হতাশার কাতর ক্রন্দন। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহাকে যে-কোন উপায়ে ভারতের কার্যভার অপরের স্কন্ধে অর্পণপূর্বক পাশ্চাত্যে প্রত্যাবর্তনে সম্মত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার সময়, তাঁহার আরব্ধ কার্য কি প্রকারের এবং উহা সম্পন্ন করিবার জন্য কত কঠিন এবং জটিল শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা আমরা অতি অল্পই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

কিন্তু এই সংঘর্ষ বাস্তবিক কিসের জন্য ? উহা কি যাহাকে তিনি 'মনোবুদ্ধির অগোচর' বলিতেন, তাহাকেই সাধারণ জীবনে লইয়া আসার প্রাণান্তকর চেষ্টার ফল ? এ-কথা নিঃসন্দেহ—যে-কার্যের জন্য তাঁহার জন্ম, তাহা এতই কঠিন যে, কেবল বীরের পক্ষেই তাহা সাধ্য। প্রচলিত আদর্শসমূহের নিরাপদ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, পুরাতন উপায়ের সহিত আপাত বিরোধশীল কোন প্রণালী অবলম্বন দ্বারা নূতন কোন আদর্শকে কার্যে পরিণত করিতে যাওয়ার মতো দুরূহ কার্য আর নাই। তাঁহার বাল্যকালে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ 'নরেন্দ্র'কে (স্বামীজী তখন ঐ নামেই

অভিহিত হইতেন) জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার জীবনের সর্বোচ্চ অভিলাষ কী?" তিনিও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "সর্বদা সমাধিস্থ থাকা।" শুনা যায়, এই কথায় তাঁহার গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া উত্তরে শুধু বলেন, "বাবা, আমি মনে করেছিলাম, তুমি আরও কোন বড় অধিকার লাভের জন্য জন্মেছ।" আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, উক্ত মুহূর্তটি শিষ্যের জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল। একথা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি শ্রেষ্ঠ দানস্বরূপ শেষের সাড়ে পাঁচ বৎসর তিনি নিষ্কাম কর্ম অথবা পরার্থে কর্মই ধর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন; এবং ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, নূতন ধরনের সামাজিক কর্তব্যের প্রবর্তন ও তাহার বিকাশ সাধন। ইউরোপে, যেখানে প্রাচ্যের তুলনায় প্রত্যক্ষ ধর্মানুভূতি লাভ অতি বিরল, এবং প্রাচ্য অপেক্ষা লোকের উহা বুঝিবার ক্ষমতা কম, সেখানে সাধারণের চক্ষে এইরূপ পরার্থে কর্ম পুণ্যকর্ম বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভারতে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের নিকট লোকে প্রধানতঃ এই আশা পোষণ করে যে, ঐ সঙ্ঘে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিবে। আর যে সন্ন্যাসী, পরম্পরাগত সমাধিমূলক জীবনের মহান ভাবধারা বজায় রাখিবার জন্য নিজেকে নিযুক্ত রাখিবার পরিবর্তে সমাজকে উন্নত করিবার প্রয়াস পান, তাহার মূল্য প্রাচীনকালের লোকেরা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন না।

স্বামীজীর পরিকল্পনায় কিন্তু বোধ হইল, যে-সকল সাধন-প্রণালী পূর্বে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় স্থানলাভ করিত, এই ধরনের সৎকার্যই যেন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর অথবা ভারতীয় বেদান্তদর্শনের চরমপন্থীর নিকট 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থালাভই আদর্শ। এই অবস্থায় যিনি উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উপাসনা অসম্ভব, কারণ, তাঁহার নিকট উপাস্য বা উপাসক কেহই নাই; এবং সকল কর্মই সেই সর্বব্যাপী একত্বের তুল্য বিকাশ বলিয়া কোন কর্মকেই বিশেষভাবে উপাসনার যোগ্য বলিয়া পৃথক করা যায় না। তাঁহার নিকট উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা সবই এক; তথাপি অদ্বৈতবাদীও স্বীকার করেন যে, ভগবদ্‌গুণবর্ণনা ও প্রার্থনা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। কারণ, স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, অন্য কোন উপায় অপেক্ষা ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারা অহংজ্ঞান সহজে দমন করা যায়। এই কারণে, উপাসনা উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রথম সোপান বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বামীজী কর্ম বা মানবসেবাকেও অনুরূপ স্থান দিতেন বলিয়া বোধ হয়। চিত্তশুদ্ধির অর্থ—স্বার্থপরতা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাওয়া। উপাসনা—ব্যবহার করা

বা কাজে লাগানোর বিপরীত। কিন্তু সেবা বা দানও ইহার বিপরীত ভাব। এইরূপে, তিনি অপরকে সাহায্যদান ব্যাপারটি পবিত্রতামণ্ডিত তো করিলেনই, অধিকন্তু মানবের নামও পবিত্র করিলেন। এমনকি, আমি একজন শিষ্যের কথা জানি, সঙ্ঘ-জীবনের প্রথমদিকে যাঁহার হৃদয় ভক্তিভাবে এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদের যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতস্থান চুষিতেন। পীড়িতের শুশ্রূষা ও দরিদ্রকে আহার্যদান বস্তুতঃ প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের স্বাভাবিক কার্য ছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে ঐ কার্যগুলি বিপুল আকার ধারণ করে। অতঃপর ঐ-সব কার্য জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হইত। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সাহায্য দিবার জন্য, কোন শহরে স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্বন্ধে নির্দেশ দিবার জন্য, অথবা কোন তীর্থস্থানে পীড়িত ও মুমূর্ষুগণকে সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য মঠ হইতে লোক পাঠানো হইতে লাগিল। একজন মুর্শিদাবাদে একটি অনাথাশ্রম ও শিল্প বিদ্যালয় খোলেন ; অপর একজন দাক্ষিণাত্যে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। স্বামীজী বলিতেন, ইহারা হইল ধর্মবাহিনীর জঙ্গল-সাফ-করা ও রাস্তা-তৈয়ারি-করার দল (sappers and miners)। তাঁহার পরিকল্পনা কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপকতর ছিল। ভারতীয় নারীগণের শিক্ষাবিধান এবং দেশের মধ্যে শিল্পশিক্ষা-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সমগ্র মনপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল। পরার্থে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি যে কতগুণ দুঃখবৃদ্ধি করে, তাহা ভুক্তভোগীরাই বুঝিতে পারেন। যে 'ত্রিশকোটি টাকা' পাইলে তিনি ভারতবর্ষকে তাহার পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারিতেন বলিতেন, সেই টাকা হাতে না আসায় সত্যসত্যই কি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছিল ? সময়ে সময়ে তাঁহার ঐরূপই মনে হইত। অথবা উচ্চতর কোন বিধান অলক্ষ্যে কাজ করিতেছিল—যাহার ফলে একজীবনে যে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ সফলতা অর্জিত হইতে পারে ?

তাঁহার দৃষ্টি ছিল যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। ভারতের উন্নতি প্রবর্তনের উপাদানগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ভারতকে এক অভিনব আজ্ঞাবহতার আদর্শ শিক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং মঠটি সঙ্ঘবদ্ধতার ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, যাহা ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচলিত সর্বপ্রকার আদর্শের প্রতিকূল। হাজার রকমের নূতন ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইবে। অতএব যদিও তিনি নিজে অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, দুই-তিনটি ঘর আসবাবপত্রে সাজানো হইল। মাটি-খোঁড়া, বাগান-করা, দাঁড়টানা,

ব্যায়াম ও পশুপালন প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের এবং নবীন ব্রহ্মচারিগণের জীবনের অঙ্গরূপে পরিণত হইল। কূপখনন অথবা পাঁউরুটি প্রস্তুত করার সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ণ উৎসাহের সহিত তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে যোগদান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ চড়কপূজার দিনে একটি ব্যায়াম সমিতি মঠে ক্রীড়া প্রদর্শন ও পুরস্কার লাভের জন্য আসে। ঐ উপলক্ষে স্বামীজী বলেন, তাঁহার ইচ্ছা এই হিন্দুপার্বণটি (খ্রীস্টানদের লেন্ট স্থানীয়)[১] অতঃপর বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম প্রদর্শন দ্বারা যাপন করা উচিত। তাঁহার মতে, যে শক্তি এতদিন ধরিয়া শরীর-নিগ্রহে ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছে, অতঃপর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহাকে পেশীসমূহের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত করিলে যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে।

পাশ্চাত্যমনের নিকট ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, স্বামীজীর জীবনে ইহা অপেক্ষা প্রশংসার্হ আর কিছুই হইতে পারিত না। বহুপূর্বে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চতম আদর্শের অনুধাবন ও উহাদের আদান-প্রদান রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ ব্রত (mission) বলিয়া নির্দেশ করেন। নিশ্চিতভাবে তিনি নিজের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের সামর্থ্য দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ঐরূপ ধরনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও অনিবার্য ছিল যে, সময়ে সময়ে তিনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার মর্মযাতনা ভোগ করিবেন। হিন্দুর ধর্মজীবনের আদর্শ হইল, যে শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সদাসাক্ষিস্বরূপ, অচল-অটল-অস্পর্শ, পরম ব্যোমে অবস্থিত দেবাদিদেব—এই মর্তলোক তাঁহারই প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়া। এই ধারণা তাঁহাদের মনে এত সুস্পষ্ট ও দৃঢ় বদ্ধমূল যে, মানসিক দ্বন্দ্বরূপ বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়াই কেবল উহাকে নূতন পথে প্রবর্তিত করা সম্ভব। কোন নূতন আদর্শ প্রবর্তন করিতে গিয়া ভাস্করকে যে কি মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা কেহ অনুভব করিয়াছেন কি ? তাঁহার কার্য সাধনের জন্য যে ভাবপ্রবণতা, সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ প্রয়োজন, যে নৈতিক উচ্চাদর্শ তাঁহার হাতের বাটালিস্বরূপ, অবসর মুহূর্তে তাহারাই সন্দেহ ও দায়িত্ববোধের আতঙ্ক হইয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির নিকট, যাঁহাদের জীবন অতি কঠোর কিন্তু জনসাধারণের নৈতিকবোধের দ্বারা অনুকরণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনও কত সুখময় বলিয়া মনে হয় ! বহু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য

---

১ Lent—ভগবান ঈশার উপবাসের স্মরণার্থে খ্রীস্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত চল্লিশ দিনব্যাপী উপবাস।—অনুঃ

করিয়াছি, উহারা যেন দুইটি সূতায় বোনা—একটি সূতা আমাদের নিজেদের নির্বাচিত, অপরটি, আমরা সহ্য করিয়া যাই। কিন্তু এক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব দুই পৃথক আদর্শের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের আকার ধারণ করে। ইহাদের প্রত্যেকটিই নিজের জগতে সর্বোচ্চ, আবার প্রতিপক্ষ মতাবলম্বীর নিকট মহাপাপ বলিয়া গণ্য।

মধ্যে মধ্যে কোন সঙ্গীর নিকট অন্যমনস্কভাবে তিনি দু-একটা কথা বলিয়া ফেলিতেন এবং তাহাতেই অন্তরের এই সংঘর্ষ ধরা পড়িয়া যাইত। একদিন খেতড়িরাজের সহিত অশ্বারোহণে যাইবার সময় তিনি দেখিতে পান, রাজার হাত কাটিয়া গিয়া প্রচুর রক্ত পড়িতেছে; এবং জানিতে পারেন যে, তাঁহার যাইবার রাস্তা হইতে একটি কাঁটা ডাল সরাইতে গিয়াই রাজার হাত ঐরূপভাবে কাটিয়া যায়। স্বামীজী মৃদু ভর্ৎসনা করিলে রাজপুত ব্যাপারটি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলেন, "স্বামীজী, আমরা কি চিরকালই ধর্মের রক্ষাকর্তা নই?" গল্পটি বলিয়া স্বামীজী বলিলেন, "দেখ, তারপর আমি তাঁকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'একজন সন্ন্যাসীকে আপনাদের এত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত নয়', এমন সময়ে হঠাৎ আমার মনে হলো, হয়তো তাঁরা ঠিকই করেছেন। কে জানে! হয়তো আমিও তোমাদের এই আধুনিক সভ্যতার ক্ষণস্থায়ী অত্যুজ্জ্বল ছটার মধ্যে পড়ে গেছি!" একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার মতে, যিনি চারদিকে জ্ঞান বিস্তার করতে করতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতেন এবং একস্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার সময় নাম পরিবর্তন করতেন,সেই 'রমতা সাধু'ই বহু চিন্তা ও কার্যভারপীড়িত বেলুড় মঠের মহন্ত অপেক্ষা বড় ছিলেন।" উত্তরে তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, "আমি জড়িয়ে পড়েছি।" আমেরিকার জনৈকা মহিলা যে গল্পটি বলেন, তাহাও আমার মনে আছে। তাঁর স্বামী এই অদ্ভুত অতিথিকে বুঝাইয়া বলেন যে, তাঁহাকে শিকাগো যাইতে হইবে, এবং তাঁহার মুখে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সানন্দে দেওয়া হইবে। ঐ মুহূর্তে তাঁহার মুখের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, মনে করিতেও কষ্ট বোধ হয়। মহিলাটি বলিতেন, "এই কথায় মনে হলো, তাঁর শরীরের মধ্যে যেন কোন কিছু ছিঁড়ে গেল, যা আর কখনো জোড়া লাগবার নয়।" পাশ্চাত্যে একদিন তিনি মীরাবাঈ-এর গল্প বলিতেছিলেন। উচ্চদরের সাধিকা মীরাবাঈ একসময়ে চিতোরের রানী ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাহিয়াছিলেন, শুধু তাঁহাকে রাজ অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা গেল না! শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কিন্তু কেন তিনি ঐভাবে থাকবেন না?"

স্বামীজী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কেনই বা থাকবেন? তিনি কি জগতের এই পচা পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকবেন?" শ্রোতাও সহসা বুঝিতে পারিলেন যে, বহুপ্রকার অবান্তর সম্পর্ক এবং ঘাত-প্রতিঘাত সহ সমগ্র সামাজিক জীবন স্বামীজীর নিকট অসহ্য বন্ধন ও তীব্র যন্ত্রণাস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে, ধর্মাচার্য হিসাবে স্বামীজী রৌদ্রোজ্জ্বল অনাবিলতা ও শিশুসুলভ শান্তি দ্বারা পরিবৃত থাকিলেও তাঁহার স্বদেশে আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইলাম, আর এক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে তিনি সম্পূর্ণ মানবভাবাপন্ন। আর, এক্ষেত্রে যদিও তাঁহার সকল প্রচেষ্টার ফল আমাদের অনেকের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অথবা অধিকতর স্থায়ী হইত, কিন্তু ঐজন্য তাঁহাকেও ঠিক আমাদেবই মতো অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া দীর্ঘকাল পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত। কদাচিৎ আলোক দেখা যাইত। প্রায়ই তিনি ব্যর্থতার হতাশা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন না। যে দেহযন্ত্রসহায়ে তাঁহাকে কার্য করিতে হইতেছে এবং যাহাদের তিনি মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, উভয়েরই সীমিত ক্ষমতা প্রায়ই তাঁহার চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করিত—এবং এইভাবে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার অথবা অজ্ঞাত কোন বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলিবার সাহসও তাঁহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "সবদিক ভেবে দেখলে, সত্যই আমরা কি জানি? মা-ই সব জিনিস নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করছেন। আমরা শুধু আনাড়ির মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছি।" সম্ভবতঃ মহাপুরুষগণের জীবনের এই অংশটি তাঁহাদের জীবনচরিতকারেরা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জগদীশ্বরীর প্রতি তাঁহার নিম্নোক্ত অনুযোগপূর্ণ বাক্য হইতে আমরা ইহার কিছুটা আভাস পাই, "মা, এ কি করলি? আমার সব মনটা যে এই ছেলেগুলোর উপর পড়ছে মা!" আর চতুর্বিংশতি শতাব্দী অতীত হইবার পরেও আর এক জন ধর্মাচার্যের চিত্ততটে 'ধম্মপদের' একাদশ অধ্যায়ের অনুরূপ ঝঞ্ঝার তরঙ্গাঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।[১]

---

১ অনেকজাতি-সংসারং সন্ধাবিস্‌সম্‌ অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেষন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্প নং।।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ ঝগা।।
—এই দেহরূপ গৃহের নির্মাণকর্তাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি বহু জন্মজন্মান্তর

কিন্তু আচার্যদেবের প্রকৃতিতে আর একটি জিনিস বদ্ধমূল ছিল। তিনি নিজেই জানিতেন না, কিরূপে উহার সামঞ্জস্য করিবেন।উহা হইল তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের দুর্গতির জন্য ক্ষোভ। ঐ সময়ে কয়েক বৎসর আমি প্রায় প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসস্বরূপ। একথা সত্য, তিনি ছিলেন একেবারে মূল ধরিয়া কাজ করিবার পক্ষপাতী। 'জাতীয়তা' শব্দটিও তিনি ব্যবহার করিতেন না,অথবা 'জাতিগঠনে'র যুগ বলিয়াও ঘোষণা করিতেন না। তিনি বলিতেন, তাঁহার কাজ হইল 'মানুষ তৈরি করা'। কিন্তু প্রেমিকের হৃদয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন জননী জন্মভূমি। একটি ঘণ্টাকে যদি চারিদিকের ভার সমান করিয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যেমন কোন শব্দ দ্বারা আহত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া ওঠে, তাঁহার জন্মভূমিসংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও অনুরূপভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। ভারতের চারিপ্রান্তের মধ্যে উত্থিত যে কোন কাতরধ্বনি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইত। ভারতের প্রত্যেকটি ভীতিসূচক ক্রন্দন, দুর্বলতাজনিত কম্পন, অপমানহেতু সঙ্কোচবোধ—তিনি জানিতেন এবং বুঝিতেন। ভারতের অন্যায় আচরণের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক, তাহার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর খড়্গহস্ত; কিন্তু সে কেবল ঐ দোষগুলিকে তিনি নিজেরই মনে করিতেন বলিয়া। পক্ষান্তরে, তাঁহার ন্যায় কেহই আবার ভারতের ভাবী মহিমার কল্পনায় অভিভূত হইতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে ভারতই ইংরেজী-সভ্যতার প্রসূতিরূপে প্রতিভাত হইত। কারণ, তিনি বলিতেন, আকবরের ভারতের তুলনায় এলিজাবেথের ইংলণ্ড কি ছিল? আর, ভারতের সম্পদ পশ্চাতে না থাকিলে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডেরই বা কি ঘটিত? কোথায় থাকিত তাহার মার্জিত সভ্যতা? তাহার অভিজ্ঞতাই বা কোথায় থাকিত? তাঁহার মুখ হইতে স্বদেশের ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল ও জাতিতত্ত্ব অবিরল ধারায় নির্গত হইত। ভারতীয় প্রসঙ্গ সমগ্রভাবে অথবা উহার বিশদ বর্ণনা—উভয়ই তাঁহার নিকট সমান আনন্দের ছিল—অথবা তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট ঐরূপ বোধ হইত। এমনকি, সময়ে সময়ে এরূপও ঘটিত যে, যদি কেহ স্বামীজী পূর্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তাঁহার

পরিগ্রহ করিয়াছি। হায়, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখদায়ক! হে গৃহনির্মাণকারিণী তৃষ্ণে, আমি তোমায় দেখিতে পাইয়াছি। আর তুমি গৃহনির্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার গৃহের সমস্ত পার্শ্বক (চালের 'রুয়া') ভগ্ন হইয়াছে এবং শীর্ষকাষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্ত সংস্কারবিহীন হইয়া সকল তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিয়াছে।

পক্ষে আরও অধিক শোনার সামর্থ্য থাকিত না। আবার কেহ যদি আনুপূর্বিকভাবে ঐসব মনে না রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, আরও দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে তিনি নারীজাতির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন, অথবা বিভিন্ন প্রদেশের জাতিগত আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি, কিংবা কোন জটিল অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহার এই সকল প্রসঙ্গের মধ্যে রাজপুতজাতির বীরত্ব, শিখদের বিশ্বাস, মারাঠাজাতির শৌর্য, সাধুগণের ঈশ্বরভক্তি এবং মহীয়সী নারীগণের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা যেন পুনর্জীবন লাভ করিত। মুসলমানকেও তিনি এই প্রসঙ্গে বাদ পড়িতে দিতেন না। হুমায়ুন, শের শা, আকবর, সাজাহান—ইঁহাদের প্রত্যেকের এবং আরও শত ব্যক্তির নাম তিনি কোন-না-কোন দিন, যাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে—তাঁহাদের আবৃত্তি প্রসঙ্গে যথাস্থানে উল্লেখ করিতেন। এই হয়তো তিনি আকবরের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে তানসেন রচিত গানটি, যাহা আজ পর্যন্ত দিল্লীর পথে পথে গীত হইয়া থাকে, তানসেনেরই সুর-লয় সহযোগে আমাদের গাহিয়া শুনাইলেন ; আবার আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, মোগলবংশে বিবাহিতা নারীগণ বিধবা হইলে কখনও পুনরায় বিবাহ করিতেন না। পরন্তু হিন্দুনারীর ন্যায় পূজাপাটে মগ্ন থাকিয়াই জীবনের নিঃসঙ্গ বৎসরগুলি অতিবাহিত করিতেন। আবার অন্য এক সময়ে তিনি সেই মহান জাতীয়গৌরব, প্রতিভাশালী আকবরের কথা বলিতেন—যিনি বিধান দিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সম্রাটগণের জন্ম হওয়া উচিত মুসলমান পিতা ও হিন্দু মাতা হইতে। এক সময়ে তিনি আমাদের নিকট সিরাজুদ্দৌলার উজ্জ্বল কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের বর্ণনা করেন। রুদ্ধশ্বাসে আমরা শুনিলাম, কিরূপে সেই হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল পলাশী প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক প্রদত্ত এক আদেশ শ্রবণ করিয়া আক্ষেপ সহকারে বলিয়া উঠেন, "তাহলে আজকের যুদ্ধে জয়ের আশা নেই।" এবং তারপর অশ্বসহ গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। আর সিরাজের সাধ্বী স্ত্রীর কথাও আমরা শুনিলাম, যিনি বৈধব্যের শ্বেতবাস পরিধান করিয়া আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অবস্থানপূর্বক দীর্ঘদিন ধরিয়া বৎসরের পর বৎসর পরলোকগত স্বামীর কবরের উপর দীপ জ্বালাইয়া দিতেন। তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিবার সময় দৃশ্যগুলি যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিত।

কখন কখনও কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত কৌতুক পরিহাসময় হইত। সামান্য ঘটনা উপলক্ষেই প্রসঙ্গ উঠিত। কোন মিষ্টান্নপ্রাপ্তি, অথবা মৃগনাভি বা জাফরাণের মতো

দুর্লভ বস্তুলাভ, অথবা ইহা অপেক্ষাও সামান্যতম ঘটনাই উহা আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একবার তিনি আমাদের কাছে গল্প করেন যে, যখন তিনি পাশ্চাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যায়—ভারতের কোন গ্রামের বাহিরে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ক্রীড়ারত বালকবালিকাদের তন্দ্রাজড়িত কলরব, সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা, রাখাল বালকগণের চিৎকার এবং স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলির আধ-অন্ধকারে শ্রুত অস্ফুট কণ্ঠস্বর—এইসব শুনিবার জন্য তিনি কতই না ব্যাকুল হইয়াছিলেন! বাংলাদেশে শৈশব হইতে শ্রুত সেই আষাঢ় মাসের বৃষ্টির শব্দ শুনিয়া স্বদেশের জন্য তাঁহার কতই না মন কেমন করিয়াছিল! বৃষ্টি, জলপ্রপাত, অথবা সমুদ্রের জলের শব্দ তাঁহার নিকট কত বিস্ময়কর বোধ হইত! একবার তিনি দেখিয়াছিলেন, জনৈকা জননী এক পাথর হইতে অপর পাথরে পা দিয়া পার্বত্য নদী পার হইবার সময় এক একবার মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠস্থিত শিশুটিকে খেলা দিতেছেন ও আদর করিতেছেন। এই দৃশ্যটি তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে পড়িত। তাঁহার চক্ষে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে পর্বতপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম 'হর' 'হর' 'মুক্ত' 'মুক্ত' ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করাই আদর্শ মৃত্যু।

সর্পিল-কুণ্ডলীর (spiral) উপরের বেড়গুলি যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছোট হইতে হইতে অবশেষে এক বিন্দুতে পর্যবসিত হয়, স্বামীজীর স্বদেশ-ভক্তির আবেগও ছিল সেইরূপ এক বিরাট বস্তু। স্বদেশের মাটির প্রতি ভালবাসা ও নিসর্গপ্রেম ছিল যেন উহার সর্বনিম্ন বেড়গুলি; জাতি, অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও চিন্তা সম্পর্কীয় অপর যাহা কিছু সমস্তই ছিল উহার পরবর্তী বেড়গুলির অন্তর্গত। আর সমগ্র বেড় ক্রমশঃ সরু হইয়া অবশেষে এক নির্দিষ্ট বস্তুতে কেন্দ্রীভূত—ইহাই ছিল তাঁহার দেশপ্রেমের স্বরূপ। ঐ কেন্দ্রস্থানীয় বিন্দু হইল ভারত সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভারতের সমালোচকগণ যেরূপ অনুমান করেন, ভারত ঐরূপ স্থবির বা জরাজীর্ণ নহে, পরন্তু নবযৌবন-সম্পন্না, ভাবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অতীতে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা মহত্তর এক বিকাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে—ভারত সম্বন্ধে ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার মনে পড়ে, একবার মাত্র তাঁহাকে কথার মধ্যে ঐ চিন্তা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। এক গভীর শান্ত মুহূর্তে তিনি বলিয়াছেন, "বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত বলে নিজেকে অনুভব করছি। প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, ভারত নবীন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রত্যেক কথায় এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত, তাঁহার প্রতি গল্পে ইহার স্পন্দন অনুভূত হইত। যাহা কিছু ভারতীয়, তাহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া অথবা তাহার ত্রুটির জন্য

দুঃখ প্রকাশ করা তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। আর. যখন তিনি কোন মিথ্যা অপবাদ বা অবজ্ঞাসূচক সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, অথবা কিরূপ বিশ্বাস ও ভালবাসা লইয়া দেশসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এই বিষয়ে অপরকে শিক্ষা দিতেন (অবশ্য ঐ বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁহার নিজের বিশ্বাস ও ভালবাসার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত আর কিছু হইতে পারিত না), তখন কতবারই না বোধ হইত. তাঁহার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ খসিয়া গিয়াছে, এবং ভিতরকার যোদ্ধার বর্ম বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন অনুমান না করেন যে. ঐ সকলের সহিত কতটা প্রলোভন যে আসিয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। যখন তিনি সবেমাত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "সত্য বটে, তার মনের উপর অজ্ঞানের একটা পর্দা আছে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী মা-ই রেখে দিয়েছেন, তাঁর কাজ হবে বলে। কিন্তু ওটা ফিনফিনে কাগজের মতো পাতলা, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলা যায়।" যে ব্যক্তি গৃহপরিজন ত্যাগ করিযাছে, সে যেমন তাহাদের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার চিন্তা দমন করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে, সেইরূপ তিনিও বার বার দেশ ও ইতিহাস সম্পর্কিত সকল চিন্তা সংযত ও রুদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইতেন, যাহাতে সকল দেশ ও সকল জাতির প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, নিঃসম্বল, পরিব্রাজকমাত্র হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতেন। কাশ্মীরে অবস্থানকালে জীবনের এক মহান অভিজ্ঞতালাভের পর প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শিশুর ন্যায় সরলভাবে বলেন, "আর এভাবে রাগ করা চলবে না। মা বললেন, 'যদিই বা ম্লেচ্ছ আমার মন্দিরে ঢুকে আমার মূর্তি অপবিত্র করে, তাতে তোর কি ? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি' ?"

তাঁহার নিজের আদর্শ ছিলেন সিপাহী-বিদ্রোহকালের সেই সন্ন্যাসী, যিনি এক ইংরেজ সৈনিক কর্তৃক ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া পনর বৎসরের মৌন ভঙ্গ করিয়া হত্যাকারীকে বলেন, "তুমিও তিনিই—তত্ত্বমসি।"

সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের পদানুগ হইয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতেই তিনি চেষ্টা করিতেন। নিজের কোন বাণীর উল্লেখ তাঁহার নিকট অপরাধ বলিয়া বোধ হইত। ইহা ব্যতীত, তিনি বিশ্বাস করিতেন, আবেশ প্রবণতায় শক্তির অযথা অপব্যয় হয়, শক্তিকে সংযত করিলেই তাহা সঞ্চিত হইয়া কর্মরূপে প্রকাশ পায়। তথাপি,

যথাসর্বস্ব দান করিয়া দিবার প্রবল বাসনা তাঁহাকে অভিভূত করিত, আবার উহা জানিবার পূর্বেই তিনি পুনরায় নিজের দেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে আশা ও প্রেমপূর্ণ চিন্তাধারা চারিদিকে ছড়াইতে থাকিতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইত, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই ঐ সকল চিন্তাবীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই ভারতের দূরদূরান্তর প্রান্তে তাহাদের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। মাতৃভূমির প্রতি ভক্তিতে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ, তাঁহারাই ঐ অঙ্কুর। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কোন পুস্তকাদি পাঠ না করিয়াও বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন তেমন জাতীয় জীবনের মূর্তিমান বিগ্রহ; কিন্তু ইহার বিচারমূলক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে তিনি যে উক্তি প্রয়োগ করিতেন, তাহা উল্লেখ করিয়াই বলিতে হয়, "তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করেই খুশি ছিলেন; তার ব্যাখ্যা অপরে খুঁজে বার করুক!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ

গঙ্গাতীরস্থ শষ্পাবৃত ভূমি ও বৃক্ষরাজির মধ্যেই, যে লোকগুরুর কার্যে ইতিপূর্বেই আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে পারি। আমার ভারতে পদার্পণকালে (১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি) বেলুড়ে সবেমাত্র একখণ্ড জমি ও একটি বাড়ি ক্রয় করা হইয়াছিল; তাহাই পরে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মঠরূপে পরিণত হয়। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে আমেরিকা হইতে কয়েকজন বন্ধু আগমন করেন এবং স্বভাবগত সাহসিকতার সহিত ঐ অর্ধজীর্ণ বাড়িটি অধিকার করিয়া উহাকে সাদাসিধা অথচ স্বচ্ছন্দভাবে বাসের উপযোগী করিয়া লন। এই বন্ধুগণের অতিথিরূপে বেলুড়ে বাসকালে, এবং পরে কুমায়ুন ও কাশ্মীর ভ্রমণকালেই

আমি তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষকে ভাল করিয়া চিনিতে ও স্বদেশে স্বজনগণের মধ্যে স্বামীজীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের বাড়িটি ছিল কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে নিম্ন সমতলভূমির উপরে নির্মিত। জোয়ারের সময় পানসির ন্যায় ছোট ছোট নৌকাগুলি (গঙ্গাতীরে যাহারা বাস করে, এই নৌকাগুলি তাহাদের যানবাহনের কাজ করে) একেবারে সিঁড়ির নিচেই আসিয়া লাগিত। আমাদের ও অপর পারের গ্রামের মধ্যে নদীটির বিস্তার ছিল অর্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল। নদীর পূর্বতীরে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত। মন্দির সংলগ্ন এই উদ্যানেই স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বাস করিতেন। যে বাড়িটি এখন মঠরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের কুটির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। মঠবাড়ি ও আমাদের কুটিরের মধ্যে অনেকগুলি বাগানবাড়ি এবং অন্ততঃ একটি নালা ছিল। তালগাছের গুঁড়ি চিরিয়া তাহার অর্ধাংশ দ্বারা নির্মিত একটি পুলের উপর দিয়া নালাটি পার হইতে হইত; পুলটি দেখিলে সন্দেহ হইত, ভার সহিতে পারিবে কি না। আমাদের এই বাড়িতেই স্বামীজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী অথবা কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ আসিতেন। এখানেই প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপ্ত হইবার পর বৃক্ষতলে বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা স্বামীজীর অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ শ্রবণ করিতাম। ভারতীয় জগতের কোন না কোন গভীর রহস্য তিনি উদঘাটন করিতেন। কদাচিৎ প্রশ্নোত্তর স্থান পাইত। এইকালের কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবি, কিরূপে এই বিপুল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব, আবার সঞ্চয় করিলেও উহা বিতরণ করিবার প্রবল শক্তিই বা কিরূপে আসে! কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনায় যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহাদের মধ্যেও এক বিষয়ে স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল। কথাবার্তার মাঝখানে কেহ বাধা দিলে তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। যাহাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতেন, সেই শ্রোতাদের মনোভাব সম্পর্কে উদাসীন থাকিতেন না। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা লইয়া যাঁহারা আলোচনায় যোগদান করিতেন, কেবল তাঁহাদের উপস্থিতিকালেই তাঁহার গভীরতম উক্তিগুলি শোনা যাইত; বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে সচেতন থাকিতেন বলিয়া বোধ হয় না। বহুবার তিনি উত্তেজিত হইতেন, কিন্তু যেমন কোন অজ্ঞাত কারণে মনে মধুর ভাবের উদয় হইত, তৎকালীন মানসিক উত্তেজনাও তেমন সম্পূর্ণ সাধারণ কোন অজ্ঞাত কারণেই প্রকাশ পাইত; কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত উহার যোগ থাকিত না।

এখানেই আমরা জানিতে পারি, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মূলমন্ত্র কি, এবং কোন্ আদর্শ দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত। কারণ, কথাবার্তার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শেরই ব্যাখ্যা করা হইত। একথা সত্য, ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হইত ইতিহাস, সাহিত্য ও অন্যান্য সহস্র উপকরণ হইতে ; কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল সর্বদাই এক আধ্যাত্মিক পূর্ণত্বলাভ সম্পর্কে ভারতীয় আদর্শকে স্পষ্টতর করা। যেরূপ মনে হইত, আদর্শগুলি বস্তুতঃ সকল সময়ে সেরূপ সহজবোধ্য ছিল না। এই ভারতীয় জগতে সহজাত পরোপকার-বৃত্তির পুষ্টিসাধনের জন্য যতটা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উহা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর কি না, তাহা তর্কযুক্তিসহায়ে প্রমাণ করিবার সময় এখনও আসে নাই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীজীর নির্ভীক উপদেশ ছিল, ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিতে হইবে (বা নৈর্ব্যক্তিক অবস্থালাভই লক্ষ্য)। শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে, এই তত্ত্বের পরিবর্তে 'সাক্ষিস্বরূপ হও' এই উপদেশ অধিক শোনা যাইত। কারণ, জগতে আমার কোন শত্রু আছে, তাঁহার মতে এই চিন্তা দ্বেষবুদ্ধির প্রমাণ। প্রেম যদি 'অহেতুক' না হয়, তবে উহা কোনক্রমেই প্রেম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না—একথা দৃঢ়তার সহিত উচ্চারিত হইত। পাশ্চাত্য বক্তা হয়তো 'উদ্দেশ্যবিরহিত' শব্দদ্বারা ঐ ভাবটিকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহাতে অত জোর প্রকাশ পাইবে না। ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণে কখনও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। আমাদের সকল চিন্তার মধ্যে বিরাজ করিতেন শ্রীমহাদেব—যিনি নিজের সৃষ্ট ত্রৈলোক্যের রাজত্ব অথবা পিতৃত্ব, ঐশ্বর্য অথবা সুখ—কোন কিছুর দ্বারাই প্রলুব্ধ নন, বরং সাংসারিক দৃষ্টিতে ঠিক বিপরীত একজন অতি 'সাদাসিধা ব্যক্তি' কোন কৌতূহল নাই, সহজে প্রতারিত—যিনি প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। তিতিক্ষা অথবা অন্যায়ের প্রতিকার না করাই হইল ধর্মজীবনের চিহ্ন। পাশ্চাত্যে আমরা ইহার উদাহরণ সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত সাধুর মধ্যে পাই। আঙ্গুলের গাঁট হইতে কৃমিকীট পড়িয়া গেলে তিনি হেঁট হইয়া তাহাদের পুনর্বার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতেন, "ভাই সব, খাও।" জীবের অন্যতম সিদ্ধিলাভ হইল রঘুনাথের দর্শনপ্রাপ্তি। যে সাধু সম্মুখস্থ কয়েকটি বলদকে প্রহৃত হইতে দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুকের দাগগুলি ফুটিয়া ওঠে, তিনি ঐ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় একটি ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য স্বামীজী আমাদের আহ্বান করেন। তাঁহার মতে দেহবোধের একান্ত অভাবই পূর্ণ সাধুত্বের লক্ষণ। ঐ দেহবোধের অভাব এত গভীর,

সাধু যে উলঙ্গ অবস্থায় রহিয়াছেন ; সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন বোধই নাই। নগ্নতার মধ্যেও বিশেষ স্থলে উচ্চতর ভাব উপলব্ধি করিবার যে সূক্ষ্মবিচারবোধ—পাশ্চাত্যে তাহার প্রকাশ ললিতকলায় ; ভারতে উহার বিকাশ ধর্মে। কোন গ্রীক প্রতিমূর্তির সম্মুখে আমরা যেমন সৌন্দর্যের আদর্শ হিসাবে একটা শ্রদ্ধার ভাব উপলব্ধি করি, হিন্দুরা তেমনি নগ্ন সাধুর মধ্যে মাহাত্ম্য ও শিশুসুলভ পবিত্রতা দেখিয়া থাকেন।

কিন্তু এই নূতন চিন্তা-জগতে ধর্মজীবনে চিত্তের একাগ্রতার ন্যায় যে আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ ভাবে প্রধান ও সর্বজনীন বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইল জীবাত্মার স্বাধীনতা। চিন্তা, মতামত এবং কর্মের ছোটখাটো অধিকারগুলি ছিল উহার অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র এই অধিকারটি নিজস্ব মনে করিয়া সাধুরা উহা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সম্পদ, যেখানে তাঁহারা কোন প্রকার অনধিকার প্রবেশ সহ্য করিতে পারেন না। প্রাত্যহিক জীবনে এই ভাবটি কিরূপে রূপায়িত করা হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিলাম, উহা একপ্রকার ত্যাগেই পরিণত। যতই সুখকর হউক, যদি উহা বন্ধন-শৃঙ্খলে আবৃত থাকে, তবে কিছুতেই গ্রহণ করা চলিবে না ; এক কথায়, বন্ধনের ইঙ্গিতমাত্র থাকিলে তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে ! ইহার জন্য চিত্ত কতদূর নির্মল, ইচ্ছাশক্তি কতদূর শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আবার এই আদর্শই কত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয় ! এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম যে তেমন বিকাশ লাভ করে নাই, ইহাই তাহার কারণ। অতীতে ধর্মজীবনে যে সকল মহাপুরুষ আদর্শস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহারা কুটিচক অথবা পরিব্রাজক যাহাই হউন, সর্বদা একাকী বাস করিতেন। আমাদের নিকটস্থ মঠে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া শুনিতাম, যাঁহারা তাঁহাদের নেতার মেয়েদের সহিত বাক্যালাপ পছন্দ করিতেন না। কেহ কেহ ছিলেন সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের বিরোধী। একজনের ধর্ম ছিল ব্যক্তি-উপাসনায় পর্যবসিত, যাহাকে প্রায় নাস্তিকতা বলা যাইতে পারে। আবার, একজনের ধর্ম তাঁহাকে এমন সব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিত, যাহা আমাদের অনেকের নিকটেই অসহনীয় মনে হইত। কয়েকজন বাস করিতেন 'মহাপুরুষ' ও নানাবিধ দর্শনের এবং অলৌকিক রাজ্যে ; আবার কেহ কেহ এইসব অর্থহীন ব্যাপার একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিতেন না, তবে চুলচেরা তর্কযুক্তিসহায়ে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন। এই বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা নির্বিবাদে প্রমাণ হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকের নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইবার অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার এই সূত্রেই তখন এবং

পরেও আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারি নাই যে, ইহাই ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন শাসনপদ্ধতির ব্যর্থতার কারণ। যাহাতে উচ্চস্তরের ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ চরিত্রের ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র ও নগর সংক্রান্ত কর্মে নিজেদের সম্যকরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, সঙ্ঘবদ্ধ কার্যই প্রশস্ততর ও সম্মানজনক। অতএব ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের উদ্যম থাকা উচিত। প্রাচীন ভারতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আধ্যাত্মিক আদর্শ বিষয়ে অত্যধিক সচেতন থাকিতেন—বিশেষতঃ স্বাধীনতাবোধের ফলে নগর ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি তাঁহারা কোন প্রকার আগ্রহ বোধ করিতেন না। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই যে, তাঁহাদের ক্ষমতা ও চরিত্রবল থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিধিব্যবস্থার সুযোগসুবিধা কার্যে রূপায়িত করিবার ভার পড়িয়াছে আধুনিক ব্যক্তিগণের উপর। তথাপি এই সকল কার্য সম্যকরূপে ধারণা ও পোষণ করিবার এবং উন্নতির অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে হিন্দুধর্মে বিদ্যমান, আমার বিশ্বাস, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও জাতীয় চিন্তাভাণ্ডারে তাঁহাদের বিশিষ্ট দান হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে।

স্বামীজী মনে করিতেন, পাশ্চাত্য চরিত্রের এক মহাদোষ, তাহারা নিজেদের পক্ষে যাহা কল্যাণকর মনে করে, অপরের উপর বলপূর্বক তাহা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা। গম্ভীরভাবে তিনি বারবার আমাদের ঐ দোষ পরিহার সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার চির অভীপ্সিত 'আদর্শ-বিনিময়ের'ই ইহা অন্যতম উদাহরণ। আবার সেই সঙ্গে তাঁহার আপনার লোকেরা যখন প্রশ্ন করেন, তিনি তো স্বদেশে ইংরেজদের দেখিয়াছেন, তাহারা কোন্ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষসাধন করিয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয়? তখন স্বামীজী উত্তরে বলেন, "আত্মসম্মান বজায় রেখে কিরূপে আজ্ঞাবহ হওয়া চলে, এটা তারা শিখেছে।"

কিন্তু বেলুড়ে আমরা কেবল স্বামীজীকেই দেখি নাই। সারা মঠই আমাদের অতিথি মনে করিতেন। সেইজন্য অতিথিপরায়ণ সাধুগণ কখনও আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ, কখনও বা সেবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতেন। যে গাভীটি আমাদের দুধ দিত, তাহাকে তাঁহারাই দোহন করিতেন। যে ভৃত্যের উপর রাত্রে ঐ দুধ পৌঁছিয়া দিবার ভার ছিল, সে যখন একদিন পথে গোখুরা সাপ দেখিয়া ভয় পায় ও যাইতে অস্বীকার করে, তখন সাধুদের মধ্যেই একজন ঐ কার্যের ভার গ্রহণ করেন। ভারতীয় গৃহস্থালীর আমাদের অজানা সমস্যাগুলির

সমাধানের জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত হইতেন। একজনের উপর ভার ছিল বাংলা শিখাইবার। সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই সৌজন্যবশতঃ এবং অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আর যখন স্বামীজী স্বয়ং কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র যাইতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ-না-কেহ অতিথিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করিয়া প্রাতঃকালের চায়ের টেবিলে নিয়মিতভাবে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন। এইরূপ সহস্র উপায়ে আমরা সেই সব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—যাঁহাদের কথাবার্তার মধ্যে স্মৃতির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিত। ঐ স্মৃতিই ছিল 'টানা' যাহার উপর 'পড়েনে'র মতো এই সব ত্যাগীর জীবন বোনা হইয়াছিল।

কারণ, যে সব সন্ন্যাসিগণ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। মাত্র তের-চৌদ্দ মাস হইল স্বামীজী তাঁহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এবং তখনও পর্যন্ত প্রথম দর্শনজনিত আনন্দ ও বিস্ময় অপনীত হয় নাই বলিলেই চলে। তাহার পূর্বে প্রায় ছয় বৎসর কাল স্বামীজী একরূপ নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন। সত্য বটে, শেষের দিকে তাঁহাদের সহিত ঘন ঘন পত্র ব্যবহার ছিল, এবং কোন সময়ে এরূপ হয় নাই যে, তাঁহারা স্বামীজীর গতিবিধি সম্পর্কে একেবারে অবহিত ছিলেন না। স্বামীজীর জীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহার গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর গুরুভ্রাতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই আমেরিকায় তাঁহার প্রথম সাফল্যের সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহারা অনুমান করেন যে, ইনি তাঁহাদেরই স্বামী বিবেকানন্দ।

যাঁহারা কোথাও কোন মহাত্যাগীর জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, নিজের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার, অতি তুচ্ছ ও যাহাদের কেহ খোঁজ খবর রাখে না, এরূপ বস্তুর সহিত একাত্ম হইয়া যাইবার, এবং লোকসঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া গিয়া তাহাদের স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল আবেগময় ত্যাগজীবনের অঙ্গস্বরূপ। আমার মনে হয়, দীর্ঘকাল-ব্যাপী মৌন, নির্জন গুহাবাস এবং বন হইতে বনে, গ্রাম হইতে গ্রামে ভ্রমণ করিবার সময় মৃত্তিকা ও বিভূতি অঙ্গে লেপন প্রভৃতি এই প্রকার ধর্মের যে-সহস্র বৈশিষ্ট্য আছে, পাশ্চাত্য দর্শক বাহির হইতে যাহার অর্থবোধ করিতে পারেন না, ইহাই তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ভাবটি স্বামীজীর মনে বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এবং

একথা নিশ্চয়, কেহ যাহাতে তাঁহার কোন সন্ধান না পায়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি বারবার গুরুভ্রাতাদের ছোট দলটিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। এইরূপ এক যাত্রায়, তিনি হাথরাসে পীড়িত হইয়া রহিয়াছেন শুনিয়া গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষতঃ স্বামীজীর সহিত, এরূপ ভালবাসার বন্ধন ছিল যে, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্বামীজী প্রত্যাবর্তন করিবার কয়েকমাস পরে তাঁহার এক শিষ্যের মঠে আগমন ঘটে। পর্যটনকালে স্বামীজী তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম ছিল স্বামী সদানন্দ। সদানন্দের ভাঙা-ভাঙা অথচ বলিষ্ঠ ইংরেজীতে প্রদত্ত বিবরণ হইতে এইকালে স্বামীজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করি। পূর্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য সদানন্দকে দুই-তিন মাস রেলে চাকরি করিতে হয়। মঠে পৌঁছিয়া দেখিলেন, স্বামীজী পুনরায় বাহির হইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার জন্য তিনি যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং সেই সন্ধ্যায় যে যাত্রারম্ভের কথা ছিল, এক বৎসরের পূর্বে তাহা আর ঘটিয়া ওঠে নাই। এইকালের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজীর প্রথম শিষ্য গর্বের সহিত বলিতেন, "স্বামীজীর জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ আমাকে নিয়ে।"

এই বৎসর স্বামীজী "একদমে চব্বিশঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁর এত কাজ ছিল যে, প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।" অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে তিনি গাত্রোত্থান করিতেন, এবং "জাগো, জাগো সকলে, অমৃতের অধিকারী", এই গানটি গাহিতে গাহিতে সকলকে উঠাইয়া দিতেন। তারপর সকলে একত্র ধ্যানে বসিতেন। অতঃপর যেন অজ্ঞাতসারেই ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে উপনীত হইতেন এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বা তাহার পরেও উহা চলিত। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে ক্রমে ইতিহাস-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত। কখনও ইগ্নেশিয়াস লায়োলার[১] গল্প, কখনও জোয়ান অব আর্ক

---

১ Ignatius de Loyola (১৪৯১-১৫৫৬ খ্রীঃ)—ইউরোপের বিখ্যাত জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইনি স্পেনের এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে যুদ্ধবিদ্যার চর্চা করেন। পরিশেষে একবার আহত হইয়া দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকেন। সেখানে উপন্যাসাদি নিঃশেষ হওয়ায় 'মহাপুরুষগণের জীবনী' পাঠ করিতে বাধ্য হন। এই পুস্তক পাঠের ফলে তাঁহার জীবনে প্রবল ধর্মভাব জাগরিত হয়। ১৫২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে তাঁহার মধ্যে অপূর্ব সেবাভাব ও তপস্যার বিকাশ দেখা যায়। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঈশা সমিতি (Society of

অথবা ঝান্সীর রানীর গল্প হইত। আবার কখনও স্বামীজী কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' হইতে দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি করিতেন, এবং সকলে যেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দুলিতে দুলিতে সমস্বরে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন, "সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক" : "সাধারণতন্ত্রের জয় হোক !" অথবা তাঁহারা সেন্ট ফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসির কথায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। নাট্যকার যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে স্বভাববশে নাটকের পাত্রগণের সহিত একাত্ম হইয়া যান, তেমনি তাঁহারাও উক্ত মহাপুরুষের "মৃত্যু, তোমায় স্বাগত জানাই", এই বাক্যটি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বেলা একটা-দুইটার সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—যিনি ছিলেন একাধারে এই সঙ্ঘের পাচক, গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক ও পূজারী—তাঁহাদের বকুনি দিয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু আবার তাঁহারা একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলিত সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর দুইঘণ্টা ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। অনেক সময় তখনও তাঁহাদের তন্ময়তা ভঙ্গ হইত না, আবার ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতে করিতে তাঁহারা ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন। অথবা ছাদের উপর বসিয়া মধ্যরাত্রি অতীত হইবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা নামগান করিতেন, 'জয় সীতারাম !' 'জয় সীতারাম !' সকল ধর্মের বিশেষ বিশেষ পর্বগুলি উহাদের উপযোগী বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় তাঁহারা মেষপালকদের মতো মাথা-বাঁকানো লম্বা ছড়ি হস্তে জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ির চারিপার্শ্বে অর্ধশায়িত অবস্থায় অনুচ্চস্বরে আলোচনা করিতেন ; কেমন করিয়া এক নির্জন স্থানে কয়েকটি মেষপালক তাহাদের মেষযূথের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল, এমন সময়ে দেবদূতগণ সেখানে শুভাগমন করেন এবং কিরূপে সেই দিনই জগতের প্রথম গ্লোরিয়া নামক [১] স্তবগানের উৎপত্তি হয়। একবার গুড্‌ফ্রাইডে উৎসব তাঁহারা কিরূপে সম্পন্ন করেন, তাহার গল্পটি কৌতুকাবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল এবং ক্রমে ক্রমে, ঐ উৎসব যাঁহারা পালন করেন তাঁহাদের যেমন উৎকট ভাবাবস্থা হয়, তাঁহারাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। আহারের কথা চিন্তা করা চলিবে না। যে কয়টি আঙুর তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার রস বাহির

Jesus) স্থাপন করেন। ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতি পুষ্টিলাভ করিয়া পোপ তৃতীয় পল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে ইনি 'সেন্ট' আখ্যায় ভূষিত হন।—অনুঃ

১ "স্বর্গে ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত হউক, এবং পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করুক !" —দেবদূতগণের গীতি

করিয়া জলের সহিত মিশানো হইল। একই পাত্র হইতে সকলে উহা পান করিবেন, তাহার উদ্যোগ চলিতেছে, এমন সময়ে দরজায় একজন ইউরোপীয় অতিথির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে আছ, খ্রীস্টের দোহাই, দরজা খোল।" এক অবর্ণনীয় আনন্দের সঙ্গে দশ-পনের জন ছুটিয়া গিয়া অতিথির চারিদিকে জড় হইলেন। সকলেই একজন খ্রীস্টানের মুখে ঐদিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উৎসুক। কিন্তু তিনি বললেন, "তিনি মুক্তিফৌজের লোক, গুড্‌ফ্রাইডের কথা কিছুই জানেন না। তাঁরা কেবল জেনারেল বুথের জন্মদিন পালন করে থাকেন।" স্বামী সদানন্দ বলিলেন, "তিনি আরও কি কি বলেছিলেন, আমার মনে নেই।" কথাগুলি বলিতে বলিতে বক্তার মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর যেরূপ বিষাদপূর্ণ হইয়া গেল, তাহাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সাধুরা এই আবিষ্কারে কিরূপ হতাশা বোধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, আশাভঙ্গের প্রথম মুহূর্তেই তাঁহারা, "আপনার এটা রাখবার অধিকার নেই" এই কথা বলিয়া পাদ্রী বেচারার হাত হইতে বাইবেলখানা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। যাহা হউক, শোনা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্য দরজা দিয়া চুপি চুপি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন, এবং কিছু আহার করাইয়া গোপনে তাঁহার জিনিসটি প্রত্যর্পণ করেন।

যিনি এই সব কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন, তিনি উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখে বলিতে লাগিলেন, "সে সময়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হতো, এক মুহূর্ত বিশ্রাম ছিল না। বহু বাইরের লোক যাতায়াত করতেন, পণ্ডিতেরা তর্ক আলোচনা করতেন। স্বামীজী কিন্তু এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া থাকতেন না। কখন কখনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য একলা থাকবার অবসর পেতেন ; সেই সময় তিনি 'হরিবোল, হরিবোল' ! অথবা 'মা মা'! বলতে বলতে পায়চারি করতেন। এই সব উপায়ে তিনি নিজেকে তাঁর মহৎ কার্যের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। আমি সর্বদা দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতাম, এবং অবসর পেলেই বলতাম, 'মশাই, আপনি কি খাবেন না ?' প্রত্যেকবারই তিনি কোন-না-কোন কৌতুকপূর্ণ উত্তর দিতেন।" কখনও রন্ধনের সময় অথবা ঠাকুর পূজার সময় এইরূপ কথাবার্তা চলিত ; এই সব কার্যে কোন প্রকার পার্থক্য না করিয়া সকলেই যোগ দিতেন। এই সময়ে সাধুদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাদের নিকট আহারপ্রার্থী হইয়া আসিত। তাঁহাদের নিজেদের সম্বল ছিল অতি অল্প। মঠের বাহিরে গায়ে দিয়া যাইবার মতো একখানি মাত্র ভাল চাদর ছিল। চাদরটি দড়িতে ঝুলানো থাকিত, এবং যে কেহ বাহিরে যাইবার সময় লইয়া যাইতেন। দ্বিতীয় উত্তরীয় রাখিবার সঙ্গতি ছিল না। তথাপি যেভাবে হউক দরিদ্র ও অভ্যাগতদের জন্য আহার্য সংগৃহীত হইত। সাহায্য বা উপদেশের জন্যও অনেকে আসিতেন। তাঁহারা আবার

অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েক শত গীতা ও Imitation of Chirst (ঈশানুসরণ) ক্রয় করিয়া বিতরণ করেন। পুস্তক দুইটি ঐ সময়ে সঙ্ঘের নিকট বিশেষ আদরের ছিল। বহু বৎসর পরে ঐ দ্বিতীয় পুস্তকের যে বাক্যটি স্বামীজী যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন, তাহা হইল, "ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর ! আর ভবিষ্যদ্‌বক্তাগণ, তোমরাও থামো। হে প্রভো, একমাত্র তুমিই আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে কথা কও !" টমাস-আ-কেম্পিসের গ্রন্থের ঐ অংশটুকুই কেবল তাঁহার মনে ছিল। বোধ হয়, একথা বলার আর প্রয়োজন নাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই হিন্দুসন্তানগণের মন হইতে ঐ পুস্তকখানির প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল, এবং উহার পরিবর্তে গীতার সৌন্দর্য ও প্রভাব দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

প্রায় একবৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। স্বামীজী অতঃপর যোগী পওহারীবাবাকে[১] দর্শন করিবার জন্য গাজীপুর গমন করেন। স্বামীজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই এই যোগীকে স্থান দিতেন। সেখানে স্বামীজী যে অমূল্য সম্পদ লাভ করেন, অপর সকলের সহিত তাহা একত্র সম্ভোগ করিবার জন্য দুই মাস পরে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সহসা সংবাদ আসিল, স্বামী যোগানন্দ নামে তাঁহাদের এক গুরুভ্রাতা বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া এলাহাবাদে পড়িয়া আছেন। কয়েকজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য ছুটিলেন ; স্বামীজীও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

আমরা পুনরায় স্বামী সদানন্দ-প্রদত্ত বিবরণের অনুবর্তন করিব। এলাহাবাদে বেশ কিছুদিন ধর্মচর্চায় অতিবাহিত হয়। স্বামী যোগানন্দের পীড়া যেন উপলক্ষ মাত্র ; যেন তাঁহার মাধ্যমে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হইল। সমগ্র শহরের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল। সারাদিনরাত্রি ক্রমাগত ছোট ছোট দলে লোকজন যাতায়াত করিতে লাগিল। স্বামীজীর মনও এই সময়ে সর্বদা উচ্চভাবে অবস্থান করিত। একদিন তিনি এক মুসলমান পরমহংস সাধুকে দর্শন করেন, "তাঁর অঙ্গের প্রত্যেকটি রেখা বলে দিল যে, ইনি একজন পরমহংস।" এক পরম মুহূর্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।

---

১ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে এই যোগী হোমাগ্নিতে নিজ দেহ আহুতি দিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥"

অর্থাৎ, আত্মবিৎ পরমহংসগণ কখনও দিগম্বর, কখনও উত্তম বস্ত্রধারী, কখনও বল্কল বা চর্ম পরিহিত, আবার কখনও জ্ঞানমাত্রে আচ্ছাদিত, বালকবৎ, উন্মত্তবৎ, কখনও বা পিশাচবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্যের 'বিবেক চূড়ামণি' হইতে পরমহংসের এই লক্ষণগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে—শিষ্যের ভাষায়—উৎসাহের সহিত তাঁহাদের সারারাত্রি অতিবাহিত হইত। সম্ভবতঃ এইরূপ নানা প্রকার ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এক পক্ষকাল কাটে। অতঃপর তাঁহারা এলাহাবাদ পরিত্যাগ করেন এবং দুইজন অথবা তিনজন করিয়া গঙ্গাতীরে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের বিরাট সাফল্যলাভের পূর্বে আর প্রত্যাগমন করেন নাই।

এবার তিনি যাত্রা করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত। স্বামীজীকে তিনি আলমোড়া লইয়া যান এবং সেখানে এক গৃহস্থের অতিথিরূপে রাখিয়া দেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের তিব্বত যাত্রাকালে এই গৃহস্থটি তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, পার্বত্য পথে ভ্রমণকালে স্বামীজী একদিন ক্ষুধায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া একজন মুসলমান একটি শশা কাটিয়া তাঁহাকে খাইতে দেয় এবং বলিতে গেলে উহাতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। কতদিন ধরিয়া ভ্রাতৃদ্বয় অনাহারে ছিলেন জানি না। সম্ভবতঃ এই সময়ে স্বামীজীর এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে, আহার, পানীয় প্রভৃতি অযাচিত আসিলে তবেই গ্রহণ করিবেন। অন্ততঃ পরে এক সময়ে তিনি ঐরূপ সঙ্কল্প করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। এই ভ্রমণকালে তাঁহাকে জানিতেন, এইরূপ এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন যে, এই কঠোর সাধনার সময়ে কখনও তাঁহাকে পাঁচদিন পর্যন্ত একাদিক্রমে অনশনে থাকিতে হইয়াছে।

ইহার পর তাঁহার গতিবিধির সূত্র হারাইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে তিনি পত্র লিখিতেন, কিন্তু সাধুরা তখন নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামী সদানন্দ বলেন, স্বামীজী চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা বড় নিরানন্দে দিন যাপন করিতেন। আবার প্রথম মঠ বাড়িটিও ছাড়িয়া দিবার কথা হইতেছিল। কারণ, গৃহস্বামী ঐ স্থানে নূতন বাড়ি নির্মাণ করিবেন বলিতেছিলেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী কিছুতেই শ্রীগুরুর ভস্মাবশেষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অটল

পর্বতের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, সম্পদে-বিপদে ঐ ভস্মাবশেষ ও গুরুভ্রাতাদের মাথার উপর আচ্ছাদন রাখিতেই হইবে, যতক্ষণ না তাঁহারা পুনরায় সকলে ঠাকুরঘরে একত্র হইতে পারেন। অতঃপর তিনি, স্বামী নির্মলানন্দ, মধ্যে মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ নামক একজন এবং বাসন মাজা ইত্যাদি কার্যে রত সঙ্ঘের নবাগত সদস্যের সহিত কিছুদূরে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের নিকটে, এক গৃহে স্থান পরিবর্তন করেন, এবং পূর্বে যে মঠ বরাহনগরে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন আলমবাজার মঠ নামে অভিহিত হইল।

এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ সর্বদা স্বামীজীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তিনি শুনিতে পাইতেন, স্বামীজী অমুক শহরে রহিয়াছেন ; শুনিয়াই সেখানে ছুটিতেন, কিন্তু গিয়া দেখিতেন, স্বামীজী সেইমাত্র চলিয়া গিয়াছেন ; কোথায় গিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। একবার স্বামী ত্রিগুণাতীত গুজরাটের কোন এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে বিপদে পড়েন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন, এক বাঙালী সাধু প্রধান মন্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন ; তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে নিশ্চিত পাওয়া যাইবে। সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়া ত্রিগুণাতীত দেখিলেন, সেই অজ্ঞাত সাধু স্বয়ং স্বামীজী। স্বামীজী কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গুরুভ্রাতাকে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে বলিলেন, এবং স্বয়ং একাকী যাত্রা করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের মহান বাক্য তিনি সর্বদা আবৃত্তি করিতেন, "সিংহ যেমন সামান্য শব্দে ভীত হয় না, বায়ু যেমন কদাপি জালে আবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইরূপ গণ্ডারবৎ একাকী বিচরণ কর।" এই কথাগুলি যেন ঐ সময়ে তাঁহার মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল।

এখন আমরা জানি, আলমোড়াতেই তিনি সংবাদ পান যে, তাঁহার শৈশবের প্রিয় ভগিনী অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যপ্রদেশে চলিয়া যান, এবং তাঁহার কোনপ্রকার খবর আর পাওয়া যায় না। বহু বৎসর পরে একজন স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই মৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং উহার তীব্র যন্ত্রণা মুহূর্তের জন্যও উপশম হয় নাই। আমরা বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি ভারতের নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে তাঁহার যে প্রবল আগ্রহ দেখা যাইত, তাহার কিছুটা অন্ততঃ এই মর্মবেদনা হইতে সঞ্জাত।

এই সময়ে কয়েক মাস তিনি এক পার্বত্য গ্রামের ঊর্ধ্বদেশে গুহার মধ্যে বাস করেন। মাত্র দুইবার আমি তাঁহাকে এইকালের অনুভূতির বিষয় উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। একবার তিনি বলেন, "আমাকে কাজ করতে হবে, এই ধারণা এই সময়ে

যতটা অভিভূত করে, সারা জীবনে আর কখনও তা করেনি। মনে হতো, কে যেন আমাকে জোব করে এক গুহা হতে আর এক গুহায় জীবন-যাপনে বিরত করে নিচে সমতল প্রদেশে বিচরণ করবার জন্য ফেলে দিল।" আর একবার তিনি অপর একজনকে বলিয়াছিলেন, "সাধু কি রকম জীবন যাপন করছে, সেটাই তার সাধুত্বের পরিচায়ক নয়। কারণ, গুহার মধ্যে বসে থেকেও কেউ অনায়াসে মনে মনে রাত্রির আহারের জন্য কখানা রুটি মিলবে এই প্রশ্নে নিমগ্ন থাকতে পারে।"

সম্ভবতঃ এই কালের অবসানেই এবং যে শক্তি ক্রমাগত তাঁহাকে যেন সামনেব দিকে ঠেলিয়া দিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিতেন, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ তিনি কন্যাকুমারিকায় মাতা কুমারীকে পূজা করিবার সঙ্কল্প করেন। ধীরে-সুস্থে তিনি এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করেন, তথাপি প্রায় দুই বৎসব লাগিয়া থাকিবে। মনে হয়, এই ভ্রমণকালের শেষের দিকে তিনি ভারতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনুশীলন করিয়াছিলেন। এই কালের প্রচলিত কাহিনীর আর শেষ নাই। এত বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। শিখদের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন; মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের নিকট মীমাংসা-দর্শন এবং জৈনদের নিকট জৈন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; রাজপুত রাজগণ তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন; মধ্যভারতে এক মেথব পরিবারেব সহিত তিনি কয়েক সপ্তাহ বাস করেন; মালাবারের জাতিগত দুর্বোধ্য বিষয়গুলি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পান। জন্মভূমির বহু ঐতিহাসিক দৃশ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া অবশেষে যখন তিনি কন্যাকুমারিকায় পৌঁছিলেন, তখন কন্যাকুমারীর মন্দিরের অদূরে শৈলদ্বীপে যাইবার নৌকা ভাড়া দিবার সামর্থ্য পর্যন্ত তাঁহার ছিল না। সুতরাং সঙ্কল্পিত পূজাদানের পর, হাঙ্গর থাকা সত্ত্বেও সাঁতার দিয়া প্রণালী পার হইয়া তিনি দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজ হইয়া উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন কালেই তিনি একদল অনুরক্ত শিষ্য লাভ করেন, যাঁহারা তাঁহার আমেরিকা গমনের উপলক্ষ হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের বোধ হয় প্রথম সপ্তাহে তিনি বোম্বাই হইতে জাহাজে ঐ মহাদেশে যাত্রা করেন।

কিন্তু এই যাত্রায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যগণ বলেন যে, ঐ উদ্দেশে সংগৃহীত প্রথম পাঁচশত টাকা তিনি তৎক্ষণাৎ পূজা ও দানে ব্যয় করিয়া ফেলেন, যেন তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করাইবার ভার তিনি জোর করিয়া নিজ অদৃষ্টের উপরেই চাপাইবেন। এমনকি, বোম্বাই পৌঁছিবার পরেও তিনি পাশ্চাত্যে যাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মনে দ্বন্দ্ব

চলিতেছিল, এমন সময় তিনি অনুভব করেন যে, তাহাব শ্রীগুরুর মূর্তি যেন বার বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। অবশেষে তিনি গোপনে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে লিখিলেন, তিনি যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন ও আশীর্বাদ করেন ; বিশেষ করিয়া অনুনয় কবিলেন, পুনবায় তাঁহার পত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই নূতন যাত্রা সম্পর্কে যেন কাহাকেও কিছু না বলেন। এই পত্রেব উত্তরে শ্রীশ্রীমার আন্তরিক উৎসাহ এবং ভগবৎসমীপে তাঁহার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিবেন এই আশ্বাসবাণী লাভ করিযা তবে তিনি ভারত পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যে যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত আর অদৃষ্টকে পরিহার করিবার উপায় রহিল না। যে অভিপ্রায়ে তিনি মঠ পরিত্যাগ করেন, সেই আত্মগোপনের আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি ভারতে প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছিবামাত্র নাম পবিবর্তন করিতেন। বহু বৎসর পরে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শ্রবণ করেন, কিরূপে শিকাগো নগরীর সেই প্রথম বিখ্যাত বক্তৃতার পর তিনি সারারাত্রি ধরিয়া এই ভাবিয়া মর্মযাতনা ভোগ করেন যে, তাঁহার এই বিজয়-গৌরবের ফলে আত্মগোপনের আশা একেবারে নির্মূল হইয়া গেল। এখন তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে লোকচক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান। অজ্ঞাত ভিক্ষুক আর অজ্ঞাত থাকিতে পারিলেন না। যে সত্যসমূহ আমার গুরুদেব উপলব্ধি করেন এবং যাহা তাঁহার জীবনে প্রমাণীকৃত ও প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার এই ভ্রমণের মধ্যেই তাহার তৃতীয় ও শেষ উপাদান নিহিত।

আমার মনে হয়, একথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁহার জীবনগঠনের মূলে ছিল ত্রিবিধ প্রভাব ঃ প্রথমতঃ, তাঁহার ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষা লাভ ; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় শাস্ত্র যে জীবনকে একবাক্যে আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে, সেই জীবনের উদাহরণ ও প্রমাণস্বরূপ তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র ; এবং তৃতীয়তঃ, আমার যতদূর মনে হয়, এক বিপুল প্রাণধর্মী অধ্যাত্মশরীরের অঙ্গরূপে ভারত ও ভারতবাসিগণ সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তাঁহার অশেষ মহিমান্বিত গুরুদেবও ছিলেন উহার সাকার বিগ্রহ ও বাণী মাত্র। আমার মনে হয়, তাঁহার বিবিধ বক্তৃতা হইতে উপরি-উক্ত ত্রিবিধ প্রভাব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। যখন তিনি বেদান্ত প্রচার ও জগৎ সমক্ষে স্বদেশবাসীর দর্শনের পক্ষ সমর্থন করেন, তখন প্রধানতঃ প্রাচীন যুগের সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন ; যদিও ইহা সত্য যে, ঐরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত উহার ব্যাখ্যা করা তাঁহার পক্ষে এই কারণেই সম্ভব হয় যে, ঐ সকল গ্রন্থপ্রতিপাদ্য সত্যগুলি তাঁহার গুরুদেবের বিস্ময়কর জীবনে একাধারে সমষ্টিভূত হইতে দেখিয়াছিলেন। ভক্তির প্রসঙ্গে যখন

তিনি বলেন, "প্রেমেই ভক্তির আরম্ভ, স্থিতি ও পরিণাম," অথবা যখন তিনি কর্মযোগের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, 'কর্মের রহস্য,' তখন আমরা যেন তাঁহার গুরুদেবকেই দেখিতে পাই; আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, শিষ্য অপর একজনের পদতলে যে জ্যোতির্ময় রাজ্যে বাস করিয়াছেন, তাহারই কথা বলিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন মাত্র। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার শিকাগো সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, অথবা ঠিক ঐরূপ অসাধারণ 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর', কিংবা ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুধর্মের মুখ্য ও সাধারণ লক্ষণগুলি চিত্রিত করিয়া লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পাঠ করি, তখন এমন কিছুর পরিচয় পাই, যাহা তাঁহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত। এই সকল বক্তৃতার পশ্চাতে অবস্থিত শক্তি তাঁহার ভারতব্যাপী দীর্ঘভ্রমণের ফল। মনে হয়, এই ভ্রমণকাহিনী বলিয়া শেষ করিবার নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এই প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, উহা কোন ফাঁকা ভাবুকতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ফল নহে। অধিকন্তু ইহাও বলা যায় যে, তাঁহার অনুমান-প্রক্রিয়া ছিল সতেজ ও ক্রমবর্ধমান, নূতন নূতন তথ্যের জন্য সর্বদা উন্মুখ এবং প্রতিকূল সমালোচনায় নির্ভীক। একবার তিনি বলেন, "হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি কি, তাহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।" কেবল তাহা নহে, এই সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষজ্ঞান ছিল বলিয়াই স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে তাঁহার যে সব ধারণা তাহাতে হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতর ও অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা উপাদানগুলিও এত মহৎ দেখাইত। তাঁহার স্বদেশে যতদূর সম্ভব আধুনিক শিক্ষায় অগ্রণী হইয়াও কোন কোন নব্যপন্থীর ন্যায় তিনি সন্ন্যাসী বা কৃষকসম্প্রদায়কে, অথবা যাঁহারা প্রতিমা পূজা করেন, বা যাঁহারা জাতিভেদপ্রথা দ্বারা পীড়িত, তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই যে, "উহারা অখণ্ড ভারতের অঙ্গবিশেষ" নহে। আর এই যে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার দৃঢ় সঙ্কল্প, উহা তাহাদের সহিত বহু বৎসর ধরিয়া একত্র জীবন যাপনেরই ফলস্বরূপ।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন মহাপুরুষের জীবনের মূল মন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি ধারণাকে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত কার্য-কারণ সম্পর্কে জড়িত করিলেই যে উহার সম্যক বিশ্লেষণ করা হইল, তাহা নহে। সেই মূল প্রেরণার কারণ নির্দেশ করিতে হইবে, যাহার ফলে অফুরন্ত শক্তি লাভ করিয়া একজন আর একজন অপেক্ষা এই দৃশ্যমান জগৎকে অধিকতর অর্থযুক্ত বলিয়া মনে করেন। শুনিয়াছি, আশৈশব বিবেকানন্দের এই অন্তর্নিহিত সংস্কার ছিল যে, দেশের উপকার করিবার

জন্যই তাঁহার জন্মগ্রহণ। পরবর্তী কালে এই কথা মনে করিয়া তিনি গর্ববোধ করিতেন যে, আমেরিকা-বাসের প্রথম দিনগুলিতে যখন তিনি অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছিলেন—যখন জানিতেন না, পরবর্তী আহারের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন, সেই সময়েও ভারতে শিষ্যগণকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ জানা যায় যে, তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হয় নাই। কোন বিশেষ কার্য সংসাধনের জন্য যে সকল মহাপুরুষের জন্ম, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রকার অদম্য আশা বিদ্যমান থাকে। ভাবী মহত্ত্বের এই গভীর চেতনা-বোধ ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না ; জীবনেই উহার প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী অনুসারে, এই ভাবী মহত্ত্বের ধারণা ও আত্মাভিমান—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, এবং আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে, স্বামীজীর জীবনে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নিজের উচ্চ প্রশংসায় আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তিনি বিশেষ বিমুখ হইয়াছিলেন, কারণ, তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ সকল অতিশয়োক্তি মাত্র।

যখন দক্ষিণেশ্বর-দর্শনে আগত একদল লোকের সঙ্গে তিনি প্রথম আসেন, তখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় বালক মাত্র। কোন এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাঁহার কণ্ঠস্বরের অসাধারণ মাধুর্য ও সঙ্গীতে পারদর্শিতার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার গান গাহিবার কথা উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি গাহিলেন।

উহাই যেন সঙ্কেতের ন্যায় কার্য করিল—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, এই তিন বছর ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি, তুমি এতদিনে এলে!" বলা যাইতে পারে, সেইদিন হইতে তিনি অনুগত বালকবৃন্দকে একত্র করিয়া এমন একটি সঙ্ঘে পরিণত করিতে ব্যাপৃত হইলেন, যাহাদের 'নরেন্দ্র'-এর (স্বামীজীর তখন উহাই নাম ছিল) প্রতি অনুরাগ চিরকাল অটুট থাকিবে।

তিনি যে মহা যশের অধিকারী হইবেন, সেই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে, অথবা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার উল্লেখ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। যদি অধিকাংশ লোকের দুইটি, তিনটি অথবা দশ, বারোটি গুণ থাকে, তবে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে তিনি কেবল বলিতে পারেন যে, তাঁহার সহস্রটি গুণ আছে ; সত্যই তিনি 'সহস্রদল পদ্ম'। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, যাঁহারা উচ্চ অধিকারী, তাঁহাদের মধ্যেও যদি কাহারও শিবত্বের লক্ষণ প্রকাশক দুইটি গুণ থাকে, তাহা হইলে নরেন্দ্রের অন্ততঃ ঐরূপ আঠারোটি গুণ আছে।

কোন ব্যক্তি ভণ্ড কি না, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ বুঝিতে পারিতেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে কিছুতেই খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, যদিও উপস্থিত সকলের মতে তাঁহার ধার্মিকতা স্বীকৃত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, " সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর সত্ত্বেও লোকটা 'চুনকাম-করা কবর' ! রাতদিন শুদ্ধাচারে থাকা সত্ত্বেও ওর উপস্থিতি অপবিত্রকর, আর নরেন যদি ইংরেজের হোটেলে গোমাংসও খায়, তবুও সে পবিত্রই থাকবে—এতই পবিত্র যে, তার স্পর্শমাত্রে অপরে পবিত্র হয়ে যাবে।" এইভাবে নানা কথা বলিয়া তিনি ভবিষ্যতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন যে শিষ্য এবং অপর যাঁহারা তাঁহার সহায়ক হইবেন—এই উভয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত একটি স্থায়ী সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যাস ছিল, কোন নূতন শিষ্য তাঁহার নিকট আগমন করিলে যতরকমে সম্ভব তিনি তাহার শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কারণ, সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের নিকট একটি কলের নমুনা (মডেল) যেরূপ অর্থপূর্ণ, মানবশরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষিত দৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ অর্থপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইত। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে আবার একটি ছিল নবাগতকে ঘুম পাড়াইয়া নিদ্রাকালে তাহার অবচেতন মনের গতিবিধি লক্ষ্য করা। শুনিয়াছি, বিশেষ সংস্কারবান ব্যক্তিগণকে তিনি এই অবস্থায় নিজ পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে দিতেন, এবং যাঁহারা নিম্ন অধিকারী, তাঁহাদের প্রশ্ন করিয়া ঐ বৃত্তান্ত জানিয়া লইতেন। 'নরেন্দ্র'কে প্রথমোক্তভাবে পরীক্ষা করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন উপস্থিত সকলকে বলেন, যেদিন এই বালক জানিতে পারিবে সে কে, এবং কিরূপ উচ্চ অধিকারী, সেদিন মুহূর্তকালের জন্যও শরীর ধারণরূপ বন্ধন সে সহ্য করিতে চাহিবে না—সমস্ত অপূর্ণতাসহ এই জীবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন, এই জগতে পূর্ব পূর্ব জন্মে যাহা কিছু করিয়াছেন, সে সবই স্বামীজীর স্মরণে আছে। এই শিষ্যটির নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ব্যক্তিগত সেবা লইতে পারিতেন না। পাখার বাতাস করা, তামাক সাজা, এবং অন্য সহস্র রকমের ছোটখাটো সেবা, সচরাচর গুরুর জন্য শিষ্যেরা যাহা করিয়া থাকে, সে সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য অপরে করিত।

প্রাচ্যে বহুবিধ প্রথা আছে, যাহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ঐ সকল প্রথার মধ্যে আবার জাতির দিক দিয়া উচ্চ নহেন, এরূপ ব্যক্তির রন্ধন করা খাদ্য গ্রহণের বিরুদ্ধে যে সংস্কার, তাহা অতিশয় দৃঢ়মূল। আর এই বিষয়টি স্বামীজীর গুরুদেব মেয়েদের

মতোই মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তিনি নিজে যাহা খাইতেন না, প্রিয় শিষ্যকে তাহা অনায়াসে দিতেন। কারণ, তিনি বলিতেন, নরেন্দ্র 'জ্বলন্ত আগুন', সমস্ত অপবিত্রতা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। আবার বলিতেন, এই বালকের ভিতরে যে ঈশ্বরীয় সত্তা, তাহা পুরুষসত্তা, এবং তাঁহার নিজের হইল স্ত্রীসত্তা। এইরূপে প্রশংসার ভাব পোষণ করিয়া—যাহার সহিত প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাবও মিশ্রিত ছিল, এই বিশিষ্ট বালকের উচ্চ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি একটি বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর ঐ বিশ্বাস স্বামীজীর বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল—উহাই তাঁহার সর্ববিধ কর্মকে প্রামাণ্য ও সমর্থন দেয়। কারণ, স্বামীজী ছিলেন সর্বপ্রকার বন্ধন মোচনের কর্তা। ইহাও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাঁহার চারিপার্শ্বে এমন কয়েকজন থাকিবেন, যাঁহারা স্বামীজীর এবং অলস-আত্মসুখান্বেষী ব্যক্তিগণের আচার-লঙ্ঘনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমার ভারতবাসের প্রথম দিকে যে বিষয়টি প্রবলভাবে আমাকে বারংবার সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা হইল, এই সঙ্ঘের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত কার্যের এই অংশ যার-পর-নাই নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। গোঁড়া হিন্দুয়ানির কঠোরতম আচার-নিষ্ঠা, অথবা তপস্যার ছাঁচে যে-সকল ব্যক্তির জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারাও তাঁহাদের নেতা কর্তৃক শিষ্যরূপে গৃহীত ইউরোপীয়গণের সহিত একত্র ভোজন করিতে রাজি ছিলেন। হয়তো মাদ্রাজে কেহ স্বামীজীকে জনৈক ইংরেজ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত একত্র আহার করিতে দেখিয়াছিল; হয়তো কেহ বলিল, পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে তিনি কখন কখনও মদ্য-মাংস স্পর্শ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কথায় তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যাইত না। স্বামীজীর ঐ প্রকার আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করা, কারণ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা, এমনকি, আদৌ উহার সঙ্গত কারণ বা যুক্তি ছিল কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করাও তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি যাহাই করুন, যেখানেই তাঁহাদের লইয়া যান, তাঁহাদের কাজ হইল, অবিচলিতভাবে তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করা। আর একথা নিঃসন্দেহ যে, যিনিই এই দৃশ্যের আলোচনা করিবেন, তিনিই হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকিতে পারিবেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ যেমন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইত, এই গুরুভ্রাতাগণ পশ্চাতে না থাকিলে বিবেকানন্দের জীবন এবং পরিশ্রমও বিফল হইয়া যাইত। প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে একজন সম্প্রতি আমাকে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দকে তৈয়ারি করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনধারণ। বাস্তবিক কি তাই! অথবা জগন্মাতার অখণ্ড মহত্তর বাণীর এক অংশকে

অপর অংশ হইতে নিশ্চয়পূর্বক পৃথক করিয়া দেখা যেমন অসম্ভব, এই দুই মহাজীবনকেও পৃথক করিয়া দেখা কি তেমনই অসম্ভব নয়? এই সকল জীবন সম্যকরূপে আলোচনা করিতে গিয়া প্রায়ই আমার এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই জীবনালোকে বহুমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; কয়েকজন এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান; আর তাঁহাদের কাহারও সম্পর্কে পূর্ণ সত্যতার সহিত একথা বলা চলে না যে, তাঁহার নিজের অথবা অপর সকলের সহিত জড়াইয়া যে কর্মক্ষেত্র, তাহার এখানেই শেষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তরভারত-ভ্রমণ

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালটি আমার স্মৃতিপটে কতকগুলি চিত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ঐ চিত্রগুলি যেন প্রাচীনকালের বেদীর পশ্চাতে অবস্থিত পর্দার উপর ধর্মানুরাগ ও সরলতারূপ সোনালী জমির উপর অঙ্কিত। আর প্রত্যেকটি চিত্রই একজনের উপস্থিতির দ্বারা মহিমান্বিত; তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যবিন্দু। আমরা ছিলাম চারজন পাশ্চাত্য নারী; একজন ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ-নিবাসী মিসেস ওলিবুল, এবং অপর একজন কলিকাতার উচ্চপদস্থ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মচারিবৃন্দের অন্যতম। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ-পরিবৃত স্বামীজী আমাদেরই পাশাপাশি ভ্রমণ করিতেছিলেন। আলমোড়ায় পৌঁছিয়া তিনি দলবলসহ সেভিয়ার-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহারা ঐ সময়ে আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কিছু দূরে একটি বাংলোয় স্থান গ্রহণ করিলাম। এইরূপে সকলেই অন্তরঙ্গ বলিয়া বেশ অবাধ স্বাধীনতার সহিত মেলামেশা করিবার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু মাসখানেক পরে আমরা যখন আলমোড়া হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম, তখন সঙ্গিগণকে রাখিয়া স্বামীজী মিসেস বুলের অতিথিরূপে আমাদের সহিত যোগদান করেন।

মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর প্রত্যেক নূতন স্থানে আসিবামাত্র কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত স্বামীজী সেখানকার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন! শিক্ষিত পাশ্চাত্যগণের ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা এত অধিক যে, উহাকে প্রায় মূর্খতা বলা চলে; অবশ্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে কতকটা জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষার আরম্ভ হইল পাটনা বা প্রাচীন পাটলিপুত্র হইতে। রেলপথে পূর্বদিক হইতে প্রবেশ করিবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজী সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে ভুলিলেন না। লক্ষ্ণৌ শহরে প্রস্তুত শিল্প ও বিলাস দ্রব্যগুলির নাম ও গুণবর্ণনা বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল। যে-সকল মহানগরী সৌন্দর্যে স্বীকৃতি ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শুধু তাহাদের বিষয় যে স্বামীজী আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা নহে। আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত-খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তাঁহার তন্ময়ভাব যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয়; অথবা প্রত্যেক খুঁটিনাটি সহ কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করিতেন; যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য যে খিচুড়ি রাত্রি হইতে উনানে চাপানো থাকিত, তাহার কথাও উল্লেখ করিতেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এইসব কথা আমাদের নিকট বর্ণনাকালে তাঁহার নয়ন যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগ ভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চিত তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ, সাধুদের নিকট শুনিয়াছি, ভারতের আর কোথাও দরিদ্র কৃষক কুটিরের ন্যায় অতিথি সৎকার হয় না। সত্য বটে, তৃণশয্যা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর শয্যা, এবং মাটির চালাঘর ব্যতীত কোন ভাল আশ্রয় গৃহস্বামিনী অতিথিকে দিতে পারেন না; কিন্তু তিনিই আবার বাটীর অপর সকলে যখন নিদ্রিত, নিজে শেষ মুহূর্তে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে একটি দাঁতন ও একবাটি দুধ এমন জায়গায় রাখিয়া দেন, যাহাতে অতিথি নিদ্রাভঙ্গে সকাল বেলা উহা দেখিতে পান, এবং অন্যত্র যাত্রা করিবার পূর্বে যথাযথ ঐগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

সময়ে সময়ে এরূপ বোধ হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরবই স্বামীজীর

মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক চেতনা অতিমাত্রায় বিকাশলাভ করিয়াছিল। এইরূপে, বর্ষার প্রারম্ভে একদিন যখন আমরা উত্তপ্ত অপরাহ্ণে তরাই অঞ্চল অতিক্রম করিতেছি, তখন স্বামীজী যেন আমাদের প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই স্থান, যেখানে ভগবান বুদ্ধের কৈশোরকাল অতিবাহিত হয় এবং বৈরাগ্য দেখা দেয়। বন্য ময়ূরগণ মনে করাইয়া দিল রাজপুতনা ও তাহার চারণদের পল্লীগাথা। কদাচিৎ কোথাও একটি হস্তী স্বামীজীর প্রাচীনকালে যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করিবার উপলক্ষ হইয়া উঠিল। সেই প্রাচীন যুগের ভারত যতদিন বিদেশী-আক্রমণের বিরুদ্ধে এই জীবন্ত কামানরূপ সামরিক প্রাকার খাড়া করিতে পারিয়াছিল, ততদিন পরাজিত হয় নাই।

বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া আমরা যখন যুক্তপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছি, তখন স্বামীজী আমাদের কাছে সেই সময়ে যে মহানুভব ইংরেজ তদানীন্তন শাসন-কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার বিচক্ষণতা ও কার্যপ্রণালীর কথা বলেন। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বলেন, "অন্যান্য শাসনকর্তা থেকে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি বোঝেন, প্রাচ্য দেশগুলিতে জনমত এখনও তেমন প্রবল হয়ে না ওঠায় শাসনভার ব্যক্তিবিশেষের ওপর থাকা আবশ্যক। সেজন্য কোন হাসপাতাল, কলেজ বা অফিসের লোক জানে না, কোন্ দিন তিনি পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হবেন। এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেই তাঁর কাছে সুবিচার পাবে।" প্রাচ্য দেশসমূহের শাসনব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রভাবের গুরুত্ব অধিক, এই ভাবটি স্বামীজীর কথাবার্তায় বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। তিনি সর্বদা বলিতেন যে, বিচারের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সমগ্র দেশশাসনের পক্ষে গণতন্ত্র বা ডিমক্রেসি সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট শাসনপ্রণালী। তাঁহার অন্যতম প্রিয় ধারণা ছিল, এই সত্যটি উপলব্ধি করার ফলেই জুলিয়াস সীজার স্বয়ং সম্রাট-পদবী আকাঙ্ক্ষা করেন। যাঁহার নিকট সর্বদা সহজে নিজ অভাব জানানো যায়, যাঁহার হৃদয়ে সহজে দয়ার উদ্রেক হয়, এবং যিনি অপরের মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজের বিবেচনা মতো ন্যায়বিচারে সমর্থ—এরূপ কোন শাসনকর্তা বা সম্রাটরূপ ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে রাজ্যে ক্রমিক বিভাগীয় ও উদাসীন আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন যে ভারতের দরিদ্র অধিবাসীর পক্ষে কত কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, স্বামীজীর নিকট অনবরত শুনিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতাম। কারণ, তাঁহার নিকট আমরা শুনিতে পাইলাম, ব্রিটিশ-শাসনের প্রথমভাগে কত সরলচিত্ত ব্যক্তি যে লণ্ডনে উইণ্ডসর প্রাসাদে ভারতেশ্বরী মহারানীর নিকট গিয়া সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে

নিজেদের যথাসর্বস্ব ক্ষয় করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ যাত্রীই এই নিষ্ফল যাত্রায় আশাভঙ্গ ও অভাবের মধ্যে নিজ নিজ গ্রাম ও বাড়িঘর হইতে বহুদূরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। জন্মভূমির দর্শনলাভ পুনরায় তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই।

কিন্তু, পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা স্বামীজীর গভীরতম স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাইলাম। সে সময়ে কেহ তাঁহাকে দেখিলে ধারণা করিয়া বসিতেন যে, স্বামীজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! কত গভীরভাবে তিনি নিজেকে উহার সহিত একাত্ম করিয়াছিলেন। মনে হইত, ঐ প্রদেশের অধিবাসিগণের সহিত তিনি অনেক ভালবাসা ও ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যেন তাঁহাদের নিকট তিনি পাইয়াছেন অনেক, দিয়াছেনও অনেক। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যাঁহারা জোর করিয়া বলিতেন, তাঁহাদের প্রথম ও শেষ গুরু—গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ স্বামীজীর চরিত্রে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। এমনকি, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর যদি তাঁহার মতামত তাঁহারা মানিয়া লইতে না পারিতেন, অথবা যে ইউরোপীয়গণকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন—তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি অনুমোদন না করিতেন, তাহা হইলে এই উদ্দামহৃদয় ব্যক্তিগণকে তাহাদের অপরিবর্তনীয় মনোভাব ও অটুট কঠোরতার জন্য যেন তিনি অধিকতর ভালবাসিতেন। যে পাঞ্জাবী বালিকা চরকা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে 'শিবোহম', 'শিবোহম', উচ্চারণ করিত তাহার কথা বর্ণনাকালে তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। ঐ বালিকার সম্পর্কে আমেরিকাবাসী শিষ্যগণ পূর্বেই অবহিত হইয়াছিলেন। আবার এ কথা বলিতে ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এই পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিয়াই তিনি এক মুসলমান মেঠাইওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট মুসলমানী খাবার কিনিয়া খান। জীবনের অপরাহ্নে কাশীতে অবস্থানকালে তিনি পুনরায় ঐরূপ আচরণ করেন বলিয়া জানা যায়।

কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি আমাদের দরজার মাথায় ঝোলানো গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন। উহা দ্বারা গৃহগুলি হিন্দু পরিবারের বলিয়া বোঝা যাইত। আবার ভারতবাসীরা 'সুন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই 'কাঁচা সোনার বর্ণ' তিনি দেখাইয়া দিতেন। ইউরোপীয়দের আদর্শ যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত গাত্রবর্ণ, তাহা হইতে ইহা কত বিভিন্ন। অথবা আমাদের সঙ্গে লইয়া টাঙ্গাযোগে যাইবার সময় সব ভুলিয়া যে শিব-মাহাত্ম্য বর্ণনায় তিনি কদাপি ক্লান্তিবোধ করিতেন না, তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। লোক সমাগম হইতে বহুদূরে পর্বতশিখরে

মহাদেবের অবস্থিতি—মানবের নিকট যাঁহার প্রার্থনা কেবল নিঃসঙ্গতা—যিনি 'এক অনন্তধ্যানে সমাহিত।'

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে গাড়ি করিয়া আমরা মারী যাই, এবং কয়েকদিন সেখানে অতিবাহিত করি। অতঃপর কতক টাঙ্গায়, কতক নৌকাযোগে কাশ্মীরের শ্রীনগর অভিমুখে গমন করি। পরবর্তী কয়েকমাস ভ্রমণকালে কাশ্মীর ছিল আমাদের প্রধান কেন্দ্র।

এই যাত্রাপথের সৌন্দর্যবর্ণনায় সহজেই আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। পার্বত্য অরণ্যানী, গীর্জার আকারে শোভমান বিতস্তা গিরিসঙ্কটের পাহাড়গুলি ও শস্যক্ষেত্রমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় গ্রামগুলি ঐ পথের অন্তর্গত। ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে এক সৌন্দর্যময় দৃশ্যপরম্পরা মানসপটে উদিত হয়। ঐ সকল চিত্রের মধ্যে কাশ্মীরের কৃষক-রমণীর উপযুক্ত রক্তবর্ণের মুকুট পরিহিতা ও শ্বেত অবগুণ্ঠনযুক্তা সেই প্রাচীন রমণীর স্মৃতিও কম মধুর নয়। ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি এক খামারের মধ্যে অবস্থিত বিশাল 'চেনার' বৃক্ষতলে পুত্রবধূগণ পরিবৃত হইয়া চরকায় সূতা কাটিতেছেন। তাঁহার সহিত স্বামীজীর এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। পূর্ব বৎসর স্বামীজী তাঁহার নিকট কোন ছোটখাট উপহার লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই গল্প করিতে স্বামীজী কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না যে, বিদায় গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, আপনি কোন ধর্মাবলম্বী?" ঐ প্রশ্ন-শ্রবণে বৃদ্ধার মুখ আনন্দ ও গর্বে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, এবং আনন্দোৎফুল্ল উচ্চকণ্ঠে স্পষ্টভাবে বলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী।"

অথবা শ্রীনগরের বহির্ভাগে অবস্থিত সমুন্নত লম্বার্ডিদেশসুলভ পপ্‌লারবীথির কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। যেন হবিমা (Hobbema)-রচিত বিখ্যাত চিত্রখানির অবিকল অনুরূপ। ভারত ও সনাতন-ধর্ম সম্পর্কে কত প্রসঙ্গই না আমরা এখানে শ্রবণ করিয়াছি!

অথবা ফসল কাটা শেষ হইবার পর শূন্য ক্ষেতগুলিতে গ্রামবাসিগণ যে প্রমোদানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার কথা বহুক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতে পারি। অথবা ইসলামাবাদের সেই উন্নত পপ্‌লার-তরুশ্রেণীতলে যে তাম্রাভ 'অ্যামারান্থ' শস্য কিংবা সদ্যোজাত হরিদ্বর্ণ ধানগাছগুলি—তাহাদের কথাও বলিতে পারি। বনফুলের মধ্যে উজ্জ্বল নীলবর্ণের একজাতীয় 'ফরগেট-মি-নট' গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরের ক্ষেতগুলিতে অতি সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু শরৎ ও বসন্তকালে ক্ষেত ও নদীতীর ছোট

ছোট বেগুনী 'আইরিস' ফুলে একেবারে ভরিয়া যায়। ঐ ফুলগুলির বর্শার মতো সুচাল পাতাগুলির মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে উহাদের ঘাস বলিয়াই ভ্রম হয়। কোথাও পথের পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্টি অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। বোঝা যায়, ঐগুলি মুসলমানদের গোরস্থান। আইরিস-কুসুমে আবৃত ঐ স্থানগুলি কি অসীম করুণ ভাবেরই না ইঙ্গিত করে।

আবার এখানে সেখানে ঘাস ও আইরিস পুষ্পের মধ্যে দুই-চারটি গ্রন্থিবহুল আপেল, বা নাসপাতি কিংবা আলুবোখরার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে প্রত্যেক গ্রামের প্রজাগণ রাজ-সরকার হইতে বিনা ব্যয়ে একটি করিয়া ফলবাগানের উপস্বত্ব ভোগ করিত। বৃক্ষগুলি তাহাদেরই ধ্বংসাবশেষ। একদিন গোধূলি সময়ে উচ্চ নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একদল মুসলমান রাখাল মাথা বাঁকানো লম্বা ছড়ি হাতে কতকগুলি রামছাগল তাড়াইয়া লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। কয়েকটি আপেল গাছের নিকট পৌঁছিয়া তাহারা একটু থামিল, এবং প্রার্থনাকালে ব্যবহৃত গালিচার পরিবর্তে কম্বল বিছাইয়া সেই ঘনায়মান গোধূলি-আলোকে সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ করিল। হৃদয় বলিয়া উঠে, এ সৌন্দর্যের অন্ত নাই বাস্তবিক অন্ত নাই।

কিন্তু সত্যসত্যই বর্তমান গ্রন্থে এইসকল বিষয়ের কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বর্ণনার বিষয় ভূগোল বা রাজনীতি নহে, এমনকি, কৌতূহলোদ্দীপক অধিবাসিবৃন্দ বা অপরিচিত জাতিসমূহের আচার-ব্যবহারও নহে। সৌভাগ্যবশতঃ আধুনিক পরিবর্তনের যুগে শত বিরোধ ও জটিলতার মধ্যে, আমি সেই প্রাচীন যুগের যে বিশাল ধর্মজীবনের উন্মেষ দেখিতে পাইয়াছিলাম, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। আবার এই সকল বিরোধের বিষয় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন বলিয়া যে মহাপুরুষ সমধিক মর্মযাতনা ভোগ করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমার অক্ষমতাবশতঃ ঐ বর্ণনা অসংলগ্ন ও অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে। স্বামীজী নিজে একবার বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, "একটি ফুলেরমতো"। মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করিতেন; সরল, অর্ধনগ্ন, আচারনিষ্ঠ, প্রাচীন-ভারতের আদর্শস্বরূপ; সহসা তিনি এমন এক জগতে পূর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠেন, যে জগৎ তাহার প্রাচীনকালের স্মৃতি পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার গুরুদেবের জীবনে একাধারে মহত্ত্ব ও বেদনার বিষয় এই যে, তিনি নিজে ঠিক ঐ ছাঁচের লোক ছিলেন না। তাঁহার মনের গঠন ছিল সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। মনের যে অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে—সেই

শাশ্বত-প্রজ্ঞালোকে তাঁহার চিত্তও উদ্ভাসিত থাকিত, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্তমান যুগের মনীষী ও কর্মিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত সকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরেও তাহার আলোক আসিয়া পড়িত। তাঁহার আশা বিংশ শতাব্দীর জনগণের আশাকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে অথবা বর্জন করিয়া চলিতে পারিত, কিন্তু কদাচ উপেক্ষা করিতে পারিত না। সমুদয় জ্ঞানভাণ্ডার সুসংবদ্ধ হওয়ার ফলে সমগ্র মানবজাতির দুর্দশা ও তাহার প্রতিকূলে সংগ্রামের যে দৃশ্য উজ্জ্বল আলোকছটার ন্যায় সহসা লোকের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তাহা ইউরোপীয়গণেব ন্যায় তাঁহাকেও সচেতন করিয়া তোলে। ইউরোপ এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। গত যাট বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান ও কাব্য হতাশার ক্রন্দনে পূর্ণ। একদিকে অধিকার প্রাপ্ত জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান আত্মতুষ্টি ও ইতরজনোচিত প্রবৃত্তি, অন্যদিকে অধিকারচ্যুত জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান বিষাদ ও যন্ত্রণা ; আর মানবের অতি উদার প্রকৃতি উহাকে ক্ষতিকর বা পাপ বলিয়া জানিলেও প্রতিকার বা দমনে অসমর্থ—ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চক্ষে এই দৃশ্যই পড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মর্মযাতনা ভোগ করিলেও, ইহা সত্য যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা নিশ্চল অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কেবল ইহাই বলিতে পারে, "যাহার আছে, তাহাকে আরও দেওয়া হইবে, আর যাহার নাই, তাহার নিকট হইতে সামান্যতম সম্বলটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইবে। সাবধান, যে পরাজিত হইবে, তাহারই সর্বনাশ।"

প্রাচ্য জ্ঞানিমণ্ডলীরও কি এই অভিমত ? তাহা হইলে মানবজাতির আর আশা কি ? আমার গুরুদেবের জীবনে আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাই। তাহার মধ্যে একাধারে ভারত ও সমগ্র জগতের অতীতকালের অসংখ্য আচার্য ও ঋষির যে আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও ধর্মলাভের জন্য সংগ্রাম—তাহারই উত্তরাধিকারী এবং এক নূতন ধরনের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রবর্তক ও ঋষির সমাবেশ ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। কোন একটি সমস্যাকে তিনি যেভাবে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই আমি উহার সমাধানের ইঙ্গিত পাইতাম ; এবং প্রথম হইতেই আমি উহার ঠিক বিপরীত মত দৃঢ়ভাবে পোষণ না করিয়া থাকিলে (সেক্ষেত্রে স্বামীজীই উহা প্রথম আমাকে ধরাইয়া দিতেন) তাঁহার সমাধান আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বোধ হইত। এইভাবে চিন্তা করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস, যে উন্নততর অসাধারণ চিন্তাধারা ও জ্ঞানরাজ্যে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন, আধুনিক যুগে তাহার প্রত্যেকটির কোন-না-কোন সার্থকতা আছে। আমার বিশ্বাস—বহু জিনিস, যাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমার

দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও জীবনে উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করিবে। আর প্রার্থনা করি, নিজের মন-গড়া কোন কিছু জুড়িয়া না দিয়া, অথবা সত্যের অপলাপ ঘটে এমন রঙ না লাগাইয়া, আমি যেন সর্বদা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবের চৈতন্যদাতা

কলিকাতায় অবস্থানকালে শুনিয়াছিলাম, অধ্যাত্মজীবন এক সুনির্দিষ্ট এবং উপলব্ধির বস্তু, বিশেষ বিবেচনাপূর্বক উহা বরণ করিতে হয়, এবং কতকগুলি সুপরিচিত পন্থা অবলম্বনেই উহা লাভ করা যায়। হিমালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, উহার মূলকথা হইল—ভগবানের প্রতি গভীর আকুল প্রেম—প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত সেই অনন্তের অন্বেষণ—যাহার যথাযথ বর্ণনা দিবার আশাই করিতে পারি না। আর আমার গুরুদেবের ইহাই বিশেষত্ব যে, অপরে যেখানে উপায়ের আলোচনাতেই ব্যস্ত, তিনি সেখানে রীতিমত আগুন জ্বালিতে পারেন। অপরে যেখানে একটা নির্দেশ মাত্র দেন, তিনি সেখানে বস্তুটিকেই ধরাইয়া দেন।

আমার বক্তব্য বিষয় অতি বিশদভাবে বলিতে চাই। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর বরাবর আমার কাজ ছিল—কতকটা যেন অপরের মনের ভাব ধরিতে পারা। আমি কেবল এই দাবি করিতে পারি যে, স্বামীজীর শক্তির বিভিন্ন গতিপথের সহিত আমার এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল যে, ঐ সম্পর্কে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। আর যেহেতু আমি বিশ্বাস করি, কোন জড়বস্তুর ন্যায় কোন অভিজ্ঞতাও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, অতএব যে-সব অবস্থার মাধ্যমে আমার ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাদের যথাযথ বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব।

ব্যক্তিগত ঘটনা বা অনুভূতি সম্পর্কে স্বামীজী ছিলেন অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির। অবশ্য, জগতের বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিজ নিজ দোষ উদঘাটন করিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুর পদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কেহই বোধ হয়

তাহার মতো ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করে নাই। এমনকি, কোন ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া নহে, অথচ নিজ ব্যক্তিগত অনুভূতির ঘনিষ্ঠ প্রকাশ ব্যতীত যাহার উত্তর দেওয়া চলে না, এমন সব প্রশ্নে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিত—এবং অন্তরের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। লণ্ডনের ক্লাসগুলিতে কখন কখনও দেখিয়াছি, কতকগুলি প্রশ্ন জোর করিয়া তাঁহার উপর চাপানো হইয়াছে—যেমন সমাধিকালে কিরূপ অনুভূতি হয় ইত্যাদি। সে সময় উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঐরূপ ধরনের প্রশ্নের পরিবর্তে বরং অসাবধানতাবশতঃ তাঁহার কোন অনাবৃত স্নায়ু জোরে চাপিয়া ধরিলে উহা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল।

স্বামীজী নিজেই তাঁহার দলের সহিত আমার যাইবার কথা উত্থাপন করেন। উদ্দেশ্য, ভারতে আমার উপর যে কার্যের ভার অর্পণ করিবার ইচ্ছা, সে বিষয়ে স্বয়ং শিক্ষা দেবেন। এই শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অতি সাধারণ। সকলেই একত্র বারান্দায় অথবা বাগানে উপবেশন করিতাম, কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনিতাম; যিনি যতটা পারেন, গ্রহণ করিতেন, এবং পরে ইচ্ছামত আলোচনার স্বাধীনতা ছিল।

আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র একদিন আধ ঘণ্টার জন্য তিনি আমাকে তাঁহার সহিত একাকী ভ্রমণ করিতে আহ্বান করেন। আমাদের কথাবার্তা ব্যক্তিগত সংক্রান্ত না হইয়া আমার ভাবী কার্যের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কেই হয়; তখন গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে এবং আমিও আমার কার্য সম্বন্ধে কিছুটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যে দল গড়িয়া উঠে, ঐ দলের সকলের সহিত তাঁহার একটি নিগূঢ় ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং ঐ সম্বন্ধের মাধ্যমেই তাঁহার ভাবাদর্শ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ও জনসমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়। এমনকি, একজন গণিতবিদ্ তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিবর্গের উপর সেই পরিমাণে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন, যে পরিমাণে তাঁহার চিন্তা ভাবের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু এই ভাবসম্বন্ধের কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কেহ তাঁহাকে দাসভাবে, কেহ ভ্রাতা, সখা বা বন্ধুরূপে, কেহ বা সেই অলৌকিক পুরুষকে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানরূপে দেখিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এই সকল ব্যাপার এক পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, এবং সকলে অসঙ্কোচে বুঝিয়া এবং মানিয়া লয় যে, এইরূপ কোন ভাবসম্বন্ধস্থাপন ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কোন বিরাট ধর্ম-আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

সম্ভব নহে। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে ধর্মরাজ্যে আমি তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইয়া উঠিলাম। এই সম্পর্ক অতি মধুর এবং স্বামীজীর জীবিতকালে যাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় ঘটে, সেই সকল ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সকলেই আমাকে ঐ চক্ষে দেখিতেন।

কিন্তু এই যাত্রার প্রারম্ভে, যখন অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়টিও আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই, তখন আমি যেন প্রকৃতই দিশাহারা হইয়া পড়ি। সত্যই আমার মহা সৌভাগ্য যে, সেই সময়ে শিক্ষকরূপে লাভ করি স্বামী স্বরূপানন্দ নামে পরিচিত এক তরুণ সন্ন্যাসীকে। তিনি আমাকে বাংলা এবং হিন্দুধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কারণ, আমার সর্বদা মনে হইয়াছে, যেমন দর্পণ-সঙ্কেত (heliograph) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দর্পণের পরস্পরের সঙ্কেত-মার্গে অবস্থিত হইলে সেখানকার সমুদয় তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ এই ঘটনার ফলে আমরা যে ঘনীভূত ভাবরাজ্যে বাস করিতাম, তাহার কতকটা ধরিতে ও বুঝিতে সমর্থ হই।

আমি মঠের ঠাকুর ঘরে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ করিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু অল্প কয়েক সপ্তাহ ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থান করিবার পরেই তিনি স্বামীজীর নিকট গৈরিক বস্ত্র লাভ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তাঁহার মনের দ্রুত বিকাশ লাভের কাহিনী আমার নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণব ধর্মমতে লালিত হইয়াছিলেন। এই মতে ঈশ্বরকে দয়াল, প্রেমময় প্রভু ও জগৎপাতা এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবতার ও জগৎত্রাতারূপে ধারণা করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, এই ধারণা পাশ্চাত্য খ্রীস্টধর্মেরই অনুরূপ। কিন্তু, ইহার পরেই, সচরাচর সকলের জীবনে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, তাঁহাকেও সেই বিতৃষ্ণার সম্মুখীন হইতে হয়। তরুণ বয়সে, হৃদয়ে যখন পরোপকার বৃত্তি প্রবল থাকে, সেই সময়ে তিনি কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন—যাহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অবিচারমূলক বলিয়া মনে হইয়াছিল। ফলে তিনি এই মর্মান্তিক সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন যে, এ জগতে বলবানেরই জয়, এবং ঈশ্বর পরম কারুণিক—শৈশবকালের এই মধুর কল্পনায় আর বিশ্বাস রাখিতে পারেন না। একটি কাহিনী আমার মনে আছে। একদিন রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে যাইবার সময় তিনি দেখেন, এক দরিদ্র স্ত্রীলোক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলা হইতে একটি একটি করিয়া এক মুঠা চাউল খুঁটিয়া তুলিতেছে। ঐ পথ দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল ; তাহার ধাক্কা লাগিয়া স্ত্রীলোকটির হস্তস্থিত পাত্র হইতে চাউলগুলি মাটিতে পড়িয়া যায়। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বরূপানন্দ গভীর দুঃখে

চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি কী করছেন? কেন তিনি এই সব ঘটনা রোধ করেন না?"

এই ধরনের দুই-তিনটি ঘটনা এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে এরূপ তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলিয়া দিল যে, জীবনে আর কখনও অটুট স্বাস্থ্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না! কিন্তু পরে ঐ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। জীবনের প্রতি এক অপরিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিই ঐ শান্তির মূল। তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন, স্বপ্ন ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে— অর্থাৎ, ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরে সহস্র সহস্র ভারতীয় ব্রহ্মচারীর ন্যায় তিনিও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ঈশ্বর সিংহাসনের উপর বিরাজ করিতেছেন, এবং মানব নতজানু অবস্থায় তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট—এইরূপ কোন চিত্র কল্পনা করিয়া সমস্যার চরম সমাধানের চেষ্টা অতঃপর তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বরং তাঁহার মনে হইল, অজ্ঞতা এবং স্বার্থপরতাই এই সকল স্বপ্ন ও সুখদুঃখ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি অন্যান্য যে সব স্বপ্ন দ্বারা আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গঠিত, তাহার মূল কারণ। অতঃপর সকল দ্বন্দ্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ ও সেই চরম একত্ব অবস্থা সাক্ষাৎকার করিবার জন্য—হিন্দুরা যাহাকে মুক্তি বলিয়া অভিহিত করেন—এবং যতদূর সম্ভব অন্তর্দৃষ্টি ও নিশ্চয়তালাভ করিবার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করেন—মায়াকে জয় করিতে হইবে।

এখন হইতে সেই উচ্চতম অবস্থা লাভ করিবার জন্য নিজের সর্বশক্তিনিয়োগ করাই যেন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ইহার পর তাঁহার পিতৃগৃহে বাসের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর মঠবাস অপেক্ষা যে কঠোরতর ছিল, তাহা নানা ভাবে বুঝিতে পারা যায়। বহু বৎসর পরে আলমোড়ায় তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়নকালে ভগবৎ প্রেমকে আকুল তৃষ্ণার সহিত কেন তুলনা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি।

স্বামী স্বরূপানন্দের শিক্ষাধীনে আমি সমগ্র মন প্রাণ দিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার নিকট এই সহায়তা না পাইলে সেই অমূল্য অবসর আমার জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইত। গুরুর সহিত এইকালে আমার সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে পূর্ণ। এখন আমি বুঝিতে পারি, শিখিবার বিষয় অনেক ছিল, কিন্তু সময় ছিল কত অল্প! শিক্ষার্থীর অহংনাশই ছিল শিক্ষার প্রথম সোপান। কিন্তু এই সময়ে আমার সযত্নপোষিত সংস্কারগুলির উপর যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বর্ষণ হইত, তাহার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। দুঃখভোগের কারণ অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক অনুকূল ভাবাপন্ন প্রিয় আচার্যলাভের স্বপ্ন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া তাহার পরিবর্তে উদাসীন এবং হয়তো বা মনে মনে বিরূপ, এইরূপ এক ব্যক্তির

চিত্র কল্পনা করিয়া আমি তখন যে পরিমাণে দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম, এখন তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নির্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সৌভাগ্যবশতঃ সেবাকার্যে যোগদান করিব বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যাহার করিবার কথা মুহূর্তের জন্যও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম, এই সেবাকার্যে কোন ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক থাকিবে না। অবশেষে এমন সময় আসিল, যখন এই তীব্র যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিতে পারে, এই কথা চিন্তা করিয়া আমাদের দলের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, অনুগ্রহপূর্বক স্বামীজীর নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিলেন। স্বামীজী নীরবে সব শুনিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে তিনি আবার আসিলেন। আমাদের বারান্দায় একত্র দেখিয়া তিনি তাঁহার দিকে তাকাইয়া বালকের ন্যায় সরলভাবে বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক, এ অবস্থার পরিবর্তন একান্তই দরকার। আমি একাকী জঙ্গলে যাচ্ছি; নির্জনবাসের ইচ্ছা। আর যখন ফিরব, শান্তি নিয়ে আসব।" তারপর স্বামীজী উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, আমাদের মাথার উপর নবীন চন্দ্রের শোভা। সহসা দিব্যভাবে তাঁহার কণ্ঠ আবিষ্ট হইয়া উঠিল, বলিলেন, "দেখ, মুসলমানেরা দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ সমাদরের চোখে দেখে। এস, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি।" কথাগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত তুলিলেন, এবং নীরবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিদ্রোহী শিষ্যকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আশীর্বাদ করিলেন। ইতোমধ্যে শিষ্য তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়াছেন। মিলনের অপূর্ব মাধুর্যে সেই মুহূর্তটি নিশ্চিত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি, এই মুহূর্ত ক্ষত আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু যে মোহস্বপ্ন ভাঙিয়া শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না। এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিবার কারণ, যাহাতে পরের ঘটনাটি বিবৃত করিতে পারি। বহু বহু বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয় 'নরেন্দ্রে'র স্পর্শমাত্রে জ্ঞানবান করিবার যে শক্তি জন্মগত, তাহা বিকাশলাভ করিবে। আলমোড়ায় সেই সন্ধ্যাকালে আমি এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। কারণ, একাকী ধ্যানে বসিয়া, আমি অনুভব করিলাম, আমি এক অনন্ত মঙ্গলময় সত্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছি, সেই গভীর সত্তার স্বরূপ অহংপূর্ণ বিচারের দ্বারা কখনও জানিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত, আমি একথাও হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, হিন্দুধর্মের যোগশাস্ত্রে যে অনুভূতির উল্লেখ আছে, তাহা এই জড়ভূমিতে সহজভাবে নিত্য প্রত্যক্ষ। আর এই সর্বপ্রথম আমি জানিলাম যে, শ্রেষ্ঠ আচার্য এইরূপেই

ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান করেন, উহার পরিবর্তে নিরাকার দর্শনলাভ হইবে বলিয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বালোকের ঝলক

আমি যে সব উপলব্ধি লাভ করি, তাহার মধ্যে এইটি একমাত্র নহে, কিন্তু কেবল এই উপলব্ধির সম্বন্ধেই বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন ছিল। যে সম্পূর্ণ ঘটনাটির ইহা অংশমাত্র, তাহা হইতে আভাস পাওয়া যায়, প্রাচ্যদেশীয় আচার্যগণ শিষ্যের নিকট কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। সর্বপ্রথম শিষ্যকে সর্বতোভাবে গুরুর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। শুনিয়াছি, গুরুর ব্যক্তিগত সেবাও একান্ত আবশ্যক, এবং ঐরূপ স্থলেই গুরুর চিন্তারাশি শিষ্যের মনে বীজাকারে অঙ্কুরিত হয়, বলিতে পারি না। আমার নিজের ক্ষেত্রে এই ধরনের সেবা বলিতে গেলে কালেভদ্রে অতি অল্পক্ষণের জন্য সূচী অথবা লেখনী-কার্যেই আবদ্ধ থাকিত। স্বামীজী বলিয়াছেন, কন্যার কখনও এরূপভাবে কাজ করা উচিত নয়, যাহাতে লোকে মনে করে, পিতৃগৃহে ভৃত্যের অভাব ছিল। তথাপি আমার বিশ্বাস—কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি ইহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি—প্রীতির সহিত গুরুজনদের সামান্য সেবা দ্বারা তাঁহাদের সহিত আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক একাত্মতা জন্মে ; যাহার ফলে আমাদের জীবনে অপূর্ব ও সুন্দর ফল লাভ করি।

পাশ্চাত্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক গীর্জার প্রতি যে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব পোষণ করে, প্রাচ্যে গুরুর প্রতি শিষ্যকে অনুরূপ ভাব প্রদর্শন করিতে হয়। শিষ্যের পশ্চাতে গুরু এবং তাঁহার সাধনই শক্তিরূপে বর্তমান থাকে। এই ঋণ মানিয়া লইতে অসমর্থ হওয়া বা অস্বীকার করা মহাপাপ এবং অমার্জনীয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু, যিনি শিষ্যের স্বাধীনতা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু গুরুর প্রতি শিষ্যের একান্ত ভক্তি অবশ্য প্রয়োজন। যে ব্যক্তি শুধু নিজের শক্তির উপরই আত্মোপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহার অধ্যাত্মজীবন 'ঘুনধরা' কাঠের মতো অচিরে জীর্ণ হইয়া পড়ে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, এইকালে আমরা এমন এক সংসর্গে বাস করিতেছিলাম,যেখানে নির্জনতাই আত্মোন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার মনে হয়, নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তা-প্রণালীর পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। ইউরোপীযদের ধারণা, কুড়ি বৎসর একাকী বাস করিলে মানুষ পাগল না হইয়া যায় না, আর ভারতীয় ধারণা হইল, কুড়ি বৎসর একাকী না থাকিলে কাহাকেও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। এই বৈপরীত্য কতকটা অতিরঞ্জিত ভাষায় প্রকাশ করিলেও মূলতঃ সত্য। হিন্দুধারণা অনুযায়ী মৌন ও নির্জনবাসের দ্বারাই আমরা সেই আত্মোপলব্ধির আনন্দরস আকণ্ঠ পান করিতে পারি, এবং তাহার ফলে যে আন্তরবিকাশ ঘটে, তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহমিকার ধার মসৃণ হইয়া যায়। সেজন্যই দেখা যায়, নির্বাণ অবস্থায় বুদ্ধমূর্তিগুলির মুখমণ্ডল সর্বদা প্রশান্ত। যে কোনদিক দিয়াই দেখা যাউক, নানাভাবে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও জাগতিক সম্পর্কসমূহ চিন্তাপ্রবাহকে শিশুসুলভ বাধা দেয় মাত্র। সকল বস্তুর পশ্চাতে অনুভূত হয় সেই অনির্বচনীয় পূর্ণত্ব, সকল দৃষ্ট বস্তু যাহার অতি তুচ্ছ ও বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সকল মানবীয় সম্পর্কের উৎসস্বরূপ সেই চরম সত্তা বা ব্রহ্মে যাঁহারা অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাদের আর ঐ প্রকার সম্পর্ক প্রলোভিত করিতে পারে না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে প্রেম, করুণা অথবা বীরত্বকে মূল কারণ বলিয়া চিন্তা করা হয় না ; যদিও উহারা সেই অতীন্দ্রিয় সত্যে উপনীত হইবার বিভিন্ন পথস্বরূপ। কেবল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তুর সাক্ষাৎকারই ঐ মূল উৎস। আমার বরাবর ধারণা, এই কারণে নিষ্ঠা, নির্জনবাস ও আত্মবিলোপ হিন্দুমতে প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত, আর পাশ্চাত্যে অধিকতর সক্রিয় ও আক্রমণাত্মক গুণগুলিই সমাদৃত হইয়া থাকে। ভারতীয় মতে, দেহধারী হইয়াও প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা যতটুকু নিজ নিজ দেহবুদ্ধি হইতে ঠিক ঠিক দূরে থাকিতে পারিব, ততটুকুই লাভ।

এই সকল চিন্তার প্রভাবে, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের সেই অপূর্ব গ্রীষ্মকালে আমাদের সকলের নিকট ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় যে, যাঁহারা সাকার রূপ ধারণ করিয়া পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হন, তাঁহাদের অপেক্ষা অব্যক্ত সত্তায় (পরব্রহ্মে) যাঁহারা চিরকালের মতো লীন হইয়া গিয়াছেন, আর এই জগতে ফিরিয়া আসিবেন না, তাঁহারাই শতগুণে শ্রেষ্ঠ। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "শরীরের কথা চিন্তা করাও পাপ।" অথবা বলিতেন, "শক্তি বা সিদ্ধি লোকের সামনে প্রকাশ করা ভাল নয়।"

বুদ্ধের করুণার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। ঈশার পবিত্রতার মধ্যেও ছিল শক্তিপ্রদর্শনের ভাব।

শেষোক্ত চিন্তাটি, অর্থাৎ অপরের নিকট শক্তি প্রকাশ করা অন্যায়—ভারতীয় সাধুসমাজে বিশেষ প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। একবার অদূরদর্শিতাবশতঃ আমাদের তাঁবু তীর্থযাত্রীদের তাঁবুর নিকটে ফেলা হইয়াছিল। শত শত লোক উহার প্রতিবাদে কোলাহল করিয়া উঠিল। স্বামীজী তাঁবু সেখানেই রাখিবার জন্য প্রায় জিদ ধরিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক অপরিচিত সাধু অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামীজী, মানি, আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ঐ ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁবু অন্যত্র সরাইয়া লইতে আদেশ দিলেন।

অতীন্দ্রিয় সত্যোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ মৌন ও নির্জনবাসের শক্তি সম্বন্ধে বিচার করিবার বহু সুযোগ আমরা লাভ করিয়াছিলাম। কারণ, স্বামীজী বার বার আমাদের মধ্য হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতেন, আবার অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার বিপুল খ্যাতি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক তাঁহার বজরায় প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকিত এবং একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিত। ফলে একটু সময়ও একাকী থাকিবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ ভক্তবৃন্দের অপলক দৃষ্টির সম্মুখে তিনি অস্থির বোধ করিতেন। সময়ে সময়ে মনে হইত, প্রেমিক যেরূপ তাহার প্রেমাস্পদের চিন্তা করিয়া থাকে, তিনিও যেন সেই ভাবে মৌন, ভস্মাবৃত পরিব্রাজক অথবা নির্জনবাসী সাধুর জীবন চিন্তা করিতেন। যদি কেহ হঠাৎ আসিয়া বলিত, তিনি আজ বা কাল চিরদিনের মতো আমাদের নিকট বিদায় লইয়া যাইবেন, আর শেষবারের মতো আমরা তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছি, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না। তিনি এবং তাঁহার উপর নির্ভর কবিত এমন সব বিষয়ে আমরাও যেন ভগবদিচ্ছার সুরধুনী স্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় ছিলাম। যে কোন মুহূর্তে ঐ ইচ্ছা তাঁহার নিকট মৌনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীতে তাঁহার বাস শেষ হইয়া যাইতে পারিত।

এই যে মতলব আঁটিয়া কাজ না করা—ইহা কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি একদিন আমাকে একটি পত্র দেখিতে দেন, এবং উহার উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমি যখন অযাচিতভাবে কিছু সাংসারিক উপদেশ দিতে যাই, তখন যে বিরক্তির সহিত তিনি আমাকে উত্তর দেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। সক্রোধে তিনি বলিয়া ওঠেন, "মতলব! কেবল মতলব ভাঁজা! এইজন্যই

পাশ্চাত্যের লোক তোমরা কোনকালে ধর্ম সৃষ্টি করতে পারনি। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো ধর্মপ্রচার করে থাকেন, তো সে জনকয়েক ক্যাথলিক সাধু—যাঁরা মতলব এঁটে কাজ করতে জানতেন না। যারা মতলব এঁটে কাজ করে, তাদের দ্বারা কোনকালে ধর্মপ্রচার হয়নি, হতে পারে না।"

বাস্তবিক সেই মধুর গ্রীষ্মকালীন-যাত্রায় আমরা সর্বদা ভৃত্যদের নিকট এই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম যে, স্বামীজীর নৌকা এক ঘণ্টা পূর্বে নোঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেদিন আর প্রত্যাবর্তন করিবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একদিন কি বহুদিন অনুপস্থিত থাকিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। কিন্তু সর্বদাই তিনি এই সকল নির্জনবাস হইতে দিব্য জ্যোতির্ময়রূপে ও শান্তিতে পূর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন, আর তাঁহার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইত গভীর—অতি গভীর জ্ঞানের কথা। যে-সব ধর্মানুষ্ঠান অপর ধর্মমত কর্তৃক পবিত্ররূপে স্বীকৃত, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যের নিকটেই তাহারা বিশেষ অর্থপূর্ণ। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, স্বামীজী রোমের 'পবিত্র সোপানরাজি' (Scala Santa)[১] দর্শনে অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অধিকন্তু এই সঙ্ঘের আদর্শ হইল, নিষ্ঠাবান ভক্তগণের ন্যায় সকল অনুষ্ঠানে যোগদান। আমার নিজের গুরুর সম্বন্ধে দেখিয়াছি, তীর্থদর্শনকালে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক যেরূপ করিয়া থাকেন, সেইভাবে তিনি পায়সভোগ দিতেন অথবা মালা জপ করিতেন। এই সকল স্থলে তিনি জাগতিক অথবা ধর্মীয় সকল ব্যাপারে আচার-অনুষ্ঠানের তুচ্ছ নিয়মগুলিও যথাযথভাবে পালন করিতেন। এইভাবেই উচ্চতম ভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্বে তিনি সাধারণ লোকের সহিত নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কাশ্মীরে দুইটি স্থান অতীব পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। একটি ক্ষীরভবানী নামক প্রস্রবণ, যেখানে জগন্মাতার পূজা হইয়া থাকে ; অপরটি অমরনাথ নামক পর্বতগুহা, তুষারময় শিবলিঙ্গ যেখানে বিরাজমান। এবং ঐ গ্রীষ্মকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল স্বামীজী কর্তৃক ঐ স্থান দুইটি দর্শন। কিন্তু আমরাও উচ্চ আশা পোষণ

---

১ Scala Santa or Pilate's Stair case—রোমের 'ল্যাটারণ প্যালেস' নামক প্রাসাদের অন্তর্গত সেন্ট জনের গীর্জার উত্তরদিকের বিখ্যাত সোপানাবলী। কথিত আছে, ইহার আটাশটি মার্বেল পাথরের ধাপ এককালে জেরুজালেমে খ্রীস্টের বিচারক পাইলেটের বাড়ির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিঁড়ি দিয়া মধ্যযুগে নির্মিত পোপেদের পূজাগৃহে উঠা যায়, এবং লোকে হামাগুড়ি দিয়া এই সিঁড়ি আরোহণ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে।—অনুঃ

করিতাম। যথাযথভাবে ধ্যান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমরা কোন নির্জন স্থানে কিছুকাল বাসের অনুমতি প্রার্থনা করি—যেখানে নিয়মিত শিক্ষাধীনে থাকিয়া কয়েকঘণ্টা মৌন অবলম্বনপূর্বক ধ্যানাভ্যাসের চেষ্টা করিতে পারিব। এই কারণে, কয়েকটি তাঁবু আনা হইল, এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য আচ্ছাবল নামক স্থানে বনের প্রান্তে আমাদের তাঁবু পড়িল। অমরনাথ তীর্থযাত্রা হয় আগস্ট মাসের প্রথমে, আর ৩০ সেপ্টেম্বর স্বামীজী আমাদের ছাড়িয়া ক্ষীরভবানী দর্শনে গমন করেন। অবশেষে ১২ অক্টোবর বারামুল্লায় আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি। আমাদের যাত্রারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সকল মহান উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার ব্যতীত, যে সমুজ্জ্বল জীবনের সংস্পর্শে আমরা বাস করিতাম, তাহার উজ্জ্বলচ্ছটা প্রায়ই আমাদের উপর আসিয়া পড়িত। একবার কয়েকদিন অন্যত্র বাসের পর তিনি সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং ভক্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আহার্য প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, ভগবৎপ্রেমের উচ্চ শিখরে যিনি অবস্থান করিতেছেন তাঁহার নিকট আহারের চিন্তা পর্যন্ত কত অসহনীয়! আর একদিন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে আমরা কয়েকজন মহিলা আমাদের তত্ত্বাবধায়িকা ধীরামাতার নৌকায় বসিয়া (আমরা সেদিন তাঁহার অতিথি) মৃদুস্বরে গল্পগুজব করিতেছি, এমন সময় স্বামীজী হঠাৎ আমাদের সহিত কয়েক মিনিট কথা বলিয়া কাটাইবার জন্য আসিলেন। ইউরোপযাত্রার দিন আসন্ন, সুতরাং সেই প্রসঙ্গ উঠিল। কিন্তু শীঘ্রই উহা শেষ হইয়া গেল। তারপর যাঁহাকে ভারতবর্ষে একাকী থাকিয়া যাইতে হইবে বলিয়া একরূপ স্থির ছিল, তিনি বলেন, অপরের অভাব তাঁহাকে বিলক্ষণ অনুভব করিতে হইবে। তাঁহার দিকে ফিরিয়া এক অদ্ভুত কোমলতার সহিত স্বামীজী বলিলেন, "কিন্তু, এত গুরুতর কষ্ট মনে করছ কেন? হাসিমুখে কেন বিদায় দাও না? পাশ্চাত্যবাসী তোমরা বড় সহজে বিষণ্ণ বোধ কর। তোমরা দুঃখের উপাসনা কর। তোমাদের সারা দেশে এই আমি দেখেছি। প্রতীচ্যে তোমাদের সামাজিক জীবন বাইরে থেকে হাস্যমুখরিত, কিন্তু ভিতরে গভীর মর্মব্যথা। শীঘ্রই তা কান্নায় পরিণত হয়। আমোদপ্রমোদ যা কিছু, সব উপরে—আসলে তা গভীর দুঃখে পূর্ণ। কিন্তু এদেশে বাইরের দিকটা দুঃখপূর্ণ ও নিরানন্দ, কিন্তু ভিতরে নিশ্চিন্তভাব ও আনন্দ।

"তোমরা জানো, আমাদের একটা মত হলো, ঈশ্বর ক্রীড়াচ্ছলে নিজেকে জগৎরূপে বিকাশ করেছেন বলে কল্পনা করা হয়। অবতারগণ লীলা হেতু এখানে আগমন করেন এবং বাস করেন। খেলা—সব খেলা। খ্রীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন

কেন ? সে কেবল লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও। বলো, এ সব লীলা, লীলা। তুমি কিছু করেছ কি ?" অতঃপর আর একটি কথাও না বলিয়া তিনি নক্ষত্রালোকে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং নিজের নৌকায় চলিয়া গেলেন। আমরাও নদীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাত্রির মতো বিদায় লইলাম।

নির্জনবাসের সপ্তাহে এক সন্ধ্যায় আমরা নদীর তীরে বিশাল বৃক্ষগুলির নিচে বসিয়াছিলাম, এবং স্বামীজী 'নেতৃত্ব' সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। তৎকালীন দুইটি প্রসিদ্ধ ধর্মসমাজের তুলনা করিয়া তিনি প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। উহার মধ্যে একটি প্রবর্তকের জীবিতকালেই প্রতিদিন সংখ্যা ও আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছিল, অপরটি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল। পরিশেষে স্বামীজী বলেন, "আমার বিশ্বাস, নেতা এক জীবনে গড়ে ওঠে না। নেতা জন্মায়। কারণ, সংগঠন বা পরিকল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু নেতার প্রকৃত লক্ষণ হলো তিনি অত্যন্ত ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে একটা সাধারণ সহানুভূতিসূত্রে একত্র করতে পারেন। আর এ কাজ স্বাভাবিক ক্ষমতাবশে আপনি সম্পন্ন হয়, চেষ্টা করে করা যায় না।"

এই কথার প্রসঙ্গে ক্রমশঃ প্লেটোর কথা উঠিল, এবং একজন প্লেটোর 'Ideas' বা ভাবাদর্শের মতবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। স্বামীজী উহার ব্যাখ্যা করিলেন এবং অবশেষে প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে গিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুতরাং দেখতে পাচ্ছ আমরা যা কিছু দেখছি, সবই সেই মহান ভাবের ক্ষীণ বিকাশমাত্র ; সেই ভাবসত্তাই কেবল সত্য ও সম্পূর্ণাঙ্গ। কোন এক জায়গায় একটা আদর্শ ত্বং পদার্থ রয়েছে, আর এই জগতে কেবল তাকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা অনেক বিষয়ে আদর্শের কাছে যেতে পারছে না। তথাপি এগিয়ে চলো। কোন-না-কোনদিন আদর্শকে ধরতে পারবে।"

আর এক উপলক্ষে জীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন করা সম্পর্কে স্বামীজীর কোন কথার উত্তরে একজন বলেন, "হিন্দুরা এই জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, আমি তা অনুভব করতে পারি না। আমার মনে হয়, নিজের মুক্তিসাধনের চেয়ে যেসকল মহৎ কাজ আমার প্রীতিকর, তাতে সহায়তা করবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তীব্রস্বরে উত্তর দেন, "তার কারণ তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটি জয় করতে পার না। কিন্তু বাইরের কোন

জিনিসই ভাল হয় না। তারা যেমন আছে, তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

এই শেষ কথাটি আমার নিকট বেদবাক্যের ন্যায় মূল্যবান মনে হয়—"তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।" এইরূপ, আমার মনে আছে, আলমোড়ায় অবস্থানকালে জনৈক নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট কর্ম সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি ছিল—যদি কেহ কর্মবশতঃ বলবানকে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে দেখে, তবে তাহার কি করা উচিত ? স্বামীজী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তরে বলেন, "কেন, বলবানকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া—এর আর কথা কি আছে ? এই কর্ম সম্পর্কে তুমি তোমার নিজের কর্তব্যটুকু ভুলে যাচ্ছ। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার তোমার সর্বদা রয়েছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমরনাথ

আচ্ছাবলের মোগলবাগে একদিন আমরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসিয়া আহার করিতেছি, এমন সময় স্বামীজী হঠাৎ ঘোষণা করিলেন, তিনি যাত্রিগণের সহিত অমরনাথ যাত্রা করিবেন এবং তাঁহার কন্যাকেও (লেখিকা) সঙ্গে লইবেন। আমাদের ক্ষুদ্র দলটির সকলেই এই সংবাদে এবং ঐ কন্যার সৌভাগ্যে এত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার যাত্রা সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইল না। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে, এবং উক্ত যাত্রার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর আনুকূল্যে, এই অভিনব তীর্থদর্শনের আয়োজন চলিতে লাগিল।

সেই কয় সপ্তাহ মনে হইতেছিল কাশ্মীর তীর্থযাত্রীতে পরিপূর্ণ। শেষ বন্দোবস্তের জন্য আমরা আচ্ছাবল পরিত্যাগ করিয়া ইসলামাবাদে আমাদের নৌকায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। সর্বত্র নূতন নূতন যাত্রীদল চলিয়াছে। নিস্তব্ধ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সব সম্পন্ন হইতেছে। দুই-তিন সহস্র লোক একটি মাঠে ছাউনি ফেলিয়া আবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঐ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। চুল্লীর ছাই ব্যতীত রাত্রিবাসের আর কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। তাহারা সঙ্গে বাজার লইয়া চলিয়াছে, প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে

তাঁবু-খাটানো ও দোকান-সাজানোর কার্য অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত হয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করা যেন তাহাদের স্বভাবগত। ছাউনির এক অংশের মাঝখান দিয়া চওড়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে—এবং সেখানে শুষ্ক ফল, দুধ ও চালডাল কিনিতে পাওয়া যায়। তহশীলদারের তাঁবুটি—যাহার এক পার্শ্বে স্বামীজীর ও অপর পার্শ্বে আমার তাঁবু—সাধারণতঃ এরূপ স্থানে খাটানো হইত, যেখানে সন্ধ্যাকালে আগুন জ্বালানোর সুবিধা হয় এবং এইরূপে উহা স্বামীজীর সান্নিধ্যবশতঃ পরস্পরের মেলা-মেশা করিবার স্থান হইয়া উঠিত।

যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু। তাঁহাদের তাঁবুগুলির রঙ গৈরিক; কতকগুলি আবার আকারে এক একটি বড় ছাতার মতো। এই সাধু সম্প্রদায়ের উপর স্বামীজীর অসীম প্রভাব। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান, তাঁহারা প্রত্যেক বিশ্রামস্থলে স্বামীজীকে ঘিরিয়া থাকিতেন। তাঁহার তাঁবুর মধ্যে সর্বদা ভিড়, দিনের আলো থাকা পর্যন্ত সাধুরা কথাবার্তায় মগ্ন থাকিতেন। স্বামীজী পরে আমাদের বলেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ ছিল শিববিষয়ক, আর মধ্যে মধ্যে তিনি জোর করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ বাহ্যজগতের প্রতি আকর্ষণ করিলে তাঁহারা গম্ভীরভাবে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, বিদেশীরাও 'মানুষ'। তবে স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে পার্থক্য করা কেন? আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ধর্মের প্রতি স্বামীজীর প্রেম ও সহানুভূতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। যে পরলোকচিন্তা স্বদেশ-বিদেশকে অভিন্ন জ্ঞান করাইত, সেই চিন্তাই এই সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণকে হিন্দু ও মুসলমান যে এক অখণ্ড সত্তার দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ অঙ্গবিশেষ—এই চিন্তায় বাধা দিত। তাঁহাদের যুক্তি ছিল, ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, এরূপ বহুলোকের শোণিতে পঞ্চনদের ভূমি প্লাবিত। অন্ততঃ এখানে যেন স্বামীজী প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণতা মানিয়া চলেন! ইহার উত্তরে সেই সময়ের মতো স্বামীজী কতকগুলি আচরণে বিরত রহিলেন, যাহাতে ভ্রাতৃস্থানীয় সাধুমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল এবং তাঁহার মূল নীতিগুলি অধিকতর দৃঢ়তার সহিত গভীরভাবে তাঁহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। এইরূপ আচরণ তাঁহার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভাবীযুগের, কোনক্রমে পূর্ববর্তী যুগে আসিয়া পড়িয়াছিলেন! যাহা হউক, স্বামীজী যখন এই সকল আলোচনা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন উহার অসংলগ্নতা দর্শনে পাশ্চাত্যবাসীরা কৌতুক অনুভব না করিয়া পারেন নাই। কারণ, এই তীর্থযাত্রা-সংক্রান্ত বহু কর্মচারী ও ভৃত্য এবং তহশীলদার স্বয়ং ছিলেন মুসলমান এবং

যথাসময়ে তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের গুহায় প্রবেশে যে কোনরূপ বাধা থাকিতে পারে, একথা স্বপ্নেও কাহারও মনে উঠে নাই। বস্তুতঃ পরে তহশীলদার কয়েকজন বন্ধুসহ স্বামীজীর নিকট যথাবিধি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করেন , এবং এই ব্যাপার কাহারও নিকট বিস্ময়কর বা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ইসলামাবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পথের মধ্যে এক জায়গায় যাত্রিদলের সহিত মিলিত হই এবং তাহাদের সঙ্গে সেই রাত্রির মতো বওয়ান নামক স্থানে তাঁবু ফেলা হয়। বওয়ান কতকগুলি পুণ্য উৎসের জন্য বিখ্যাত। সন্ধ্যাকালে দীর্ঘিকার পরিষ্কার কাল জলে দীপমালার প্রতিচ্ছায়া, এবং অসংখ্য যাত্রীর এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে গমন—এখনও আমার মনে পড়িতেছে।

পহলগাম মেষপালকগণের গ্রাম—একাদশী পালন করিবার জন্য যাত্রিদল এখানে একদিন বিশ্রাম করিল। অদূরে দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সংযোগস্থলে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী, তাহারই প্রস্তর-সংঘর্ষে সৃষ্ট গর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুদ্বীপ। সুন্দর দৃশ্য! দুই পার্শ্বে ঢালু জমি সরল বৃক্ষের সারিতে ছাইয়া গিয়াছে। সূর্যাস্তের পর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বতের উপর দিয়া চন্দ্র দেখা গেল— এখনও পরিপূর্ণ নহে। সুইজারল্যাণ্ড অথবা নরওয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যগুলির অন্যতম। এখানে আমরা শেষ জনবসতির চিহ্ন দেখিলাম—একটি পুল, একটি খামারবাড়ি, তাহার সংলগ্ন ক্ষেত্র কর্ষণ করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুটির। শেষ পথটুকু অতিক্রম করিবার জন্য যাত্রা আরম্ভ হইলে দেখিলাম, অবশিষ্ট যাত্রিগণের তাঁবুগুলি তখনও শস্পাচ্ছাদিত গোলাকার পাহাড়টির উপর খাটানো রহিয়াছে।

অনির্বচনীয় সৌন্দর্যপূর্ণ দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা তিন সহস্র যাত্রী সম্মুখস্থিত উন্মুক্ত উপত্যকায় আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিন আমাদের তাঁবু পড়িল সরল বৃক্ষের বনে ; পরদিন তুষারবর্ত্মরেখা অতিক্রম করিয়া একটি তুষার নদীর ধারে আমরা তাঁবু খাটাইলাম। নদীটি জমিয়া গিয়াছে। সে রাত্রে জুনিপার কাঠ দ্বারা ছাউনীর সুবৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ; পরদিন সন্ধ্যায় আরও উচ্চে অবস্থান করায়, ঐ বিরল ইন্ধনের অনুসন্ধানে ভৃত্যগণকে বহু ক্রোশ ঘুরিতে হয়। অবশেষে প্রকৃত পথের শেষ হইয়া গেল এবং আমরা পাকদণ্ডী (অত্যন্ত উঁচু-নিচু সরু পথ) দিয়া অতিকষ্টে খাড়া খাড়া পাহাড় চড়াই-উৎরাই করিতে লাগিলাম। অবশেষে যে গিরিসঙ্কটে অমরনাথ-গুহা অবস্থিত. সেখানে উপস্থিত হওয়া গেল। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ছড়ানো। সামনেই তুষারমণ্ডিত শিখরগুলি সদ্য পতিত তুষাররূপ শ্বেত

অবগুণ্ঠনে আবৃত। গুহার অভ্যন্তরে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, এমন এক গভীর অংশে মহান তুষারলিঙ্গ বিরাজমান। যে সকল কৃষক ঐ তুষারলিঙ্গের প্রথম দর্শনলাভে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট উহা সাক্ষাৎ ভগবানের আবির্ভাব বলিয়াই বোধ হইয়া থাকিবে।

আসিবার পথে স্বামীজী তীর্থযাত্রার প্রত্যেকটি বিধি-নিয়ম পালন করিয়াছেন। মালা-জপ, উপবাস এবং যাত্রার দ্বিতীয় দিনে কঙ্করময় নদী গর্ভগুলি অতিক্রমকালে পরপর পাঁচটি স্রোতস্বিনীর (পঞ্চতরণী) বরফ-গলা জলে স্নান—সবই তিনি যথাবিধি করিয়াছেন। এইবার যখন তিনি গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল, মহাদেব যেন সশরীরে তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন। কোলাহল করিয়া অসংখ্য যাত্রী গুহায় প্রবেশ করিতেছে, মাথার উপর পারাবতকুল ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িতেছে; তাহারই মধ্যে স্বামীজী অপরের অলক্ষ্যে দুই-তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; তারপর পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এই ভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরে বলিয়াছিলেন, ঐ সংক্ষিপ্ত কয়েক মুহূর্তে তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করেন। আশৈশব যে অস্ফুট ধারণা তাঁহার মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, পর্বতের মধ্যে কোন শিব-মন্দিরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে, সম্ভবতঃ এইরূপে তাহা ব্যর্থ হয়, অথবা সার্থকতা লাভ করে।

গুহার বহির্ভাগে অসহায় যাত্রিগণের উপর পাণ্ডাদের অত্যাচার ছিল না। অনাড়ম্বর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য অমরনাথের প্রসিদ্ধি আছে। রাখিবন্ধনের পুণ্য দিবসেই এই যাত্রার শ্রেষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেকেই আমাদের হাতে রক্ত ও পীতবর্ণের রাখি বাঁধিয়া দিয়া গেল। অতঃপর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আমরা নদীর ধারে কয়েকটি প্রকাণ্ড উচ্চ পাথরের উপর বসিয়া আহার সম্পন্ন করিলাম, পরে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

স্বামীজী স্থান মাহাত্ম্যে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বোধ হইল, এরূপ সুন্দর স্থানে ইতিপূর্বে তিনি আর কখনও আসেন নাই। বহুক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন, "আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, কী ভাবে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। গ্রীষ্মকালের কোন একদিন একদল মেষপালক তাদের নিরুদ্দিষ্ট মেষগুলির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ে। তারপর উপত্যকায় অবস্থিত তাদের ঘরে ফিরে বর্ণনা করে, কী ভাবে তারা হঠাৎ মহাদেবের দর্শন লাভ করেছে।"

অন্ততঃ আমার গুরুর নিজের সম্পর্কে এইরূপ কাহিনী বলা চলে। তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও শুভ্রতা তাঁহাকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করিয়াছিল। গুহাটি তাঁহার নিকট কৈলাসের রহস্য উদ্ঘাটিত করে। কীভাবে তিনি একটি পার্বত্য গুহায় প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন, তাহার স্মৃতি তিনি সারাজীবন হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ক্ষীরভবানী

অমরনাথ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা ছিল শিববিষয়ক চিন্তার সহিত জড়িত; প্রতি পদক্ষেপে মনে হইত, আমরা সেই চিরতুষারমণ্ডিত মহান পর্বতমালার সমীপবর্তী হইতেছি, যাহা একাধারে তাঁহার প্রতিরূপ এবং আবাসভূমি। সায়াহ্নে তুষারময় গিরিসঙ্কট ও আন্দোলিত সরলবৃক্ষগুলির উপর দিয়া দৃশ্যমান নবীন চন্দ্রমা যেন আমাদের জোর করিয়া মহাদেবের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। সর্বোপরি, যে ধ্যানরাজ্যের পরিমণ্ডলে আমরা অবস্থান করিতেছিলাম, তাহার অন্তরতম প্রদেশে ও কেন্দ্রস্থলে সেই মহাদেবই বিরাজ করিয়া থাকেন—ধ্যানমগ্ন, নির্বাক—যিনি সর্বগুণের অতীত, মনোবুদ্ধির অগোচর। একদা নিঃসন্দেহ যে, প্রজ্ঞাসহায়ে মানুষ ঈশ্বরকে যতদূর ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছে, হিন্দুর এই শিববিষয়ক ধারণা তাহার সর্বোচ্চ সীমা। তিনিই সর্বোপাধিবর্জিত ঈশ্বর, আবার তাঁহাকেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লাভ করা যায়।

সম্ভবতঃ চরম জ্ঞানের অন্বেষণে, অব্যক্ত সত্তাকে এইরূপ ব্যক্তি জ্ঞানে চিন্তা করার পর ঈশ্বর সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা—অর্থাৎ ঈশ্বরকে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত শক্তিরূপে চিন্তা করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। সহজেই বুঝা যায়, যিনি এই উভয় ভাবের গভীরতম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রতীক সহায়ে ঈশ্বরকে ধারণা করিবার জন্য মানব মনের যে চেষ্টা তাহার প্রত্যেকটির অর্থবোধ করা সম্ভব, কারণ, সকল প্রতীকই শিব বা অনন্ত সত্তা ও শক্তি এই দুই প্রতীকের একটির অন্তর্ভুক্ত হইবেই। মানুষ যদি পরব্রহ্মকে আদৌ চিন্তা করে, তবে অনাদি-অনন্ত সত্তারূপে, অথবা অনাদি-অনন্ত শক্তিরূপে তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে। এই তথ্যের অন্তরালে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান কি-না, সে বিষয়ে চিরকাল অনুমান বা কল্পনার অবকাশ থাকিয়া যাইবে। যাহা হউক, কোন অজ্ঞাত কারণে,

আগস্ট মাস হইতে স্বামীজীর চিত্ত শিব হইতে শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সর্বদাই তিনি রামপ্রসাদের গানগুলি গাহিতেন, যেন নিজেকে শিশুরূপে কল্পনা করিয়া সেইভাবে মগ্ন হইতে চাহিতেন। একবার তিনি আমাদের কয়েকজনকে বলেন, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন, জগন্মাতার উপস্থিতি অনুভব করিতেছেন—যেন তিনি সাকার রূপ ধারণ করিয়া কক্ষমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সর্বদা জগন্মাতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলা তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দলের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ ছিলেন, তাঁহারাও এই ধরনে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কোন সযত্নপোষিত উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহারা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন, "মার যা ইচ্ছা, মা সব জানেন।"

কিন্তু ক্রমে স্বামীজীর তন্ময়ভাব গাঢ়তর হইল। ক্ষোভের সহিত তিনি অভিযোগ করিলেন, চিন্তারূপ ব্যাধির দ্বারা তিনি পীড়িত—যে চিন্তা মানুষকে দগ্ধ করে, নিদ্রা বা বিশ্রামের অবসর দেয় না, এবং বহু সময় ঠিক যেন মানুষের কণ্ঠস্বরের ন্যায় প্ররোচিত করিতে থাকে। তিনি সর্বদা আমাদের নিকট সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত হইবার আদর্শটি বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিতেন—যে ধারণায় হিন্দুর পাপবোধ সমস্যার সমাধান নিহিত। কিন্তু বর্তমানে মনে হইল, তিনি যেন জগতের মধ্যে যাহা কিছু ঘোররূপ, যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বোধ্য, তাহারই উপর সমগ্র মন অর্পণ করিয়াছেন। ঐ পথ অবলম্বনে এই জগৎপ্রপঞ্চের পশ্চাতে অবস্থিত অদ্বয় ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প দেখা গেল। কাশ্মীর যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায়[১] ভীষণের পূজাই এখন তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। রোগ ও যন্ত্রণা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিত, "যেখানে বেদনা অনুভূত হইতেছে, সে স্থান তিনি, তিনিই যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাদাতা। কালী! কালী! কালী!"

একদিন তিনি বলেন, তাঁহার মাথায় কতকগুলি চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাকে লেখনী সাহায্যে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাঁহার অব্যাহতি নাই। সেই সন্ধ্যায় কোন স্থানে ভ্রমণের পরে বজরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, স্বামীজী আসিয়াছিলেন এবং আমাদের জন্য স্বহস্তে লিখিত 'Kali the Mother'

১ স্বামীজী একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উপযোগী একখণ্ড জমি মনোনীত করিবার জন্য কাশ্মীর-মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে আগমন করেন। তাঁহাকে উক্ত জমি মনোনীত করিবার প্রস্তাবটি দুইবার উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তদানীন্তন রেসিডেন্ট স্যার অ্যাডালবার্ট ট্যালবট দুইবারই উহা কাউন্সিলের কার্যতালিকা হইতে বাদ দেন। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে আলোচনা পর্যন্ত হইতে পারে নাই।

('মৃত্যুরূপা মাতা') কবিতাটি রাখিয়া গিয়াছেন। পরে শুনিলাম, দিব্যভাবের তীব্র উন্মাদনায় কবিতাটি লেখা শেষ হইবামাত্র তিনি মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন।

কবিতাটি এই ঃ

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগে!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়,
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।[১]

এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে স্বামীজী তাঁহার নৌকা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লন। একজন তরুণ ব্রাহ্ম ডাক্তার ঐ গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিই কেবল জানিতেন, স্বামীজী কোথায় আছেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর লইতে পারিতেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রশংসার অতীত। পরদিন প্রতিদিনের মতো ডাক্তারবাবু স্বামীজীর নিকট গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া আসেন। পরদিন ৩০ সেপ্টেম্বর স্বামীজী ক্ষীরভবানী নামক কুণ্ডদর্শনে যাত্রা করেন, বলিয়া যান, কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে। সেইদিন হইতে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

* * *

---

১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ।—অনুঃ

ঐ দিন অপরাহ্নে দেখিলাম, তিনি নৌকায় ফিরিয়া আসিতেছেন। নৌকা স্রোতের উজানে চলিতেছে। তিনি এক হাতে নৌকার ছাদের বাঁশের খুঁটি ধরিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার অপর হাতে একছড়া গাঁদাফুলের মালা। তাঁহার আকৃতি যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বজরায় প্রবেশ করিয়া তিনি নীরবে মালাছড়াটি এক এক করিয়া সকলের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। অবশেষে মালাটি একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটি আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম।" তারপর তিনি উপবেশন করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর 'হরিঃ ওঁ' নয়, এবার 'মা', 'মা' !"

আমরা নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলাম। কথা বলিবার চেষ্টা করিলেও পারিতাম না। এমন কিছুতে স্থানটি এরূপ ভরপুর হইয়া গিয়াছে যে, চিন্তাস্রোতও যেন থামিয়া গিয়াছে। তিনি আবার বলিলেন, "আমার সব স্বদেশপ্রেম ভেসে গেছে। আমার সব গেছে। এখন কেবল 'মা', 'মা' !"

ক্ষণকাল নীরবতার পর তিনি কেবল বলিলেন, "আমার খুব অন্যায় হয়েছে। মা আমাকে বললেন, 'যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কী ? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি ?' সুতরাং আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছুই নেই। আমি তো ক্ষুদ্র শিশু মাত্র !"

তারপর তিনি নানা বিষয়ে এবং অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রার কথা বলিলেন। গত সপ্তাহের নানারূপ মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে তাঁহার যে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়, তাহারও উল্লেখ করিলেন। সস্নেহে বলিলেন, "এখন আমি এর চেয়ে বেশি বলতে পারব না; নিষেধ আছে।" বিদায় লইবার পূর্বে আবার বলিলেন, "কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে আমি কোনরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইনি।"

পরবর্তী কয়দিনে আমরা স্বামীজীকে অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম। তবে পরদিন প্রাতরাশের পূর্বে আমাদের মধ্যে দুইজন অতি অল্পক্ষণের জন্য তাঁহার সঙ্গে নদীতীরে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় নাপিতকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ সব আর থাকবে না।" তিনি চলিয়া গেলেন এবং আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন একেবারে মুণ্ডিত মস্তকে। গত সপ্তাহে কঠোর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা তিনি যে দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথা বা আচরণের মাধ্যমে অনুমান করিয়া লইতাম—এখন ঐ সকল স্মরণ করিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার উপবাস, কুণ্ডে প্রত্যহ পায়স ও বাদাম ভোগ

নিবেদন এবং প্রতিদিন প্রাতে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের শিশুকন্যাকে কুমারী উমারূপে পূজা করা—এসকল আমরা কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতাম। আবার এই সকল অনুষ্ঠান এরূপ পূর্ণ অহংশূন্যতায় সম্পন্ন হইয়াছিল যে, উহার ফলে তাঁহার বিশেষ শারীরিক অনিষ্ট হইলেও সেজন্য কখনও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই।

একদিন এক ব্যক্তি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসেন। স্বামীজী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে ও মুণ্ডিতমস্তকে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া পড়েন। "ন্যায়ের সমর্থন করিতে গিয়া মৃত্যুও শ্রেয়ঃ অথবা গীতার উপদেশ[১] গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে কোন কিছুর প্রতিকার না করিতে হয়?"—তাঁহার নিকট এই সমস্যাটি উপস্থাপিত করা হয়। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কোন প্রতিকারের পক্ষপাতী নই।" তারপর আবার বলিলেন, "এটি সন্ন্যাসীর জন্য। গৃহীর পক্ষে আত্মরক্ষাই বিহিত।"

স্বামীজীর অন্তর্মুখ ভাব ক্রমশঃ গভীর ও গাঢ় হইতে লাগিল। এই সময়টিকে 'তাঁহার জীবনের সঙ্কট-মুহূর্ত' বলিয়া তিনি একবার উল্লেখ করেন। আবার জগন্মাতার ক্রোড়স্থিত শিশু বলিয়া নিজেকে তিনি অভিহিত করেন, মা তাঁহাকে আদর করিতেছেন। আর আমাদেরও স্বতই মনে হইল, হয়তো জগন্মাতার এই আদর মানবের স্নায়ু ও মনে দুঃসহ যন্ত্রণারূপে প্রকাশ পায়; তথাপি তাঁহারই স্নেহপ্রসূত বলিয়া পরমানন্দে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি কি বলেন নাই, "তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ থাকতে পারে?"

সকল ব্যবস্থা হইয়া যাইবামাত্র আমরা বারামুল্লা যাত্রা করিয়া ১১ অক্টোবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। পূর্বেই স্থির হয় যে, তিনি পরদিন অপরাহ্নে লাহোর যাত্রা করিবেন এবং আমরা আরও কিছুদিন বারামুল্লায় অবস্থান করিব। নদীপথে আসিবার সময় আমরা তাঁহাকে অতি অল্পই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি প্রায় সর্বদাই মৌনাবলম্বী থাকিতেন এবং একাকী নদীতীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিতেন—কদাচিৎ আমাদের বজরায় তাঁহার পদার্পণ ঘটিত। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। আবার সাম্প্রতিক মহান উপলব্ধির ফলে তাঁহার শারীরিক অবনতি তাঁহাকে এতদূর অবসন্ন করিয়া

---

১ এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমি কোনক্রমে বুঝিতে পারি নাই, কিরূপে এই ব্যক্তি গীতা হইতে এই বিশেষ উপদেশটি সংগ্রহ করেন।

তোলে যে, তিনি নিজে উহা তেমন বুঝিতে পারেন নাই! নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে যন্ত্রণার যেমন আর উপলব্ধি হয় না, তেমন শরীরও অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া মাত্রাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ ধারণে অসমর্থ হয়। বোধ হয়, এই সকল কারণে আমাদের মনে হইতেছিল, কে জানে কত দিনের জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছি। আর সম্ভবতঃ এই চিন্তা করিয়াই তিনি বুধবার প্রাতে জলযোগ শেষ হইয়া যাইবার পর আমাদের নিকট আগমন করেন এবং কথাবার্তা বলিবার জন্য থাকিয়া যান।

সেদিন সকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তায় কাটিয়া গেল। এখানে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া অপেক্ষা, আমাদের মনে উহা কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার একটা সাধারণ আভাস দেওয়া সহজ। কথা শুনিতে শুনিতে আমরা যেন এক অন্তরতম পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। মধ্যে মধ্যে তিনি কোন ভক্তিমূলক সঙ্গীতের একাংশ গাহিয়া তাহার অনুবাদ করিতেছিলেন—গানগুলি সবই জগন্মাতার উদ্দেশ্যে।

"শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার-বাজার মাঝে)...
ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি,"

এই গানটি তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বার বার গাহিলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তজন চিত্তহারিণী শ্যামা মায়ের মূর্তি আমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

নিজের কবিতা হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন—

"দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।"

মাঝখানে তিনি থামিয়া বলিলেন, "দেখেছি, সব বর্ণে বর্ণে সত্য!"—

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

"মা সত্যসত্যই তার কাছে আসেন। আমি নিজ জীবনে এটি প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ, আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি!"

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কথা বলিলেন। বলিলেন, "গঙ্গাতীরে মৌনী কৌপীনমাত্রধারী পরিব্রাজকজীবন যাপন ছাড়া আর কোন কামনা নেই। আর কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই। 'স্বামীজী' চিরদিনের মতো মরে গেছে। আমি কে যে

জগৎকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব আমার বলে মনে করছি? এ কেবল বৃথা আস্ফালন ও অহঙ্কার। জগন্মাতার আমাকে কোন প্রয়োজন নেই— আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন। এই অবস্থা যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে নিষ্কাম কর্মও মায়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

"প্রেমই একমাত্র পথ। লোকে যদি আমাদের প্রতি অন্যায় করে থাকে, তাহলেও আমাদের তাদের ভালবেসে যেতে হবে, অবশেষে তারা এই ভালবাসায় বশ না হয়ে থাকতে পারবে না। এই আর কি।"

তথাপি এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া আমি বেশ বুঝিতেছি, ইহারা যে বিশাল হৃদয়ের ভাষা, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস আমি দিতে পারিব না। জগতের যে-কোন ব্যক্তির সামান্য আঘাতও যেন আমাদের গুরুদেবের হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া যাইত না; কোন যন্ত্রণাই, এমনকি মৃত্যু-যন্ত্রণাও যেন তাঁহার নিকট হইতে প্রেম ও আশীর্বাদ ব্যতীত আর কিছু বাহির করিতে পারিত না।

তিনি আমাদের বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী বলিলেন; বশিষ্ঠের শতপুত্র বিশ্বামিত্র কর্তৃক নিহত, পুত্রশোকভারাক্রান্ত ঋষিকে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল তাহাও বলিলেন। অতঃপর স্বামীজী চন্দ্রালোকে বৃক্ষরাজির মধ্যে অবস্থিত কুটিরের বর্ণনা করিলেন—কুটিরের মধ্যে বশিষ্ঠ এবং তাঁহার স্ত্রী অরুন্ধতী। ঋষি তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরচিত অমূল্য গ্রন্থপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, এমন সময়ে অরুন্ধতী নিকটে আসিয়া মুহূর্তের জন্য নত হইয়া দেখিলেন তিনি কি করিতেছেন, তারপর বলিয়া উঠিলেন, "দেব, আজ চন্দ্রের কি উজ্জ্বল শোভা!" ঋষি না তাকাইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, বিশ্বামিত্রের প্রতিভা তার চেয়ে দশ হাজার গুণ উজ্জ্বল!"

সব ভুলিয়া গিয়াছেন! শতপুত্রের নিধন, নিজের অপমান, ক্লেশ—সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি তাঁহার শত্রুর প্রতিভার প্রশংসায় তন্ময়!

"আমাদের প্রেমও ঐরূপ হওয়া চাই, বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের যেরূপ ছিল—তাতে ব্যক্তিগত ভালমন্দের স্মৃতির লেশমাত্র থাকবে না"—স্বামীজী বলিলেন।

এই সময়ে একজন কৃষক কতকগুলি পল্লবসমেত নাশপাতি ফুল আনিয়া আমরা যে টেবিলে বসিয়াছিলাম, তাহার উপর রাখিয়া দিল। আমাদের মধ্যে একজন সেগুলি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "স্বামীজী, পূজার জন্যই এ ফুলগুলির সৃষ্টি, কারণ এদের ফল হবে না।" কিন্তু তিনি তাঁহার দিকে স্মিত হাস্যের সহিত দৃষ্টিপাত মাত্র

করিলেন, আর তিনিও স্বামীজীর প্রগাঢ় তন্ময়ভাব ভঙ্গ করিতে না পারায় ইচ্ছা সত্ত্বেও ফুলগুলি তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিলেন না।

স্বামীজী সত্যই চলিয়া গেলেন। ভৃত্য, মাঝি, বন্ধু, শিষ্য, পিতামাতা ও সন্তান—সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্য বড় রাস্তার উপর টাঙ্গা পর্যন্ত গেলাম। স্বামীজীর প্রতি যাহার অনুরাগ আমরা বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার সর্দার মাঝির সেই চার বৎসরের ছোট শক্ত-সমর্থ কালো মেয়েটি যাত্রাপথে ব্যবহার করিবার জন্য এক বারকোশ ফল মাথায় করিয়া দৃঢ়চিত্তে ছোট ছোট পা ফেলিয়া স্বামীজীর পাশে পাশে চলিল এবং হাসিমুখে তাহাকে বিদায় দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার গাড়ি চলিয়া যাওয়া দেখিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র শিশু অপেক্ষা আমরা কম অভিভূত না হইলেও চিন্তা ও অনুভূতি বাড়িলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে তাহার ও আমাদের মধ্যে নিঃস্বার্থতায় অত্যন্ত ব্যবধান ছিল। পুনরায় কখন তাঁহার দর্শনলাভ করিব তাহা কেহই জানিতাম না, কিন্তু একথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেদিন তাঁহার সঙ্গে আমরা যে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়াছি, তাহার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ অতিবাহিত হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত-পরিবার

স্বামীজীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের সকলকে তিনি বড় করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সান্নিধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনেব অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন দেখিতে পাইত এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিত; আর দোষ-ত্রুটিগুলি দেখিতে পাইলে মনে হইত, ঐগুলি বিশেষ দোষাবহ নহে—উহাদেরও যেন যথেষ্ট কারণ আছে। বলা বাহুল্য, জাগতিক বস্তুজ্ঞানের ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে। কেহ কেহ মানুষের দৈহিক গঠন এবং কার্যকলাপই দেখিতে পায়, এবং বুঝিতে পারে। কেহ বা তাহার আকৃতি পরীক্ষা দ্বারা নির্দেশ করে সাধারণভাবে সে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, এবং তাহার বাহ্য

অবয়বে বিভিন্ন জটিল ভাবপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন দেখিতে পায়। কিন্তু এমন কিছু মানুষও আছেন, যাঁহারা মানব জীবনের পশ্চাতে অবস্থিত অসংখ্য কারণপরম্পরার সমাবেশ সম্পর্কে অবহিত—প্রত্যেকটি জীবন উহাদের এক খণ্ড পরিণাম মাত্র। আমাদের কথা ও কার্য কতটা জ্ঞানের বহির্বিকাশ, তাহা আমরা নিজেরা অনুমান করিতে পারি না।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে কলিকাতায় আসিবার পরে স্বামীজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার সম্বন্ধে আমার ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা কতকটা পূর্বোক্ত ধরনের। ঐ দিন হইতে পরবর্তী জুলাই মাস পর্যন্ত আমি তাঁহাকে সর্বদা তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যেই দেখিতে পাইতাম। এমনকি, সেখানে কোন ভক্ত ইউরোপীয় পরিবারের ব্যবধান পর্যন্ত ছিল না। আমিও তাঁহাদের একজন বলিয়া গণ্য হইলাম, এবং স্বামীজীর প্রতিভাসৃষ্ট অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে, প্রতিপদে তাঁহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত, তাঁহারই প্রগাঢ় স্বজাতিপ্রেমের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমি যেন কোন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যেখানে প্রত্যেক নরনারীর আকৃতি তাহাদের স্বভাবের অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিত।

প্রথম হইতেই স্থির ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব সুবিধামত, আমি কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দিব। স্বামীজীর কার্যপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কার্য আরম্ভ করিবার জন্য কোনরূপ তাড়া না দিয়া ভ্রমণ এবং মানসিক প্রস্তুতির জন্য তিনি আমাকে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিলেন। আমি বেশ জানিতাম, বিদ্যালয়টি খোলা হইলে উহা প্রথমে সাময়িক ও পরীক্ষামূলক হইবে। আমাকে প্রথমে মেয়েদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানিতে হইবে, আমার স্থান কোথায় তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে, এবং যে সমাজের উন্নতিকল্পে আমার সমগ্র প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিব, তাহার সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। একটি মাত্র জিনিস আমার জানা ছিল, তাহা হইল, শিক্ষাসংক্রান্ত সকল প্রচেষ্টা অবশ্যই শিক্ষার্থীর বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী আরম্ভ হওয়া চাই; এবং যাহাতে সে নিজের ভাবে উন্নতি করিতে পারে, সেজন্য তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। আমাকে শিক্ষাবিষয়ক এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা ভারতীয় নারী-সমাজের আধুনিক শিক্ষার যথার্থ উপযোগী এবং সর্বাবস্থায় কার্যকরী হয়। ইহা ব্যতীত আমার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অথবা প্রত্যাশা ছিল না।[১]

---

১ এখানে বলা আবশ্যক যে, উক্ত বিদ্যালয়টি আমি যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও

সম্ভবতঃ অনেকে এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা অনেক বেশি চিন্তা করিয়াছিলেন ; এবং প্রায়ই শুনিতাম, সকল সম্প্রদায়ের গণ্ডির ঊর্ধ্বে থাকাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাকালে কাশ্মীরে বেরনাগ বনের তাঁবুতে এই সকল প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। আমরা একখানা জ্বলন্ত গুঁড়ির চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলাম, সহসা স্বামীজী আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যালয় সম্পর্কে এখন তুমি কি করবে ভাবছ?" আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম, "আমি চাই আমার কোন সহকারী না থাকেন। অতি সামান্যভাবে কাজের আরম্ভ হবে, এবং ছোট ছেলেমেয়ে যেমন বানান করে পড়তে শেখে, আমিও ক্রমে ক্রমে নিজের প্রণালী ঠিক করে নেব। তাছাড়া, আমার ইচ্ছা, এই শিক্ষার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধর্মভাব থাকে। আমার মনে হয়,সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ উপকারী।"

স্বামীজী মনোযোগ দিয়া সব কথা শুনিলেন এবং মানিয়া লইলেন : এবং যেহেতু আমার কোন ইচ্ছাতে তিনি কখনও বাধা দিতেন না, এখানেও তাহাই হইল। অতঃপর তিনি যেন আমার শিষ্য এবং আমি তাঁহার শিক্ষক হইলাম ! কেবল একটি বিষয়ে তিনি দৃঢ় রহিলেন। ভারতীয় নারীগণের যে শিক্ষাকার্যে তাঁহার নাম জড়িত থাকিবে, আমি ইচ্ছামত তাহা সাম্প্রদায়িক করিতে পারি—আমার উক্তির এই অংশের উত্তরে তিনিকেবল বলিলেন, "একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তুমি সকল সম্প্রদায়ের বাইরে যেতে চাও।" একজন মহিলা আমার কার্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন : কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবামাত্র তিনি সে নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে যে অল্প কয়েকজনের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের সহায়তা লইবার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই সমর্থন করিলেন না। ভারতীয় চরিত্রের সমুদ্রতুল্য গভীরতা মাপ করিবার কোন যন্ত্র তখনও পর্যন্ত আমার নিকট ছিল না, সুতরাং প্রথম হইতেই ভুল করা অপেক্ষা কাহারও সাহায্য না লইয়া অগ্রসর হওয়া তাঁহার মতে শতগুণ নিরাপদ।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমি নভেম্বর মাসের প্রথমে একাকী কলিকাতায় পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে শহরের উত্তর প্রান্তে রাস্তা চিনিয়া যাইতে

অস্থায়ী রকমের হইয়াছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে সিস্টার ক্রিস্টিন নামে স্বামীজীর জনৈকা আমেরিকান শিষ্যা ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা কার্যের সমগ্র ভার গ্রহণপূর্বক প্রণালীবদ্ধভাবে উহার পরিচালনা করেন। একমাত্র তাঁহার চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম আজ ইহার উন্নতির কারণ। ১৮৯৮ হইতে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে আমি যে বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করি, তাহাতে বিশেষ শিক্ষালাভ আমারই হইয়াছিল।

সমর্থ হইলাম। যাঁহারা দ্বীপে বাস করেন, তাঁহারা স্বভাবতই কতকটা সামাজিক কঠোরতার পক্ষপাতী। বোধ হয় সেই কারণে আমি মহিলাগণের সহিত একত্র বাস করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। ঘটনাক্রমে, স্বামীজী সেই সময় কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই মাধ্যমে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী 'সারদা দেবী' অথবা ভক্তগণের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্ত্রীভক্তগণসহ নিকটে বাস করিতেন। সেইদিনই আমি তাঁহার নিকট একটি কক্ষে বাস করিবার অনুমতি লাভ করি। আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যাহাদের প্রতি বহুদিন পরে পিছন ফিরিয়া তাকাইলে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালীন সাহস আমাদের অজ্ঞতারই ফল। বলা যায়, ইহা বিধাতারই কৃপা। কারণ, ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ঐ সকল সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন ছিল। আবার একটা কিছু সমাধান করা ব্যতীত গত্যন্তরও ছিল না। তথাপি, যদি আমি ঐ সময় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতাম যে, আমার এই হঠকারিতা কেবল আমার নিরপরাধা আশ্রয়দাত্রীকে নহে, পরন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণকেও সামাজিক গোলযোগের মধ্যে ফেলিবে, তাহা হইলে আমি কখনই ঐরূপ আচরণ করিতাম না। সেরূপ ক্ষেত্রে আমি যেভাবে হউক, ঐ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতাম। কিন্তু যেহেতু আমার ধারণা ছিল, জাতিভেদ ব্যক্তিগত নির্বোধ কুসংস্কার মাত্র—বিদেশী মাত্রেই অনাচারী, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাই উহার কারণ, এবং প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটনে উহার অবসান হইবে—অতএব সব অজ্ঞতা তাঁহার উপর চাপাইয়া হৃষ্টচিত্তে জোর করিয়া আমি এই ভারতীয় মহিলার গৃহে অতিথি হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে এই ব্যাপারে স্বামীজীর প্রভাব সবার উপরে জয়ী হইল—এবং আমি সমাজে গৃহীত হইলাম। আট-দশ দিনের মধ্যেই অতি নিকটে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি প্রতি অপরাহ্ণ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ঘরেই কাটাইতাম। গ্রীষ্মকাল আসিলে তাঁহার বিশেষ আদেশে বিশ্রামের জন্য তাঁহার গৃহেই আসিতাম। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা ছিল। আমার জন্য আর পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল না, অপর সকলের সহিত শীতল ও সাদাসিধা ঘরটিতেই শয়ন করিতাম। পালিশ করা লাল মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তাহার উপর এক-একটি বালিশ ও মশারি।

আমি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইলাম, তাহা এক অদ্ভুত ধরনের। একতলায় প্রবেশ পথে দুই দিকে দুটি ঘর ছিল। একটি ঘরে এক সাধু বাস করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কঠিন তপস্যার ফলে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পূর্ণ যৌবনেই তিনি

মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত। বাংলা শিখিবার জন্য আমি তাঁহার ঘরে যাইতাম। পিছনের রন্ধন কক্ষে তাঁহার এক শিষ্য এবং এক ব্রাহ্মণ পাচক কাজকর্ম করিতেন। ছাদ ও বারান্দা সমেত সমস্ত উপরতলা আমাদের—মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অদূরেই গঙ্গা; উপর তলা হইতে গঙ্গাদর্শন হইত।

আমাদেব ক্ষুদ্র সংসাবটিব কর্ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। তাহার কথা সকলেই জানেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের পর আঠারো বৎসর[১] বয়স পর্যন্ত স্বামী তাঁহার কথা ভুলিয়া যান। পরে মাতাব অনুমতি লইয়া পল্লীগ্রাম হইতে পদব্রজে গঙ্গাতীববর্তী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে স্বামিসকাশে উপস্থিত হইলে পতির দাম্পত্য-বন্ধনের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু তিনি জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কথা বলিলেন। পত্নীও প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তাব সহিত তাঁহাব ঐ জীবনে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা কবিয়া কেবল শিষ্যার ন্যায় তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার জীবনের এই সকল ঘটনা আমরা পূর্বে বহু বার শুনিয়াছি। তখন হইতে সেই উদ্যানেরই একটি গৃহে বহু বৎসর তিনি স্বামীব নিকট পতিব্রতা স্ত্রীব ন্যায় বাস করেন। একাধারে ধর্মপত্নী ও সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণেব মধ্যে তিনিই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ। শিক্ষা-আরম্ভকালে তাঁহার বযস ছিল অল্প; পরে কথাপ্রসঙ্গে কখন কখনও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদান কত বিভিন্নমুখী ছিল তাহার উল্লেখ কবিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব জিনিস গুছাইয়া রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিতান্ত তুচ্ছবিষয়েও তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন—যেমন প্রদীপ জ্বালিবার সাজসরঞ্জাম দিনের বেলায় কোথায় রাখিতে হইবে। কোন বিষয়ে অপরিচ্ছন্নতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং উগ্র কঠোরতা সত্ত্বেও লালিত্য, সৌন্দর্য ও চালচলনে শান্ত-গাম্ভীর্য পছন্দ করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে এই কালের একটি গল্প শুনা যায়। একদিন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল শিশুর ন্যায় আগ্রহ ও গর্বেব সহিত একঝুড়ি ফলমূল শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিলে, তিনি গম্ভীরভাবে উহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু এত বেশি বেশি কেন?" অপ্রত্যাশিত নিরাশায় বালিকা পত্নীর সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। "অন্ততঃ এ-সব আমার জন্য নয়"—এই মাত্র বলিয়া তিনি নীরবে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। নিকটে যে সব বালক

---

১ ইহার পূর্বে প্রধানতঃ একবার চৌদ্দ বৎসর বয়সে কামারপুকুরে তিনি কিছুদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে বাস করেন।—অনুঃ

বসিয়াছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তি পর্যন্ত উড়ে যাবে।"

তিনি তাঁহার এত প্রিয় ছিলেন! তথাপি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, তাঁহার আরাধ্য পতির সম্পর্কে কথা বলিবার সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া রাখেন—তিনি যেন কেহই নহেন। তাঁহার সকল ভক্তই বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেকটি বাক্য যে সত্য হইবে, এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমা সম্পদে-বিপদে 'অটল সুমেরুবৎ দৃঢ়'। 'গুরুদেব' 'শ্রীগুরু' বলিয়া তিনি তাঁহার উল্লেখ করেন, তাঁহার কথাবার্তায় এমন একটি শব্দ কদাপি থাকে না, যাহাতে, 'আমি তাঁহার অমুক' এই বলিয়া কোন আত্ম-অধিকার প্রকাশ পায়। তাঁহার পরিচয় জানে না, এমন কেহ তাঁহার কথাবার্তা হইতে বিন্দুমাত্র অনুমান করিতে পারিবে না যে, উপস্থিত অপর সকলের অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহার অধিকতর স্বত্ব বা দাবী আছে, অথবা তাহাদের অপেক্ষা তাঁহার সম্পর্ক নিকটতর। মনে হয়, পূর্বের ন্যায় পত্নীর নিষ্ঠাটুকু ব্যতীত পত্নীভাব তাঁহার মধ্য হইতে বহুকাল চলিয়া গিয়াছে—সেখানে আছে শুধু 'আমি শিষ্যা' এইভাব। তথাপি সকলে তাঁহাকে এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সহিত একত্র ভ্রমণকালে রেলগাড়িতে কেহই তাঁহার বেঞ্চির উপরের বার্থে আরোহণ করিবেন না। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হইল। তাঁহার উপস্থিতিই সকলের নিকট পরম পবিত্রতাস্বরূপ।

আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। কোন প্রশ্ন যত নূতন বা জটিল হউক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করিয়া দিতে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁহার সকল অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস। তথাপি তিনি সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্ধ্বে বিরাজ করেন। তাঁহার পরিবারের কেহ যদি দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে পীড়ন করে, তবে তাঁহার মধ্যে এক অদ্ভুত শান্ত ও প্রগাঢ়ভাব প্রকাশ পায়। তাঁহার বুদ্ধির অতীত কোন নূতন সামাজিক ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত জটিল চক্রে আবর্তিত অথবা উৎপীড়িত হইয়া কেহ যদি তাঁহার নিকট আসে, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশ্নকর্তাকে বিপদ

হইতে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করেন। যদি কোন কারণে কঠোর হইবার প্রয়োজন হয়, অর্থহীন ভাবপ্রবণতার দ্বারা তিনি কদাপি বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ করিবেন না। কোন ব্রহ্মচারীকে মাধুকরী করিয়া এত বৎসর কাটাইতে হইবে বলিয়া আদেশ দিলে, তাহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি তাঁহার সামনে শ্লীলতার ও মর্যাদার সীমা অতিক্রম করিলে আর কখনও তাঁহাকে মুখ দেখাইতে পারিবে না। এই ধরনেব অপরাধ করিয়াছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "দেখতে পাচ্ছ না, তুমি ওর নারীত্বকে আঘাত করছ? এরূপ করা মহা অনর্থকর।"

তথাপি তাঁহার জনৈক শিষ্যা সঙ্গীতে তাঁহার সহজাত ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃতি সেইরূপ 'সঙ্গীতে ভরপুর', কোমলতা ও কৌতুকে পূর্ণ। আর তাঁহার পূজার কক্ষটি সত্যই মাধুর্যে পূর্ণ।

শ্রীশ্রীমা পড়িতে জানেন, এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় রামায়ণপাঠে অতিবাহিত হয়। তিনি লিখিতে পারেন না। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, তিনি অশিক্ষিত স্ত্রীলোক মাত্র। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি শুধু সংসার পরিচালনা এবং ধর্মজগৎ সম্পর্কে কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা নহে; ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত প্রধান তীর্থগুলি দর্শন করিয়াছেন। আর মনে রাখিতে হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে ব্যক্তিগত চরিত্রে যতখানি উৎকর্ষ লাভ সম্ভব, তিনি তাহার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন নূতন ধর্মীয় ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্ত মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার ক্ষমতার মধ্যেই ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একবার ঈস্টারের দিন অপরাহ্ণে তিনি যখন আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মধ্যে এই শক্তির প্রথম পরিচয় পাই। ইতিপূর্বে যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, জীবনে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় একান্তভাবে তন্ময় থাকিতাম। বিপরীত অবস্থায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার কথা ভাবি নাই। যাহা হউক, ঐ দিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ আমাদের সমস্ত বাড়িটি ঘুরিয়া দেখিবার পরে ঠাকুরঘরে গিয়া বসিবার এবং খ্রীস্টানদের এই উৎসবের অর্থ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর আমাদের ক্ষুদ্র ফরাসী অর্গ্যান সহযোগে ঈস্টার দিনের গান-বাজনা হইল। খ্রীস্টের পুনরুত্থানসম্পর্কীয় স্তোত্রগুলি বিদেশী এবং শ্রীশ্রীমার

সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, তথাপি উহাদের সূক্ষ্ম মর্মগ্রহণ ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম ধর্মজগতে শ্রীসারদাদেবীর অসাধারণ উন্নতিলাভের এক অতীব হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাইলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভে ধন্য শ্রীশ্রীমার অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তগণের মধ্যেও কিছু পরিমাণে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার শক্তির মধ্যে যে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা আছে, তাহা কেবল উচ্চদরের সুগভীর পাণ্ডিত্যেই দেখা যায়।

আর এক সন্ধ্যায় তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তপরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে ইউরোপের বিবাহ-অনুষ্ঠান বর্ণনা করিতে বলেন। যথেষ্ট হাস্য ও কৌতুকের সহিত তাঁহার নির্দেশমতো আমরা একবার পুরোহিতের, পরক্ষণে বরকন্যার ভূমিকা অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। কিন্তু বিবাহের শপথ বাক্য শ্রবণে মাতাঠাকুরানীর চিত্তে যে ভাবের উদয় হইল, তাহার জন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না।

"সম্পদে-বিপদে, ঐশ্বর্যে-দারিদ্র্যে, রোগে-স্বাস্থ্যে—যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে"—এই কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার মতো অপর কেহই ঐ কথাগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বারংবার তিনি ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করাইলেন এবং বলিলেন, "আহা, কি অপূর্ব ধর্মভাবের কথা! কি ন্যায়পূর্ণ কথা!"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর গৃহে এই সময়ে প্রায় সর্বদা যে সকল মহিলা বাস করিতেন—গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা সকলেই বিধবা ; গোপালের মা এবং লক্ষ্মীদিদি আবার বালবিধবা ছিলেন ; ইঁহারা সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা—যে সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে বাস করিতেন —সেই সময়ের। লক্ষ্মীদিদি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতই তিনি বিশেষ গুণসম্পন্না, এবং কথাবার্তার দ্বারা অপরকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কখনও তিনি কোন যাত্রার পালা হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধর্মভাবপূর্ণ কথোপকথন আবৃত্তি করেন, কখনও বা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নকল করিয়া নীরব কক্ষ হাস্যমুখরিত করিয়া তোলেন। একবার হয়তো কালীমূর্তি ধারণ করিলেন, পরক্ষণেই সরস্বতীমূর্তি, কখনও বা জগদ্ধাত্রী, আবার হয়তো বা

কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি—এবং নাটকীয় উপাদানের স্বল্পতা সত্ত্বেও ঐ সকলের দ্বারা বেশ আসর জমাইয়া তুলিতেন।

শুনা যায়, এই প্রকার আমোদ-প্রমোদ শ্রীরামকৃষ্ণেরও অনুমোদিত ছিল। স্ত্রীভক্তগণের নিকট শুনিয়াছি, তিনি নিজেই ধর্মমূলক কোন নাটক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, পর্যায়ক্রমে নাটকের প্রত্যেক পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া কাব্যনিহিত স্তব ও পূজার গূঢ় মর্ম সমবেত সকলকে হৃদয়ঙ্গম করাইতেন।

গোপালের মা ছিলেন অতি বৃদ্ধা। পনের-কুড়ি বৎসর পূর্বে যখন তিনি তাঁহার কামারহাটির গঙ্গাতীরে অবস্থিত কুটির হইতে একদিন মধ্যাহ্নে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিতে আসেন, তখনই তিনি বার্ধক্যে উপনীত। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কক্ষের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন—যেন তিনি তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপালের মা বালগোপাল মূর্তির উপাসনা করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপবর্তী হইবামাত্র তাঁহার মধ্যে তিনি নিজের ইষ্টমূর্তি দর্শন করেন। এই বিষয়ে সর্বদা, তাঁহার কি অপরিসীম নিষ্ঠাই ছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহার পর গোপালের মা তাঁহার জীবিতকালে কদাপি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর উল্লেখকালে 'বউমা' ছাড়া তাঁহাকে অপর শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনি নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার স্ত্রীভক্তগণের সঙ্গে আমি যে কয়মাস অতিবাহিত করি, তাহার মধ্যে গোপালের মা কখনও কলিকাতায় অবস্থান করিতেন, কখনও বা কয়েক সপ্তাহ কামারহাটিতেই কাটাইতেন। এক পূর্ণিমা রজনীতে আমরা কয়েকজন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। ক্ষুদ্র নৌকাখানি যখন ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন গঙ্গাবক্ষে কি অপূর্ব শোভা! জলের মধ্য হইতে যে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে, এবং উচ্চ স্থানের ঘাট, শষ্পাবৃত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণের বারান্দা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,তাহারই বা কি সুন্দর শোভা! বারান্দার এক প্রান্তে গোপালের মার ক্ষুদ্র কক্ষ সম্ভবতঃ পার্শ্বে অবস্থিত বৃহৎ অট্টালিকার কোন কর্মচারীর জন্য প্রথমতঃ নির্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কক্ষে গোপালের মা জপে মগ্ন থাকিয়া বহু বর্ষ কাটাইয়াছেন। বৃহৎ অট্টালিকা এখন জনশূন্য। গোপালের মার ছোট ঘরটিতে আসবাবপত্রের কোন বালাই নাই। ঘরের পাথরের মেঝেই তাঁহার শয্যা। অতিথিদের বসিতে দিবার জন্য যে মাদুর পাতিয়া দিলেন, তাহা তাকের উপর গুটানো ছিল। শিকায় ঝুলানো মাটির পাত্র হইতে মুড়ি ও বাতাসা পাড়িয়া খাইতে দিলেন।

অতিথিদের সংবর্ধনা করিতে উহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। কিন্তু জায়গাটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার ; তিনি নিজেই কষ্ট করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া সর্বদা ধুইয়া রাখেন। হাতের কাছে কুলুঙ্গীতে একখানি অতি পুরাতন রামায়ণ, তাঁহার বৃহৎ জীর্ণ চশমা ও হরিনামের ঝুলি। এই মালা জপ করিয়াই গোপালের মা সিদ্ধিলাভ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, কত দীর্ঘ বৎসর তিনি দিবারাত্র ঐ মালা জপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

শুভ্র চন্দ্রালোকে বাহিরের নানাবিধ বৃক্ষ ও পুষ্পরাজিকে মনে হইতেছিল কাল কাল ছায়া মূর্তি—যেন শ্বেত মর্মরের স্বপ্নরাজ্যে তাহারা ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছে ও অস্ফুট স্বরে কথা বলিতেছে। কিন্তু আমাদের সদা কর্মব্যস্ত ও চঞ্চল জগতের মধ্যে গোপালের মার এই শান্ত, নীরব ক্ষুদ্র কক্ষটির চিন্তার ন্যায় আর কিছুই যেন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে না। ঐ স্থানটি আমরা দর্শন করিয়া আসিয়াছি শুনিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আহা! তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ, উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপাসনা ও রাত্রিজাগরণ—সে ভারত চলে যাচ্ছে, আর কখনো ফিরে আসবে না।"

কলিকাতার বাড়িতে একজন ইউরোপীয় মহিলার অবস্থানে সম্ভবতঃ অপরের অপেক্ষা গোপালের মার আশী বৎসরের সংস্কারে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু একবার ঐ ভাবটিকে জয় করিবার পর তিনি যেন উদারতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। রক্ষণশীল তিনি বরাবর ছিলেন, কিন্তু কখনও জেদ করিয়া কুসংস্কার ধরিয়া থাকিতেন না। আমাদের প্রতিদিন যে ভাবে কাটিত, তাহাতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত তাঁহার আশ্রম ও মাতাঠাকুরানীর গৃহে পূজা অর্চনা প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য তিনি বোধ করিতেন না। দিনগুলি ছিল শান্তি ও মাধুর্যে পূর্ণ। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই সকলে নীরবে শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং মাদুর হইতে চাদর ও বালিশ সরাইয়া রাখিয়া মালা হস্তে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া জপে বসিতেন। অতঃপর ঘর ঝাঁট দেওয়া ও স্নান আরম্ভ। বিশেষ বিশেষ দিনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও অপর একজন পালকি করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন, এবং তাহার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণপাঠে সময় অতিবাহিত হইত।

তারপর শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরে পূজায় বসিতেন। অল্পবয়স্কা মেয়েরা দীপ জ্বালা, ধূপ-ধুনা দেওয়া, গঙ্গাজল আনা, এবং পুষ্প, নৈবেদ্য সাজানো প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এমনকি, গোপালের মা পর্যন্ত এই সময়ে ফলমূল ও তরকারি কাটিয়া সাহায্য করিতেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর অপরাহ্ণে বিশ্রাম। তারপর সন্ধ্যা হইবামাত্র

ঝি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গল্পগুজব থামিয়া যাইত। সকলেই উঠিয়া পড়িতেন, এবং দেবমূর্তি অথবা পটের সামনে প্রণাম করিয়া গোপালের মা ও শ্রীশ্রীমার পাদবন্দনা করিতেন। অথবা ছাদে যেখানে তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে যাইতেন। আর যিনি কন্যার ন্যায় শ্রীশ্রীমার সান্ধ্যধ্যানকালে পার্শ্বে বসিবার অনুমতি লাভ করিয়া তাঁহার গুরুপ্রণাম শ্রবণ করিতেন, তিনি সত্যই পরম ভাগ্যবতী! শ্রীশ্রীমার প্রতি পূজার প্রথমে ও অন্তে এই গুরুপ্রণাম থাকিত।

ভারতের পরিবারমাত্রই যেন সর্বদা প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মনোহর স্তোত্রগানে রত। তাহার নিকট গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি তুচ্ছ কর্ম, বিস্তৃত প্রণালী, দৈহিক শুচিতার অভ্যাস যেন অনির্বচনীয় মূল্যবান ও পবিত্র; জাতির চিরন্তন সম্পদ, সুদূর অতীত হইতে পুরুষানুক্রমে অর্পিত, নিখুঁত অবস্থায় রক্ষা করিয়া উহাকে ভাবী যুগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। আদর্শ পবিত্রতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মাতৃপূজার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া এই চিন্তাপ্রণালী সমগ্র ভারতীয় চরিত্রের একাধারে পরিচালনা ও সংযত করার শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাচ্য দেশ সরলতার উপাসক—এবং এই কারণেই কোন ইতরজনোচিত ভাব প্রাচ্য জাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে না।

কিন্তু ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে এই ধরনের রহস্য কেহই আবিষ্কার করিতে পারে না; তাহার সহজ কারণ হইল, নিজের মনের পরিধির যথেষ্ট বাহিরে নিজেকে লইয়া যাইবার অক্ষমতা, যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, কেবল যে পৃথক পৃথক সংস্কার লইয়া অন্যেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ঐ সকল সংস্কারের মূল্য সম্পর্কে তাহাদের জন্মগত পৃথক ধারণাও আছে। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে পরস্পরবিরোধী ভাবের প্রকাশ ঘটিত, সেগুলি লইয়া মাথা ঘামাইয়া অবশেষে আমি এই তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হই, এবং ফলে বহু জিনিস আমার নিকট স্বচ্ছ হইয়া যায়। অন্যের অপেক্ষা তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন যে, চরিত্রই সব, অথবা তাঁহার ভাষায় "দেশাচার কিছুই নয়।" তথাপি যেসব আচার-ব্যবহারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া কেহই তাঁহার ন্যায় আত্মহারা হইয়া যাইত না। স্বদেশবাসীর আচার-ব্যবহার তিনি কবির দৃষ্টিতে ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কল্পনা-সহায়ে দেখিতেন। যে সকল জাতির নারীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত, তাহাদের মধ্যেও আদর্শ নারীচরিত্র ও নিষ্ঠার পরিচয় বিদ্যমান, এবং পাশ্চাত্য দেশের সান্ধ্য পরিচ্ছদেও যথেষ্ট রুচি ও

লজ্জাশীলতার চিহ্ন দেখিয়াই তিনি উপলব্ধি করেন যে, "দেশাচার কিছুই নয়।" কিন্তু এই সব দেখিয়াও স্বদেশের লোকাচার বা অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হ্রাস পায় নাই। বিধবার নিরাভরণ শ্বেত অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহার নিকট শোক এবং সেই সঙ্গে পবিত্রতার চিহ্ন। সন্ন্যাসীর কৌপীন-বহির্বাস, মেঝের উপরে মাদুরের শয্যা, থালার পরিবর্তে কলাপাতায় ভোজন, হাত দিয়া আহার এবং জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান—এ সবই তাঁহার নিকট যথার্থ মহাপবিত্র বলিয়া বোধ হইত। ইহাদের প্রত্যেকটি তাঁহার নিকট কোন আধ্যাত্মিক শক্তি অথবা মানব হৃদয়ের কোমল ভাবের রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিত। তাঁহার কথায় এইগুলির প্রতি এরূপ নিষ্ঠা ও আনুগত্য প্রকাশ পাইত যে, মনে হইত, সম্ভব হইলে তিনি সমগ্র জগৎ জয় করিয়া উহাদের পদানত করিয়া দিতে প্রস্তুত, এবং ব্যর্থ হইলে ভাবিতেন, তাহাদের পরাজয়ে অংশ গ্রহণের মধ্যেই ইহজীবনের স্বর্গসুখ নিহিত।

আমাকেও তিনি এই মধুর সঙ্গীত গাহিতে শিখাইয়াছিলেন ; সত্য বটে, ক্ষীণ ও কম্পিতকণ্ঠে—তথাপি এই মহান সঙ্গীতের অপরাপর গায়কগণের সহিত কতকটা একসুরে। গাহিতে গাহিতে ঐ সঙ্গীতের মাধ্যমে আমি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিতে শিখিলাম, কেমন করিয়া একটি জাতির আদর্শ ও হৃদয় রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুন পর্যন্ত কয়েকটি মাস বেশ আনন্দে পূর্ণ ছিল। আমার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি আরম্ভ হয় কালীপূজার দিন। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী করিলেন ; গোলাপ-মা স্পষ্ট করিয়া উহা সমবেত সকলকে শুনাইয়া দিলেন, "শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।" কেন জানি না, শ্রীশ্রীমায়ের উচ্চ মন ও হৃদয়ে এই আরব্ধ কার্যের বিষয় বর্তমান আছে, এবং তিনি ইহার কল্যাণ কামনা করিতেছেন, এইটুকু জানাই আমার নিকট আশীর্বাদস্বরূপ, এবং হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।

সাধারণতঃ স্বামীজী কলিকাতার বাহিরে তিন-চার মাইল দূরে গঙ্গার অপর তীরে অবস্থিত মঠে বাস করিতেন। কিন্তু প্রায়ই তিনি কলিকাতায় আসিতেন এবং প্রত্যেকবারই মধ্যাহ্নে অথবা সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য আমাকে

ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার প্রতি যাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের তিনি সর্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অতি সামান্য কার্যও অর্থপূর্ণ ছিল, যাহা নূতন লোকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। একদিন যখন তিনি আমাকে কোন একটি পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে বলেন, আমি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, ঐ অনুরোধের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। পরে যখন শুনিলাম, তাঁহার নিকট ঐ পথ্য লইয়া গেলে তিনি উহার সামান্য অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাকিটা উপস্থিত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তখন প্রকৃতই নিরাশ হইয়াছিলাম। এই কার্যের মধ্যে যে ধর্মানুষ্ঠানের একটা তাৎপর্য আছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কী গভীর চিন্তা ও অনুকম্পার সহিত তিনি এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া স্বয়ং শ্রীশ্রীমাও সর্বদা আমাকে হিন্দুসমাজে (আমি তো একজন বিদেশী) আশ্রয় দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা অনুধাবন করিতে আমার অনেক মাস লাগিয়াছিল। কাশ্মীরে তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁহার সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য "খ্রীস্টীয় ও ইসলাম ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মকে সক্রিয় এবং অপরের উপর প্রভাবশালী করা" আর যে সকল উপায় অবলম্বনে তিনি ঐ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন, এইটি তাহার অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের তিনি যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেন, তাহাতেও ঐ উদ্দেশ্যই প্রকাশ পাইয়াছে—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির আদান-প্রদান ঘটানো ও ঐগুলি কার্যে পরিণত করা।" এই সংজ্ঞার পূর্ণতা ও ভারতের বর্তমান অবস্থায় উহার বিশেষ উপযোগিতা সময়ের সঙ্গে ক্রমশঃ বুঝা যাইতেছে। নিজস্ব মতবাদ লইয়া নিশ্চল থাকিলে চলিবে না; হিন্দুধর্মকে উহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, সমগ্র আধুনিক উন্নতিকে আলিঙ্গন ও সাদরে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার মধ্যে বিদ্যমান—ইহাই ছিল তাঁহার মনোভাব। হিন্দুধর্ম কতকগুলি বিভক্ত সম্প্রদায়ের সমষ্টিমাত্র নহে, পরন্তু এক অখণ্ড, সজীব এবং সকল ধর্মের মাতৃস্থানীয়; হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত সকল সম্প্রদায়কেই সে মাতার ন্যায় স্বীকার করিয়া লয়, কোন নূতন ধর্ম সম্পর্কে হিন্দুধর্ম নির্ভীক, যেখানেই হউক, সকল সন্তানের ভালবাসা লাভ করিবার জন্য উন্মুখ, প্রাজ্ঞ, অনুকম্পায় পূর্ণ, স্বপরিচালিত, সতত ক্ষমাশীলা এবং সকল প্রকার বিরোধ দূর করিয়া পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তৎপর। সর্বোপরি, তাহার নিজের নির্দিষ্ট উপলব্ধি আছে এবং জগতের অন্যান্য জাতির নিকট প্রচার করিবার জন্য তাহার একটি বিশেষ বার্তাও আছে। কিন্তু হিন্দুধর্মকে এইরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্বামীজী চারিত্রিক বল ব্যতীত অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করিতেন না। একথা সত্য, তাঁহার নিজস্ব

ধর্মমতরূপ মন্দির নির্মাণ করিয়া তোলাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু উহার জন্য অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে, এবং জগতের স্বাভাবিক গতিও মনে হয় অনুকূল। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের দায়িত্ব কেবল সুদৃঢ় ইষ্টক নির্বাচন। যাহারা নির্বাচিত হইত, তাহাদের তিনি বুদ্ধি, আকর্ষণ শক্তি অথবা শক্তির পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্বাচন করিতেন না; তাঁহার দৃষ্টি থাকিত একমাত্র সরল আন্তরিকতার প্রতি। একবার গ্রহণ করিবার পর তাহাদের সামনে তিনি একই আদর্শ স্থাপন করিতেন—মুক্তি নহে, ত্যাগ; আত্মানুভূতি নহে, আত্মত্যাগ। আবার ইহাও যেন অনেকটা মানুষের পক্ষ হইতে—ভগবানের নিকট নিবেদন নহে। তাঁহার শিষ্যদের নিকট তিনি দৃঢ়ভাবে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করিতেন। শিষ্যগণের মধ্যে একজন যেন কদাপি মঠে একদিনের পুণ্য অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত না হন। সেদিন তাঁহার জীবনের প্রথম উন্মেষরূপেই যেন স্বামীজী তাঁহাকে শিবপূজা করাইতে শিখান। অতঃপর ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক শুভ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। একজনকে লক্ষ্য করিয়া, তিনি যেন তাঁহার নিকট যে-কেহ উপদেশ লইতে আসিবে, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিপূজা ও স্বামীজী

স্বামীজীর জীবনের এই অংশের যে পরিচয় আমি কিছুটা লাভ করিয়াছি, তাঁহার শক্তিপূজার উল্লেখ ব্যতীত উহার বিবরণ নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমি সর্বদা অনুভব করিয়াছি, তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে দ্বিবিধ উপাদান ছিল। নিঃসন্দেহ, তিনি ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বারবার উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি আট বৎসরের বালক মাত্র, খেলা করিতে বসিয়াই তাঁহার মধ্যে সমাধিতে মগ্ন হইবার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দার্শনিক ভাবাপন্ন;

সাধারণতঃ 'পৌত্তলিক' বলিয়া অভিহিত ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। যৌবনে, এবং খুব সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইবার কিছুকাল পরে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যথারীতি সদস্য হন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি এমন কিছু প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না, যাহা কোন বিশেষ মূর্তি বা সাকার ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিকট ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, অদ্বৈতদর্শন সর্বোত্তম মতবাদ, এবং বেদ ও উপনিষদ্ একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

কিন্তু ইহাও সত্য, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে জগন্মাতাবোধক 'মা' শব্দ সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। আমরা যেমন পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত পরিচিত কাহারও সম্পর্কে কথা বলিয়া থাকি, জগন্মাতাকে তিনি ঠিক সেইভাবে উল্লেখ করিতেন। সর্বদা তিনি জগন্মাতার চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন। জগন্মাতার অপর সন্তানগণের ন্যায় তিনি সব সময়ে শান্তশিষ্ট ছিলেন না। কখন কখনও দুষ্ট ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন, কিন্তু সকল সময়ে তাঁহারই অনুগত। শুভ অশুভ যাহাই ঘটুক সকলই জগন্মাতার ইচ্ছায়, অপর কাহাকেও তিনি দায়ী করিতেন না। কোন এক ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে একটি মাতৃ-প্রার্থনা শিখাইয়া দেন, ঐ প্রার্থনা তাঁহার নিজের জীবনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিয়াছিল। তারপরে সহসা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে শিষ্যের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর দেখ, শুধু প্রার্থনা করা নয়, তাঁকে জোর করে ওটা পূরণ করাতে হবে। মায়ের কাছে ও-সব দীন-হীন ভাব চলবে না।" মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিনি হঠাৎ কোন নূতন বর্ণনার আংশিক অবতারণা করিতেন। মায়ের দক্ষিণ হস্ত বরাভয় প্রদানের জন্য উত্তোলিত, বামহস্তে ধৃত খড়্গ। তন্ময়ভাবে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে করিতে সহসা তিনি বলিয়া উঠিতেন, "তাঁর শাপই বর।" অথবা ভাবাবেগে কখনও কবির ভাষায় বলিতেন, "অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়কন্দরে মায়ের রুধিররঞ্জিত অসি ঝক্‌মক্ করে। এঁরা আজন্ম মায়ের অসি-মুণ্ড বরাভয়করা মূর্তির উপাসক!" এই সময়ে আমি 'জগন্মাতার বাণী' ('Voice of the Mother') নাম দিয়া যে ক্ষুদ্র স্তোত্রটি রচনা ও প্রকাশ করি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি ছত্র ও বর্ণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে এই সব মুহূর্তগুলিতে সংগৃহীত। তিনি সর্বদা বলিতেন, "আমি ভয়ঙ্করা রূপের উপাসক!" একবার বলিয়াছিলেন, "এ-কথা মনে করা ভুল যে, সকলেই সুখের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বহুলোক আছে যারা জন্মাবধি দুঃখকে খুঁজে বেড়ায়। এস, আমরা ভয়ঙ্করা মায়ের জন্যই তাঁর ভয়ঙ্করা মূর্তির উপাসনা করি।"

কোন কিছু লইয়া খুঁতখুঁত করার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। মন্দিরে পশুবলি সম্পর্কে অভিযোগ লইয়া একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন, আমাদের অনেকেই বলিদানের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইলেও নিজেদের রসনার পরিতৃপ্তির জন্য পশুহত্যায় বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করি না। কিন্তু তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন না। আধুনিক প্রথায় কসাই ও কসাইখানার যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, যুক্তি দ্বারা তিনি তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারও উল্লেখ করিলেন না। আমার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির উত্তরে তিনি শুধু স্পষ্টভাবে বলিলেন, "চিত্রটি নিখুঁত করবার জন্য হলোই বা একটু রক্তপাত!" পরে তাঁহার এবং নিকটে উপবিষ্ট আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের নিকট হইতে উচ্চাঙ্গের কালীপূজার প্রকৃত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। প্রকৃত কালীপূজা বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং সেখানে জীবহিংসার স্থান নাই। যাহা হউক, তিনি বলেন, মা-কালীর অনুচর ভূতপ্রেতগণের উদ্দেশ্যে বলিদান বা রক্তপাত তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। তাঁহার মতে উহা ভূতোপাসনা এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার আদৌ সমর্থন নাই। তাঁহার নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল, অন্তর হইতে ভয় ও দুর্বলতা দূর করিয়া দিয়া যেমন মাধুর্য ও আনন্দের মধ্যে আপনা হইতেই জগজ্জননীব প্রকাশ দেখা যায়, সেইরূপ অশুভ, ভয়ঙ্কর, দুঃখ ও বিনাশের মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ ধারণা করিতে শেখা। সুতরাং সেই মহান আদর্শকে ছোট করিয়া দেওয়া তিনি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন ভয়ঙ্করা মূর্তির পূজা এবং উহার সহিত একাত্মতালাভের প্রসঙ্গে শান্তভাবে কথা বলিতে বলিতে তিনি সহসা উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠেন, "'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী'। মূর্খ তারা!" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতরূপে প্রকাশিত যে ঈশ্বর, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া যে ঈশ্বর দয়াময়, যিনি পালনকর্তা, শোকে-দুঃখে যাঁহার নিকট সান্ত্বনালাভ করা যায়, তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত যে পূজা, তাহার মূলে অহংজ্ঞানই বিদ্যমান। বুঝিতে পারিলেন, এই ধরনের পূজা হিন্দুরা যাহাকে প্রকৃতপক্ষে 'দোকানদারি' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপলব্ধি করিলেন, মঙ্গলের মধ্যে তাঁহার যেরূপ প্রকাশ, অমঙ্গলের মধ্যেও সেইরূপ, এবং এই শিক্ষা পূর্বোক্ত শিক্ষা অপেক্ষা বহুগুণ নির্ভীক ও সত্য। দেখিলাম, কাঁচা আমির গণ্ডি অতিক্রম করিতে হইলে যে মনোভাব ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, তাহা বস্তুতঃ দৃঢ়সঙ্কল্প, স্বামীজী কঠোর ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন,

'জীবন না চাহিয়া মৃত্যুকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, নিজেকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে হইবে, চিরকালের জন্য ভয়ঙ্করা মূর্তির সহিত একাত্ম হইতে হইবে।'

নিজের ধারণাগুলি স্বামীজী কখনও শিষ্যদের উপর জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করিতেন না, কারণ উহা দ্বারা স্বাধীনতা বলিতে তাঁহার যে আদর্শ বা ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করা হইত। কিন্তু শিক্ষকরূপে আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলাম যে, আমাকে ভারতীয়ভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। ঐ ভাবধারায় ভারতের বিভিন্ন উপাসনা প্রণালীর বিশিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া আমি কতখানি বিস্ময়বিমূঢ় বোধ করিয়াছিলাম, তাহা অমরনাথ যাত্রার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিয়া উহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উহা কদাপি ভুলিবার নহে। সুতরাং যে ভাবে কোন ব্যক্তি কোন নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, অথবা সম্ভবপর হইলে ইচ্ছাপূর্বক কোন নূতন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, সেইভাবে আমি কালীপূজার রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই চেষ্টার ফলেই আমি স্বামীজীর জীবন ও চিন্তাধারা কতকটা বুঝিতে সক্ষম হই। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম। বলা বাহুল্য,ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে স্বামীজী নিজে ছিলেন আজন্ম শিক্ষক, যদিও তিনি নিজে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। যে চিন্তা নির্দিষ্ট রূপ লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে তিনি কখনও বাধা দিতেন না। একদিন তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময়ে ঐ স্থানে একখানি কালী প্রতিমা আনীত হয়। প্রতিমার মধ্যে কোন একটি ভাব চকিতের মতো লক্ষ্য করিয়া আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম, "স্বামীজী, হয়তো মা-কালী সদাশিবেরই ধ্যানযোগে উপলব্ধ মূর্তিবিশেষ। তাই কি ?" তিনি মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চাহিলেন। পরে সস্নেহে বলিলেন, " বেশ, তাই হোক, তোমার নিজের ভাবেই ওটি প্রকাশ কর !"

আর একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রবীণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার জোড়াসাঁকোর নির্জন বাড়িতে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পূর্বরাত্রে একজনের জীবনের অন্তিমকালের দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করি। যাত্রার পূর্বে স্বামীজী আমাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে আমি সাগ্রহে বলি, "আমার হঠাৎ উপলব্ধি হইয়াছে, বিভিন্ন ধর্ম যেন বিভিন্ন ভাষা, আর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত তাহার নিজের ভাষাতেই কথা বলা উচিত।" তাঁহার সমগ্র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই এ কথা শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

একমাত্র তিনিই সাহস করে বলে গেছেন যে, আমাদের সকল লোকের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা বলা উচিত।"

তথাপি এমন একদিন আসিল, যখন তিনি শক্তিপূজা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। আমার কালীঘাটে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। তিনি আমাকে জানাইলেন, আমার বিদেশীয় বন্ধুগণ যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলে অন্য শ্রোতাদের মতো তাঁহাদিগকেও জুতা খুলিয়া যাইতে হইবে এবং মেঝের উপর বসিতে হইবে। সেই মহাপীঠে কাহারও জন্য যেন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে। আমার উপরেই এই বিষয়টি দেখিবার ভার রহিল।[১]

এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইবার পূর্বে তিনি আরও কিছুক্ষণ রহিয়া গেলেন। তারপর যেন একটু অনিচ্ছুকভাবে কর্ণেল হে-র রক্ষাকারী দেবগণ (Guardian Angels) নামক কবিতার উল্লেখপূর্বক বলিলেন, "ব্রহ্ম ও দেবদেবীগণ সম্পর্কে আমারও ঠিক ঐ মত। ব্রহ্ম ও দেবদেবীগণেই আমি বিশ্বাস করি। অন্য কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই।"

স্পষ্টই বুঝা গেল, তাঁহার আশঙ্কা তাঁহার নিজের যেরূপ অসুবিধা হইয়াছিল, আমারও যুক্তির দ্বারা বুঝিতে গেলে সেইরূপ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা—কোন এক বিশেষ অঙ্গের পূজাকে সর্বোচ্চ জানিয়া তাহার গুণগান, এবং বেদান্তের চরম ব্রহ্মবাদ এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এক সমস্যা, এবং যুক্তি সহায়ে উহার সমাধান কঠিন। স্বামীজী জানিতেন না, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট তিনি স্বয়ং ছিলেন এই-সকল বিপরীতলক্ষণ বিশিষ্ট ধর্মের সমন্বয়স্থল, এবং তাহাদের প্রত্যেকটি যে সত্য তাহার সাক্ষিস্বরূপ। সুতরাং ঐ বিষয়টি চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন কিছুক্ষণ আপন মনেই কথা বলিতে লাগিলেন; কতকটা অসংলগ্ন, যেন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, নিজের মতটি সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি যেন নিজের অন্তরে কিছু দেখিয়া তাহাতেই অর্ধমগ্ন, চেষ্টা করিয়াও উহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না।

অবশেষে বলিলেন, "ওঃ! মা-কালী ও তাঁর লীলাকে আমি কি ঘৃণাই করেছি! ছ-বছর ধরে ঐ নিয়ে সংগ্রাম করেছি, কিছুতেই তাঁকে মানব না। শেষে কিন্তু আমাকে মানতেই হলো! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন,

---

১ কোথাও কোন দেবস্থানেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি নিজের দেবস্থানের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, সে সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র।

আর এখন আমি বিশ্বাস করি, অতি সামান্য কাজেও সেই মা আমাকে পরিচালনা করছেন, আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করছেন !...বহুদিন তাঁকে মানব না বলে আমি জেদ করেছিলাম। ঠাকুরকে ভালবাসতুম কি না, তাই ছাড়তে পারিনি। তাঁর অদ্ভুত পবিত্রতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর অসাধারণ ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি। তিনি কত বড় ছিলেন, তখন তা আমার ধারণা হয়নি।...সে সব পরে হয়–যখন আমি বশ্যতা স্বীকার করি। সে সময়ে আমি তাঁকে এক উদ্‌ভ্রান্ত-মস্তিষ্ক শিশু বলে মনে করতাম—সব সময়ে বাজে খেয়াল দেখছেন ! ও-সব আমি ঘৃণা করতাম ! কিন্তু শেষে আমাকেও মা-কালীকে মানতে হলো !

"কেন আমাকে মানতে হলো, তা অত্যন্ত গুহ্য ব্যাপার, জীবনে কাউকে তা আমি বলব না। তখন আমার অতি দুঃসময়।...মা সুবিধা পেলেন, আমাকে গোলাম করে ফেললেন। ঠাকুরের নিজের মুখের কথা, 'তুই মায়ের গোলাম হবি।' রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে মায়ের হাতে সমর্পণ করলেন। ...আশ্চর্য ! ঐ ঘটনার পর তিনি মাত্র দুই বছর জীবিত ছিলেন, অধিকাংশ সময় আবার অসুখে ভুগছিলেন। ছ-মাস যেতে না যেতেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো, সে প্রফুল্লতা কোথায় চলে গেল !

"জান, গুরু নানকেরও ঐ রকম হয়েছিল। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন, কে তাঁর সেই শিষ্য, যার মধ্যে তিনি নিজের শক্তির সঞ্চার করবেন ! নিজের পরিবারবর্গকে তিনি উপেক্ষা করে গেলেন—তাঁর সন্তানগণ যেন তাঁর কাছে কিছুই নয় ! অবশেষে সেই বালকের সন্ধান পেলেন, যাকে তিনি ঐ শক্তি গ্রহণের অধিকারী মনে করলেন ! তাকে ঐ শক্তি দান করে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পেরেছিলেন।

"তুমি মনে করছ, ভাবীযুগ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে মা-কালীরই অবতার বলবে ? হাঁ, আমারও মনে হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মা তাঁর নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

"দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও এমন এক মহাশক্তি আছেন, যিনি নিজেকে প্রকৃতি-সত্তা বলে মনে করেন। তাঁরই নাম কালী, তাঁরই নাম মা !...আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি।...কিন্তু এই রকমই সর্বদা হয় না কি ? শরীর মধ্যস্থিত অসংখ্য কোষ (cells) মিলিত হয়েই এক ব্যক্তি সৃষ্টি করে না কি ? এক নয়, বহু মস্তিষ্ককেন্দ্রই কি মনের অভিব্যক্তি ঘটায় না ? বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব—এই আর কি ! তবে ব্রহ্মের বেলায় অন্যরূপ হবে কেন ? ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ, তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনিই আবার দেবদেবীতে পরিণত !"

অনুরূপভাবে কাশ্মীর-তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই-সব দেবদেবী কেবল মন-গড়া জিনিস নয়! ভক্তেরা যে-সকল ঈশ্বরীয় রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই সব রূপই দেবদেবীর মূর্তি বলে গৃহীত হয়েছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও শোনা যায় যে, সমাধি হইতে উত্থিত হইবার পর কখন কখনও তাঁহার শরীর মন অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার সম্পর্কে বলিতেন, "রাম ও কৃষ্ণরূপে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনিই এখন (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরে আবির্ভূত।" তারপর প্রধান শিষ্যের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "কিন্তু, নরেন, তা বলে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উপলব্ধ সত্যসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমন্বয়সাধন লইয়া মহাপুরুষগণের মনে যে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু আভাস দেয়। একদিকে জগন্মাতা, অন্যদিকে ব্রহ্ম। বহুদিন পূর্বে স্বামীজীর নিকট শোনা তাঁহার কথাগুলি মনে পড়ে, "ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে দিয়ে দেখলে নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণরূপে প্রতিভাত হন।" প্রকৃতপক্ষে এই উভয় ভাবের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যায় কি না সন্দেহ! একই সময়ে দুইটি ধারণা সমভাবে সত্য হইতে পারে না। এ-কথা সহজেই বোঝা যায় যে, অনুভূতির ক্ষেত্রে অবশেষে হয় শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে হইবে, নতুবা ব্রহ্মই শক্তিতে পরিণত হইবে। উভয়ের মধ্যে একটিকে অপরের মধ্যে বিলীন হইতে হইবে। কোন্‌টি কাহার মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে সাধকের অদৃষ্ট ও পূর্বজন্মের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, পূর্বোক্ত কথাবার্তা আমার জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। সেইদিন হইতে স্বামীজীর সকল আচরণে আমি লক্ষ্য করিযা দেখিয়াছি, তিনি যেন অপর কাহারও নিকট দায়স্বরূপ প্রাপ্ত কোন বিশেষ কার্যভার বহন করিয়া আসিতেছেন। কালীমূর্তির ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন—মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ; যাহা পাঠ করিয়া মানব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে; পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া অবশেষে দেখে, উহাতে কিছুই নাই। আমার মনে হয় ইহাই চরম ব্যাখ্যা। ভারতের ভাবীযুগের বংশধরের একমাত্র উপাস্য হইবেন মা-কালী। তাঁহার নাম লইয়াই মাতৃভক্ত সন্তানগণ নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন। তথাপি সর্বশেষে তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সনাতন জ্ঞানের বিকাশ ঘটিবে, এবং প্রত্যেক মানব নিজ নিজ শুভ মুহূর্ত উদয় হইলে জানিতে পারিবে যে, সমগ্র জীবন ছিল এক স্বপ্নমাত্র।

গীতার সেই বেদতুল্য বাক্য কাহার স্মৃতিপথে না উদিত হয় ?—

"ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ, কর্মের আরম্ভমাত্র না করিয়া কোন ব্যক্তিই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না। শুধু কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি করতলগত হয় না। সেইরূপ আমরাও কি নিশ্চিতভাবে জানি না যে, এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া না যাইলে অন্তিমে সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটে না ? শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মে উপনীত হইতে হইবে—নূতন জীবন, নব নব জ্ঞান, বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, অদূর ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া অবশেষে আমরা সেই আত্মারূপী চিরধামে উপনীত হইব, যেখানে সব এক অখণ্ড সত্তারূপে বিরাজমান এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ। যে আচার্যশ্রেষ্ঠকে আমি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, তাঁহার জীবনের প্রতি যতই গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, ততই প্রতিদিন আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞতারূপ মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া যাইতেছিলেন, এবং অবশেষে শেষ শব্দটি পড়া হইয়া যাইবামাত্র শ্রান্ত শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। আর তখনই তাঁহার জ্ঞান হইল, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জীবন স্বপ্নমাত্র।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
অর্ধ পৃথিবী অতিক্রম

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ জুন স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এক জাহাজে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, এবং ৩১ জুলাই প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হই। কয়েক সপ্তাহ পরে স্বামীজী ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আমি সেখানে আর একবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করি। তাঁহার সহিত একই ভবনে অতিথিরূপে যে পাঁচ-ছয় সপ্তাহ এবং পর বৎসর (১৯০০ খ্রীস্টাব্দে) ব্রিটানিতে যে একপক্ষ কাল অতিবাহিত করি, তাহার পর আর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত একত্র

বাসের সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু আমি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাশ্চাত্যেই অবস্থান করি। অতঃপর যখন ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন যেন তাঁহার জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য, তাঁহার শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার জন্যই। এই দেড়মাসব্যাপী সমুদ্রযাত্রা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে করি। এই কালে স্বামীজীর সহিত মিশিবার যে-কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিতাম। অপর কাহারও সহিত একপ্রকার মিশিতাম না বলিলেই চলে। অবশিষ্ট সময় লেখা ও সূচীকর্মে কাটিত। এইরূপে দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার অপূর্ব চরিত্র ও মনের সংস্পর্শ লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। এ সম্পদের কি তুলনা হয়?

এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভাব ও গল্পের একটা অবিরাম স্রোত চলিয়াছিল। কেহই জানিত না, কখন সহসা স্বামীজীর উপলব্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং তাহার ফলে আমরা জ্বলন্ত ভাষায় নূতন নূতন সত্যের বর্ণনা শুনিতে পাইব। প্রথম দিন অপরাহ্ণে আমরা ভাগীরথীবক্ষে জাহাজে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছি, এমন সময়ে সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যত দিন যাচ্ছে, তত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৌরুষই (manliness) জীবনের সার বস্তু। এই আমার নূতন বার্তা। পাপ করবে, তাও যথার্থ 'মানুষে'র মতো কর। যদি দুষ্টই হতে হয়, তবে বড় রকমের দুষ্ট হও।" এই কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমি তাঁহাকে মনে করাইয়া দিই যে, ভারতে অপরাধীর সংখ্যা খুব অল্প। আমার দিকে ফিরিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে তিনি উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার দেশে যদি এর বিপরীত হতো! কারণ প্রকৃতপক্ষে এ ধর্মভীরুতা মৃত্যুর লক্ষণ!" শিবরাত্রির গল্প, পৃথ্বীরাজ, বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন, বুদ্ধ ও যশোধরার গল্প এবং অনুরূপ শত শত গল্প তিনি অবিরত বলিয়া যাইতেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, একই কাহিনী কদাপি দুইবার কেহ শোনে নাই। জাতিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা তো সর্বদাই ছিল; ইহা ব্যতীত ছিল অবিরত নানা চিন্তার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাস; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সম্পর্কে নানা কথা এবং সর্বোপরি দৃঢ়ভাবে আপামর জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন; কদাপি এই প্রসঙ্গে তিনি বিরত হইতেন না। যাহাদের সমর্থন করিবার কেহ নাই, সেই দুর্বল ব্যক্তি অথবা জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা অগ্রসর হইতেন, তাহাদের দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া অধিকতর দুর্বল করিয়া ফেলিতেন না, শতমুখে তাহাদের গুণ বর্ণনা করিতেন।

আমাদের গুরুর আর্বিভাব এবং তিরোভাব উভয়ই আজ অতীতের ঘটনা, কিন্তু যে অমূল্য স্মৃতিসম্ভার তিনি অন্তরঙ্গগণের হৃদয়ে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার এই বিশ্বমানবপ্রেম অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই।

একদিন কোন ইউরোপীয় নরমাংসভোজন কোন কোন জাতির মধ্যে নিত্যকার ব্যাপার, এই উক্তি করিলে, তিনি যে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা কখনও ভুলিবার নয়। ঐ ব্যক্তির সমস্ত বক্তব্য শুনিবার পর তিনি বলেন, "এটা সত্য নয়। ধর্মভাবের প্রেরণায় পূজা উপলক্ষে বলিদান অথবা যুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ, এই উভয় স্থল ব্যতীত কোন জাতি কোথাও নরমাংস আহার করে না। বুঝতে পারছ না, ওটা দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবদের রীতি নয় ?

"ঐ প্রকার কার্যের দ্বারা সামাজিক জীবনের মূলোচ্ছেদ করা হবে যে!" এই কথাগুলি যখন বলা হয়, তখন পর্যন্ত ক্রপটকিনের "পারস্পরিক সাহায্য (Mutual Aid)" সম্পর্কে মূল্যবান পুস্তকখানি বাহির হয় নাই। বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দেশ-কাল-অবস্থা অনুযায়ী বিচার করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা স্বামীজীকে এই প্রকার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

তিনি লোকের ধর্মপ্রবণতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। সহসা বলিয়া ওঠেন, "অধিকাংশ ধর্মের মূলে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। ভারতবর্ষে এই মত বৈষ্ণবধর্ম এবং পাশ্চাত্যে খ্রীস্টধর্ম রূপে অভিহিত। মৃত্যুকে, অথবা মা-কালীকে উপাসনা করতে অতি অল্প লোকেই সাহসী হয়েছে! এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। এস, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলেই আলিঙ্গন করি, তাঁকে কোমল হবার জন্য প্রার্থনা করে নয়। এস, আমরা দুঃখের জন্যই দুঃখকে বরণ করি।"

সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইবার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম, সমুদ্রকে কেন 'কালাপানি' (কালোজল) এবং নদীকে সাদাপানি বলা হয়। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন, সমুদ্রের প্রতি হিন্দুদের প্রগাঢ় ভক্তিই তাহাদের উহাকে লঙ্ঘন করিয়া অপবিত্র করিতে বাধা দিয়াছে এবং তাহার ফলেই বহু শতাব্দী ধরিয়া সমুদ্রযাত্রাকে জাতিচ্যুত হইবার অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। জাহাজ নদীর সীমা অতিক্রম করিয়া প্রথম সাগর স্পর্শ করিবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, "নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগবৈরাগ্যভূমি পরিত্যাগ করে ভোগৈশ্বর্যভূমিতে পদার্পণ করতে চললাম!"

বড় হইতে গেলে বহু দুঃখভোগ সহ্য করিতে হয়, এবং কাহারও কাহারও অদৃষ্ট এইরূপ যে, ইহজগতের সকল সুখই জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়—এই প্রসঙ্গ

উত্থাপন করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "সারা জীবনটাই দুঃখের বিনিময়ে অল্প সুখভোগ! এই কথাগুলি কখনও ভুলো না---মর্মান্তিক আঘাত পেলেই সিংহ ভীষণভাবে গর্জন করে ওঠে; মাথায় আঘাত পেলেই সাপ তার ফণা তুলে দাঁড়িয়ে ওঠে; তেমনি মানুষ নিদারুণ মর্মবেদনা পেলেই আত্মার বিপুল মহিমা প্রকাশ পায়।"

কখনও তিনি অসীম ধৈর্যসহকারে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, পরক্ষণেই ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কল্পনা-জল্পনায় মাতিয়া উঠিতেছেন। আবার বার বার তাঁহার মন বৌদ্ধযুগের প্রতি আকৃষ্ট হইত, কারণ ভারতীয় ইতিহাসের সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন বৌদ্ধযুগের সবিশেষ অধ্যয়ন।

একদিন তিনি বলেন, "বৌদ্ধধর্মের তিনটি যুগ-বিভাগ আছে—পাঁচ-শ বছর-তন্ত্রপ্রাধান্য। মনে করো না যে, ভারতে কোনকালে বৌদ্ধধর্ম নামে কোন পৃথক ধর্ম ছিল, এবং তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিত প্রভৃতি ছিল। মোটেই তা নয়! বৌদ্ধধর্ম চিরকাল হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত! কেবল এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব একাধিপত্য লাভ করার ফলে সমগ্র জাতি সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করেছিল।" বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে কাশ্মীরের নাগগণ (যে সকল মহাসর্প কুণ্ডের অভ্যন্তরে বাস করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল) বলপূর্বক দেবত্বপদবী হইতে বিচ্যুত হয়। পরবর্তী শীতকালে অত্যধিক শীত পড়ায় তাহারাই আবার বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ হিসাবে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া যায় কি না—এই বিষয় লইয়া স্বামীজী আলোচনা করিতেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ সোমলতার কথা আসিয়া পড়ে। স্বামীজী বর্ণনা করিতে লাগিলেন কিভাবে 'হিমালয়'-যুগের সহস্র বৎসর পর্যন্ত ঐ লতা ভারতের প্রতি গ্রামে প্রতি বৎসর রাজার ন্যায় অভ্যর্থনা লাভ করিত, এক নির্দিষ্ট দিনে গ্রামবাসিগণ সমবেতভাবে মহাসমারোহে উহাকে গ্রামের ভিতর লইয়া আসিত। আর এখন লোকে উহাকে চিনিতেও পারে না।

আবার তিনি শের শা সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন—যিনি হুমায়ুনের রাজত্বকালে ত্রিশবৎসর ধরিয়া এক বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন। "বাল্যকালে তিনি বাংলার পথে পথে দৌড়াদৌড়ি করিতেন"—এই কথা বলিবার সময় তিনি কিরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে। তিনি এই বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করেন যে, চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক নামক রাজপথ, ডাক

বিভাগের বন্দোবস্ত এবং সরকারী ব্যাঙ্কস্থাপন—প্রভৃতি শের শার কীর্তি। তারপর কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া তিনি গুরু গীতা হইতে আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

* * *

"গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

মনে মনে তিনি কোন একটি বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, যাহার সহিত শ্লোকের এই অংশগুলি সংশ্লিষ্ট ছিল। ক্ষণকাল পরে সহসা তাঁহার গভীর চিন্তাভঙ্গ হইল এবং তিনি বলিলেন, "হাঁ, বুদ্ধ ঠিকই বলেছেন। কার্যকারণসম্পর্কই সর্বপ্রকার কর্মের মূল। পৃথক ব্যক্তিগত সত্তা বলে যা আমরা দেখছি তা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক।" পরদিন প্রাতঃকালে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, আমার মনে হইতেছিল তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন, এমন সময়ে সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, " দেখ তো, এক জীবনের স্মৃতিই যেন মনে হয়, লক্ষ লক্ষ বছরের কারাবাস; আবার লোকে পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চায়! এই জন্মেরই ধাক্কা কে সামলায় তার ঠিক নেই, আবার অন্য জন্ম!"

একদিন সকালে চা খাইবার পূর্বে আমাকে ডেকের উপর দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, "এইমাত্র আমি তুরীয়ানন্দের সঙ্গে রক্ষণশীল ও উদারনীতিক ভাবসম্পর্কে কথা বলছিলাম।" তারপরই তিনি গভীর ভাবে ঐ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

"রক্ষণশীল ব্যক্তির একমাত্র আদর্শ বশ্যতাস্বীকার। তোমাদের আদর্শ সংগ্রাম। সুতরাং আমরাই জীবনকে উপভোগ করে থাকি, তোমরা কখনো তা পার না। তোমরা সর্বদা চেষ্টা করছ, আদর্শটা বদলে একটা নূতন কিছু করবার, আর ঐ পরিবর্তনের লক্ষভাগের একভাগ ঘটবার পূর্বেই তোমরা ইহলোক পরিত্যাগ কর। পাশ্চাত্যবাসীর আদর্শ—উন্নতির জন্য একটা কিছু কর; প্রাচ্যবাসীর আদর্শ—নির্বিবাদে সহ্য করে যাও। কিছু করা এবং সহ্য করে যাওয়া—এই উভয়ের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য-বিধান থাকলেই তা হবে সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন। কিন্তু তা হওয়া অসম্ভব।

"আমাদের ধর্ম মেনেই নেয় যে, মানুষের সব বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। জীবনে

অনেক অপ্রীতিকর জিনিসকে সংযত করতে হবে। এটা অপ্রীতিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু এর দ্বারাই শক্তি ও আলো পাওয়া যায়। উদারনীতিক ব্যক্তিগণ এর মন্দ দিকটাই দেখেন, এবং ভেঙেচুরে ফেলতে চান। কিন্তু পরিবর্তে তাঁরা যা প্রবর্তন করেন, তাও তেমনি মন্দ এবং ঠিক ভাল ফল পেতে গেলে পুরানো প্রথায় আমাদের যতদিন লেগেছিল, নূতন রীতিনীতির সাহায্যে অগ্রসর হলে ঠিক ততদিন সময় লাগবে।

"পরিবর্তনের দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বল বৃদ্ধি পায় না, বরং আরও দুর্বল ও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের সর্বদা সব জিনিস আত্মসাৎ করতে হবে—অর্থাৎ নিজের করে নিতে হবে। এর দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রবলতর হয়ে ওঠে। আর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে হোক, জগতে ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র জিনিস, আমরা যার আদর করে থাকি। সমগ্র জগতের দৃষ্টিতে সহমরণপ্রথা এত মহৎ কেন? তার কারণ ওর দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটে।

"আমাদের স্বার্থপরতা বিসর্জন দিতে শিখতে হবে। আমি দেখতে পাই, যখনই জীবনে আমি কোন ভুল করেছি, তার একমাত্র কারণ—তাতে স্বার্থগন্ধ মিশ্রিত ছিল। যেখানে স্বার্থের কোন সংস্রব নেই, সেখানে আমার বিচারবুদ্ধি ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁচেছে।

"এই স্বার্থ না থাকলে জগতে কোন ধর্মমতই থাকত না। মানুষ নিজের জন্য যদি কিছু না চাইত, তাহলে তুমি কি মনে কর, সে প্রার্থনা, পূজা, আরাধনা প্রভৃতি কখনো করত? কখনো না। ঈশ্বর সম্বন্ধে সে চিন্তাই করত না বললে হয়। হয়তো কদাচ কখনো কোন সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য অথবা অন্য কিছু দেখে একটু আধটু স্তুতিবাদ মাত্র করত। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ঐ রকম দৃষ্টিভঙ্গিই থাকা উচিত—কেবল গুণগান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আমরা নিঃস্বার্থ হতে পারলেই তা সম্ভব, নচেৎ নয়।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমরা মনে কর, লড়াই করাটা শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। এটা সম্পূর্ণ ভুল। অপরকে নিজের করে নেওয়াই প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ। এ ব্যাপারে হিন্দুধর্ম সিদ্ধহস্ত। আমরা কোনকালে যুদ্ধবিগ্রহের ধার ধারিনি। অবশ্য গৃহপরিজন রক্ষার জন্য কখনো কখনো উত্তম মধ্যম দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করার পক্ষপাতী আমরা কদাচ ছিলাম না। প্রত্যেককেই তা শিক্ষা করতে হতো। সুতরাং এই সব আগন্তুক জাতির দল আসুক! নিজের নিজের পথে চলুক! কালচক্রের আবর্তনে সকলেই শেষে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।"

তাঁহার মাতৃভূমি অথবা মাতৃস্বরূপা হিন্দুধর্মকে মহাপ্রভাবশালী ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তা করিতে পারিতেন না। কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করিতে

গিয়া বার বার তিনি স্বভাবগত খেয়ালী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এ-কথা সত্য। ভারতে কোন ইউরোপীয় পুরুষ অথবা নারীকে কিছু করতে গেলে, তাঁকে কালা ভারতবাসীর অধীনেই তা করতে হবে।"

সমগ্র জাতি হিসাবে ভারত কি মহাকার্য সাধন করিয়াছে, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করিতেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "দেখ, আমরা একটা জিনিস করেছি, যা অন্য কোন জাতি কখনো পারেনি। একটা সমগ্র জাতিকে আমরা দু-একটা ধারণার বশবর্তী করতে পেরেছি—যেমন গোমাংস বর্জন। কোন হিন্দু গোমাংস আহার করবে না। না, এটা ইউরোপীয়দের বিড়ালের মাংস আহার না করার মতো নয়, কারণ গোমাংস প্রাচীনকালে এদেশের খাদ্য ছিল।"

একদিন তাঁহার জনৈক প্রতিপক্ষের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিতেছিলাম, এবং আমি বলি যে, তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে তাঁহার দেশের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া অন্যায় করিতেছেন। স্বামীজী সানন্দে উত্তর দিলেন, "এটা এশিয়ার লক্ষণ, এবং চমৎকার জিনিস। কেবল ব্যাপারটা যথার্থভাবে ধারণা করবার মতো তাঁর মাথা নেই, এবং অপেক্ষা করবার ধৈর্যও নেই।" তারপরেই তিনি আপন মনে মা-কালীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন।

তিনি আবৃত্তি করিলেন—

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।

* * *

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলেই ভালবাসি, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলেই ভালবাসি। দুঃখদারিদ্র্যকে দুঃখস্বরূপ বলেই ভালবাসি। ক্রমাগত সংগ্রাম করে যাও ; প্রতিপদেই পরাজয়, ক্ষতি নেই। তবু সংগ্রাম কর। ঐটেই আদর্শ —ঐটেই আদর্শ।"

একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "শুধু মানবাত্মার নয়, সকল প্রাণীর আত্মার সমষ্টিই সগুণ ঈশ্বর। এই সমষ্টীভূত বিরাটের ইচ্ছাশক্তিকে কোন শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না। একেই আমরা নিয়ম বলে জানি। শিব, কালী ইত্যাদির অর্থও তাই।"

জগতের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যময় দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে ; কারণ, ঐ সকল স্থানে স্বামীজীর নিকট দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ ধরনের কথাবার্তা শ্রবণ করিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি।

আমরা যখন সিসিলি দ্বীপের নিকটবর্তী হইলাম, তখন সূর্য সবে অস্ত গিয়াছে, পশ্চিম গগনে অস্তমান সূর্যের শেষ রক্তচ্ছটা, এবং তাহারই সম্মুখে এটনা আগ্নেয়গিরি হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে। মেসিনা প্রণালীতে প্রবেশ করিবামাত্র চন্দ্রোদয় হইল। ডেকের উপর স্বামীজীর সহিত পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছি তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে, সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নহে, উহা পূর্ব হইতেই আমাদের মনের মধ্যে থাকে। একদিকে ইটালীর উপকূলের ধূসরবর্ণের বন্ধুর পাহাড়গুলি যেন ভ্রূকুটি করিতেছিল, অপরদিকে রজতকৌমুদীধারায় স্নাত সিসিলি উপদ্বীপ। স্বামীজী বলিলেন, "মেসিনা আমাকে ধন্যবাদ দেবেই, কারণ আমিই তাকে ঐ অতুল সৌন্দর্য দান করেছি।"

অতঃপর বাল্যকালেই তাঁহার মনে ভগবানলাভের জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, সেই সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তিনি একাসনে বসিয়া কোন একটি মন্ত্র উদয়াস্ত জপ করিতেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি তপস্যার অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রাচীন প্রথানুযায়ী পঞ্চতপার কথা বলিলেন, চারিপাশে চারিটি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মধ্যে সাধক উপবিষ্ট থাকেন, মাথার উপর অনলবর্ষী সূর্য—এই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন স্থির করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। অবশেষে তিনি এই বলিয়া শেষ করিলেন, "ভীষণের পূজা কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। আর সব মিথ্যা। সব চেষ্টা, সব সংগ্রাম বৃথা। এই হলো শেষ শিক্ষা। কিন্তু এ কাপুরুষের মৃত্যুকে ভালবাসা নয়, এ ভালবাসা দুর্বলের বা আত্মঘাতীর নয়। এ হলো শক্তিমান ব্যক্তির মৃত্যুকে সাদর সম্ভাষণ—যে অতলান্ত পর্যন্ত সব কিছু পরীক্ষা করে দেখেছে, এবং জানে যে, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
মহাপুরুষদর্শন-প্রসঙ্গে

স্বামীজী একদিন যে-সব মহাপুরুষকে তিনি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ করেন। সম্ভবতঃ নাগ মহাশয়ের কথা লইয়া ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা হয়। নাগ মহাশয় এই সময়ের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে (১৮৯৯ খ্রীঃ) বেলুড় মঠে স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসেন। স্বামীজী বহুবার বলিতেন, "নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এক অসাধারণ কীর্তি।" আমাদের নিকট স্বামীজী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করেন, কিভাবে তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের জন্ম ও ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া অন্নজল ত্যাগ করেন। স্বামীজী আমাকে আরও বলেন যে, নাগ মহাশয় একবার জ্বালানী কাঠের অভাবে নিজের ঘরের খুঁটি কাটিয়া অতিথির জন্য রন্ধনের কাঠ হিসাবে ব্যবহার করেন।

ইহার পরেই সম্ভবতঃ সেই যুবকের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভ করেন এবং তাঁহার পরে 'প্রিয়নাথ' শব্দ ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারিতেন না। ঐ ঘটনার পর তিনি দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মুখে অবিরত ভগবানকে ঐরূপে সম্বোধন ব্যতীত আর কিছু শোনা যাইত না। শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ এমন বহু ব্যক্তির কথা জানেন, যাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেবের জীবিতকালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তাঁহার কৃপাস্পর্শলাভে তৎক্ষণাৎ সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহুক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ব্যতীত ঐ সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কিছু কেহ জানিত না। এক মহিলা সম্পর্কে এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়াই বলেন, আদ্যাশক্তির অংশে তাঁহার জন্ম। জগন্মাতাজ্ঞানে তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধূপধুনা ও পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিবামাত্র ঐ মহিলা গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। হয়তো ইহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার সমাধি কিছুতেই ভঙ্গ হয় না দেখিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হন। দুই-তিন ঘণ্টা পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। শোনা যায়, সমাধি-অবস্থায় তাঁহার ভাবভঙ্গি মাতালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সব ভালভাবে মিটিয়া গেল দেখিয়া সকলে

আশ্বস্ত হয়, কারণ আশঙ্কা হইয়াছিল, হয়তো সমাধি-অবস্থা আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে তাঁহাব আত্মীয়স্বজনগণের (তাঁহারা যেখানেই থাকুন) চিন্তিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিবে। অতঃপর সকলে মিলিয়া কালীমন্দির হইতে অপরিচিত মহিলার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার নাম কি, বাড়ি কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। তিনিও আর কখনও আসেন নাই। সুলক্ষণা, সাধ্বী, পুত্রবৎসলা রমণীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করিবার পরিচায়কস্বরূপ এই মনোহর উপাখ্যানের মতো এই রমণীর স্মৃতি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নিকট চির সমাদৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেন নাই, "এই রমণীর আদ্যাশক্তির অংশে জন্ম !"

ধর্মকর্ম ব্যাপারে একপ্রকার অজ্ঞ ছিলাম বলিয়া আদ্যাশক্তির এই সব অপরিচিত সন্তানদের বিষয়ে আরও জানিবার জন্য মনে আগ্রহ বোধ করিতাম, যাঁহারা সুদূর নক্ষত্ররাজির ন্যায় নিজ নিজ কক্ষে বিদ্যমান থাকিয়াই দীপ্তি পাইবেন এবং আমাদের এই জগতে কদাপি প্রত্যাবর্তন করিবেন না। জানিতে ইচ্ছা করিত, তাঁহাদের সেই অনিন্দ্যসুন্দর জীবনেও হয়তো বা দূর অতীতের একদিনের সেই মহান অনুভূতির কথা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন ; হয়তো বা তাঁহাদের নিকট আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি ও তাঁহার কৃপাস্পর্শের কথা বহু অতীতের কোন ঘটনার মতো, অথবা স্বপ্নাবস্থায় শ্রুত কোন কোন গল্পের মতো স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকিবে—যেমন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদের আগমনের কথা যাহাদের সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল, তাহাদের স্মৃতি হইতে প্রায় লুপ্ত। ইহা সত্য কি না আমার জানিতে ইচ্ছা করিত। প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যাপারেই পারস্পরিক প্রভাব কাহার অধিক তাহা নির্ণয় করিতে চাহিতাম ; ঐ কালে আমার একেবারেই ধারণা হয় নাই যে, এইপ্রকার অভিজ্ঞতা হিন্দুগণের নিকট দৈনন্দিন ব্যাপার—হিন্দুমাত্রেই এ-সকল অনায়াসে বুঝিতে পারে। কিন্তু স্বামীজী আমার মনের এই আলো-আঁধার অবস্থার কথা অবহিত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে কৃপা করে কাউকে স্পর্শ করেছেন, এটা কি তামাসার কথা ? তাঁর কাছে যে-সব নরনারী আসত, তারা এই রকম ক্ষণকালের স্পর্শেই নূতন জীবন লাভ করেছে— এ কথা কি আবার বলে বোঝাতে হবে ?" অতঃপর তিনি এক এক করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন শিষ্যের জীবনের ঘটনাসমূহ বলিতে লাগিলেন। একজন ক্রমাগত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত এবং সত্যবস্তু ধারণার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিত। কিছুদিন পরে সহসা একদিন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বলেন, "এখন যাও, কিছু টাকাকড়ি উপার্জন কর, তারপর আবার এস !" ফলে সে ব্যক্তির জগতে আজ বেশ

পসার-প্রতিপত্তি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাহার সেই পূর্ব ভালবাসা এখনও তেমনি উজ্জ্বল। এই সকল ঘটনা বর্ণনাকালে স্বামীজী ঐ ব্যক্তির বা অপর কাহারও দোষত্রুটির বিন্দুমাত্র উল্লেখ করিতেন না। তাঁহার বর্ণনায় শ্রোতা ইহাদের প্রত্যেকের জীবনে যে সৎসাহস ও মহত্ত্ব কেবল তাহারই পরিচয় পাইতেন। প্রত্যেকেই জোর করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে কেন? কেবল তাহা নহে, অন্যান্য কর্মগুলি সমাপ্ত না হইলে তাহার সন্ন্যাসগ্রহণ কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু শেষকালে আর তাহার ভুল হইবে না। তখনই সে প্রকৃত কর্মত্যাগের বা সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হইবে।

মহাপুরুষগণ সম্বন্ধেও স্বামীজী অনুরূপভাবে আলোচনা করিতেন। যখন যাঁহার প্রসঙ্গ উঠিত, তখন তাঁহার সম্পর্কে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এরূপভাবে কথা বলিতেন যে, সেই সময়ের জন্য শ্রোতার মনে হইত, ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আর কেহ নাই। পওহারী বাবা সম্বন্ধে এত বিশদভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেন যে, অতঃপর ঐ বিষয়ে কোন অনিশ্চিত প্রশ্ন উত্থাপন করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইত। সেই মহাত্মার দেহত্যাগকালে যাঁহারা স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন, তাঁহার নিকট পওহারী বাবার স্থান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই; তাঁহারা আরও জানিতেন, পওহারী বাবার ভালবাসার ন্যায় আর কিছুই তাঁহার নিকট ঐরূপ মূল্যবান ছিল না।

তারপর ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি আরও দু-একজন মহাপুরুষ, যাঁহাদের তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় গল্প করিতে লাগিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে যখন স্বামীজী দেখেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। দেখিলে মনে হইত, একশত বৎসরের অধিক বয়স। তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কাশীতে এক শিবমন্দিরে পড়িয়া থাকিতেন—শিবলিঙ্গের উপর পা দিয়াই শুইয়া আছেন! হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে পাগল! কিন্তু দর্শকগণের মধ্যে কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে লিখিয়া দিতে বাধা ছিল না, এবং খেয়াল হইলে তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃতে লিখিয়া দিতেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামীজী যখন রঘুনাথদাসের আশ্রমে উপনীত হন, তখন দুইমাস হইল উক্ত মহাপুরুষের দেহত্যাগ হইয়াছে। প্রথমে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগে কার্য করিতেন, এবং শিবির-রক্ষক প্রহরীর কার্যে সৎ ও বিশ্বাসী কর্মচারী হিসাবে উপরিতন কর্মচারিগণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এইরূপে দিন যায়, এমন সময়ে একরাত্রে তিনি দেখিতে পাইলেন, একদল লোক রামনাম সঙ্কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছে।

উহা শুনিবার পর নিজ কর্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও "বোল রাজা রামচন্দ্রকী জয়!"—এই ধ্বনি শুনিবামাত্র তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। নিজের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকের পরিচ্ছদ ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি সঙ্কীর্তনে যোগ দিলেন।

কিছুকাল এইরূপে চলিবার পর অবশেষে কর্ণেল সাহেবের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ গেল। কর্ণেল রঘুনাথদাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—ঐ সকল সংবাদ সত্য কি না এবং উহার শাস্তি তাঁহার জানা আছে কি না। রঘুনাথ উত্তর দিলেন, হাঁ তাঁহার জানা আছে, বন্দুকের গুলিতে প্রাণ যাইবে। কর্ণেল বলিলেন, "দেখো, এবারের মতো তোমায় ক্ষমা করলাম। যাও, আমি এ-কথা কাউকে বলব না। কিন্তু যদি আবার এরূপ হয়, তবে তোমার শাস্তি অনিবার্য।"

সেই রাত্রেই আবার রঘুনাথ শুনিলেন, রামনাম সঙ্কীর্তনের দল কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে আকর্ষণ অদম্য। অবশেষে সব কিছু ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি সারারাত্রি সঙ্কীর্তন দলের সহিত অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে রঘুনাথদাসের উপর কর্ণেলের এতদূর আস্থা যে, তাঁহাকে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করিতে শুনিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। সুতরাং ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি রাত্রিকালে সৈন্যশিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রঘুনাথ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার সহিত যথাযথ তিনবার সঙ্কেত বাক্য আদান-প্রদান করিলেন। নিশ্চিন্তবোধ করিয়া কর্ণেল নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিদ্রা গেলেন।

প্রাতঃকালে রঘুনাথদাস আসিলেন নিজের অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণপূর্বক দণ্ডগ্রহণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁহার বিবরণ কর্ণেল শুনিলেন না, তিনি নিজে যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিলেন।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি রঘুনাথ কার্য হইতে কোনপ্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। এ যে তাঁহার প্রভু রামচন্দ্র, যিনি ভৃত্যের জন্য ঐরূপ করিয়াছেন! প্রতিজ্ঞা করিলেন, এখন হইতে তিনি আর কাহারও দাসত্ব করিবেন না।

স্বামীজী বলিলেন, "তিনি সরস্বতী নদীর তীরে বৈরাগী সাধুর জীবন যাপন করতে লাগলেন। লোকে তাঁকে অজ্ঞ মনে করত, কিন্তু আমি তাঁর ক্ষমতা জানতাম। তিনি প্রত্যহ হাজার হাজার লোককে খাওয়াতেন। কিছুদিন পরে হয়তো গমওয়ালা এসে তার প্রাপ্য চাইত! রঘুনাথদাস বলতেন, 'হুঁ, কত, হাজার টাকা? দাঁড়াও, দেখি। কই,

মাস খানেকের ভেতর তো কিছু টাকাকড়ি পাইনি। এ টাকাটা কাল আসবে মনে হয়।' টাকা ঠিক সেই দিনই আসত—তার একটুও অন্যথা হতো না।"

একজন রঘুনাথদাসকে জিজ্ঞাসা করেন, রামনাম সঙ্কীর্তন দলের গল্পটি সত্য কি না।

উত্তরে তিনি বলেন, "এ-সকল খবর জেনে লাভ কি?"

প্রশ্নকর্তা বলিলেন, "আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করছি না। আমি শুধু জানতে চাই, এরূপ ব্যাপার ঘটা সম্ভব কি না।"

রঘুনাথদাস উত্তরে বলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় সকলই সম্ভব।"...

স্বামীজী তারপর বলিতে লাগিলেন, "আমি হৃষীকেশে অনেক মহাপুরুষ দেখেছি। একজনের কথা আমার মনে আছে। তাঁকে দেখে পাগল বলে বোধ হয়েছিল। তিনি উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে আসছিলেন, আর কতকগুলো ছেলে তাঁর পিছু পিছু পাথর ছুড়তে ছুড়তে আসছিল। তাঁর মুখ ও ঘাড় থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে, তবুও তিনি হেসে কুটি-কুটি হচ্ছেন। আমি তাঁকে কাছে এনে ক্ষতগুলি ধুয়ে দিলাম এবং রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য নেকড়া পুড়িয়ে সেখানে লাগিয়ে দিলাম। যতক্ষণ আমি এসকল কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তিনি উচ্চ হাস্য করতে করতে ছেলেদের পাথর ছোড়াছুড়ি নিয়ে কি অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তাই আমাকে বলতে লাগলেন। বললেন, 'জগৎপিতা এভাবেই খেলা করে থাকেন।'

"এঁদের মধ্যে অনেকে লোকসঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য লুকিয়ে থাকেন; লোকজন তাঁদের কাছে উৎপাতের হেতু মাত্র। একজন তাঁর গুহার চারদিকে মানুষের হাড় ছড়িয়ে রেখেছিলেন এবং রটিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি শবমাংসভোজী। আর একজন পাথর ছুড়তেন। তাঁরা এ-রকম নানা উপায় অবলম্বন করে থাকেন।...

"কখনো কখনো তাঁদের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হয়। একটা ঘটনা বলছি। একটি ছোক্‌রা অভেদানন্দের কাছে উপনিষদ্ পড়তে আসত। একদিন সে জিজ্ঞেস করল, 'মশায়, এ-সব কি বাস্তবিকই সত্য?'

"অভেদানন্দ বলেন, 'নিশ্চয়ই! এ-সকল অবস্থা লাভ করা শক্ত হতে পারে, কিন্তু এ-সব নিশ্চয়ই সত্য!'

"পরদিনই সেই বালক নগ্ন সন্ন্যাসীর বেশে মৌনব্রত অবলম্বন করে কেদারনাথদর্শনে যাত্রা করল!

"তার কি হলো, জিজ্ঞেস করছ? সে মৌনী হয়ে গেল!

"কিন্তু সন্ন্যাসীদের আর পূজা, তীর্থযাত্রা বা তপস্যাদি করতে হয় না। তবে কেন তাঁরা তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে দেবদর্শনাদি করে বেড়ান এবং নানারকম কঠোর তপশ্চরণ করেন ? এ-ভাবে পুণ্য অর্জন করে তাঁরা জগৎকে দান করেন।"

তারপর হয়তো শিবিরানার গল্প হইল ! বর্ণনান্তে স্বামীজী বলিলেন, "এই সব গল্পই আমাদের জাতির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ অধিকার করে রয়েছে। কখনো ভুলো না যে, সন্ন্যাসী দুটি ব্রত গ্রহণ করেন। একটি সত্যোপলব্ধি, অপরটি জগতের হিতসাধন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আর তাঁর সবচেয়ে কঠোরভাবে পালনীয় ব্রত হলো, তিনি স্বর্গাদিলাভের চিন্তা পর্যন্ত বর্জন করবেন।"

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ

গুরুর সহিত যদি ভূ-প্রদক্ষিণও করা যায়, তবে উহাই তীর্থযাত্রায় পরিণত হয়। একদিন লোহিতসাগরে সন্ধ্যার কিছু পরে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা লইয়া আমি স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হই। প্রশ্নটি ছিল, অপরকে সাহায্য করিবার প্রকৃত পন্থা কি। বস্তুতঃ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর তিনি শাস্ত্রোক্তি অবলম্বন ব্যতীত স্বয়ং কদাচিৎ দিতেন। এইরূপ উত্তরের জন্য পরে আমরা কতই না কৃতজ্ঞ বোধ করিয়াছি ! তাঁহার ব্যক্তিগত মত আমরা জানিতে চাহিতাম। কিন্তু কোন শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যাসহযোগে ঐ মত প্রকাশ করায় আমাদের মনে উহা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত, এবং অসহিষ্ণু প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় মতো তৎক্ষণাৎ কোন একটা উত্তর দিলে যেরূপ হইত, তাহা অপেক্ষা অধিক দিন ধরিয়া আমরা ঐ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে পারিতাম।

ঐরূপ একদিন, কোন ব্রত লইয়া যাহারা সিদ্ধিলাভ না করিতে পারে, তাহাদের কী গতি হয়, এই বিষযে প্রশ্ন করিলে তিনি কয়েকটি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উত্তর দেন। তাঁহার সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজিতেছে।

অর্জুনের প্রশ্নটি আবৃত্তি করিলেন ঃ

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥"

—গীতা, ৬/৩৭-৩৮

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত কোন যোগ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়া উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে তাহাদের কি গতি হয়? হে মহাবাহো, ব্রহ্মমার্গে অবস্থান না করিতে পারিয়া তাহারা কি উভয় কূল হারাইয়া বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়?

পরক্ষণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্ভীক ও সগর্ব উত্তর আবৃত্তি করিলেন ঃ

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥"—গীতা, ৬/৪০

—হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাহাদের কদাপি বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার কোন কালে দুর্গতি হয় না।

তারপর তিনি এমন এক প্রসঙ্গে উপনীত হইলেন, যাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। প্রথমে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, শরীর, মন ও বাক্যের সম্পূর্ণ সংযম ব্যতীত যাহা কিছু কাজ, সব ইন্দ্রিয়সেবা মাত্র। অতঃপর বলিলেন, সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ সাধক কখন কখনও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং যে বাসনার ফলে তাহার পতন ঘটিয়াছিল, ঐ জন্মে উহাই চরিতার্থ করে। তিনি আরও বলিলেন, "অনেক সময়, পূর্বজন্মের সাধু-জীবনের স্মৃতি এই সব রাজাদের মনের মধ্যে বারংবার উদয় হয়।" পূর্বজন্মের এইরূপ একটা অস্পষ্ট স্মৃতি বর্তমান থাকা মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। আকবরের ঐরূপ স্মৃতি ছিল। তাঁহার মনে হইত, পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, কোন কারণে ব্রত পালনে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আরও অনুকূল অবস্থার মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেইবার তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেন। ইহার পর স্বামীজী নিজের ব্যক্তিগত ঘটনা কিছু কিছু বলিলেন। কদাচিৎ তিনি ঐরূপ বলিতেন। পূর্বজন্মের স্মৃতিপ্রসঙ্গে তিনি যেন অন্যমনে ক্ষণকালের জন্য নিজ অতীত জীবনের আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। সহসা আমার দিকে ফিরিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যাই ভাব না কেন, আমারও এরকম একটা স্মৃতি আছে। যখন আমি মাত্র দু-বছরের, আমাদের সহিসের সঙ্গে

ছাইমাখা, কৌপীনপরা বৈরাগী সেজে খেলা করতাম। আর যদি কোন সাধু ভিক্ষা করতে আসত, তাহলে বাড়ির লোকে আমাকে ওপরতলায় দরজা বন্ধ করে রাখত, পাছে আমি তাকে অনেক কিছু দিয়ে ফেলি। আমি মনে প্রাণে অনুভব করতাম, আমিও ঐ রকম সাধু ছিলাম, কোন অপরাধবশতঃ শিবের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। অবশ্য আমার বাড়ির লোকেরা ঐ ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ আমি যখন দুষ্টুমি করতাম, তারা বলত, 'হায়! হায়! এত জপতপ করবার পর শেষে শিব কিনা কোন পুণ্যাত্মাকে না পাঠিয়ে এই ভূতটাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন!' অথবা আমি খুব দুরন্তপনা করলে তারা 'শিব! শিব!' বলতে বলতে আমার মাথার উপর এক বালতি জল ঢেলে দিত। আর আমিও তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে যেতাম—এর অন্যথা কখনো হতো না। এখনো পর্যন্ত আমার মনে যখন কোন দুষ্টবুদ্ধি জাগে, ঐ কথা মনে পড়ে যায়, আর অমনি আমি শান্ত হয়ে যাই। মনে মনে বলি, 'না, না, এবার আর নয়'!"

যাহা হউক বর্তমান ক্ষেত্রেও স্বামীজী তাঁহার প্রথামত গীতার মত উদ্ধৃত করিলেন, আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,"তিন রকমের দান আছে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক দান—যা ঝোঁকের মাথায় করা হয়—সব সময়ে তা ভ্রমপূর্ণ! দাতা নিজের দান করবার ঝোঁক ছাড়া আর কিছু চিন্তা করেন না। নামযশের জন্য যে দান—তাকে বলা হয় রাজসিক দান। আর সাত্ত্বিক দান—যা দেশ-কাল ও পাত্র বিচার করে দেওয়া হয়।" তারপর যে ঘটনা হইতে আমার প্রশ্নটির উৎপত্তি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, তোমার দানটা তামসিক ধরনের হয়েছে। সাত্ত্বিক দানের কথা ভাবতে গেলে আমার মনে দিন দিন এক মহানুভবা পাশ্চাত্য রমণীর কথাই দৃঢ়ভাবে উদয় হচ্ছে; দেখেছি, তাঁরই দানে কোন আড়ম্বর নেই, দেশ-কাল ও পাত্রের যথেষ্ট বিচার আছে এবং কোন ভ্রম-প্রমাদ নেই! আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি ক্রমাগত শিক্ষা করছি যে, দানেরও একটা নির্দিষ্ট মাত্রা থাকা চাই, নতুবা ওতে বিপরীত ফল হয়।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমে মৃদুতর হইয়া অবশেষে নীরবতায় ডুবিয়া গেল, এবং আমরা নক্ষত্রালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "বয়স যত বাড়ছে, ততই দেখছি যে, ছোটছোট কাজের মধ্যেই আমি মহত্ত্বের বিকাশ দেখতে চাই। কোন মহৎ ব্যক্তির সম্পর্কে আমার জানতে ইচ্ছা করে—তিনি কি আহার করেন, কি পরেন, চাকর-বাকরদের সঙ্গে কিভাবে কথা

বলেন—এই সব। আমি দেখতে চাই, সার্ ফিলিপ সিড্‌নীর মতো ছোটখাট কাজে মহত্ত্বের নিদর্শন। মৃত্যুকালেও পরের তৃষ্ণানিবারণের কথা যাঁদের মনে আসে—তাঁদের মতো লোক অতি বিরল।

"কিন্তু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত যে-কোন লোক মহতের ন্যায় আচরণ করতে পারে। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় অতি বড় ভীরুও সাহসী হয়ে ওঠে—জগৎসুদ্ধ লোক যে তার দিকে তাকিয়ে আছে! তখন কার না হৃদয় নেচে উঠবে? কার না শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বইবে, যতক্ষণ না সে তার শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ দেখাতে পারছে।

"দিন দিন আমার কাছে নগণ্য কীটের মতো নীরব অবিচলিতভাবে মুহূর্তের পর মুহূর্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কর্তব্য কর্ম করে যাওয়াই প্রকৃত মহত্ত্ব বলে বোধ হয়।"

স্বামীজীর অপূর্ব কথাবার্তার স্মৃতি বিজড়িত থাকায় মানচিত্রের কত নূতন স্থানই না আমার দৃষ্টিতে নূতন সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। ইটালীর উপকূল অতিক্রম করিবার সময় আমরা বিভিন্ন খ্রীস্টীয় ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। বনিফেসিও প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইবার সময় কর্সিকা দ্বীপের দক্ষিণ উপকূল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে সম্ভ্রমের সহিত স্বামীজী মৃদুতরকণ্ঠে 'সেই সংগ্রামদেবতার জন্মভূমি' সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ ফরাসী দেশের অবতারণা করিয়া রোবস্‌পিয়রের ক্ষমতা সম্পর্কে অথবা 'তুমিও নেপোলিয়ন!' এই কথা দ্বারা ভিকটর হিউগো তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সে সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে লাগিলেন।

জিব্রাল্‌টার প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমি প্রাতঃকালে ডেকের উপর আসিতেই, তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "তুমি তাদের দেখেছ কি? তাদের দেখেছ কি? ওখানে জাহাজ থেকে তারা নামছে, আর 'দীন্!' 'দীন্!' শব্দে গগন বিদীর্ণ করছে।" অতঃপর আধ ঘণ্টা ধরিয়া মুরদিগের বারংবার স্পেন আক্রমণের জ্বলন্ত বর্ণনা দ্বারা তিনি আমাকে অভিভূত করিয়া দিলেন। আবার হয়তো কোন রবিবারের সন্ধ্যায় তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বুদ্ধদেবের গল্প করিলেন। বুদ্ধ-জীবনের সাধারণ ইতিহাস-বর্ণিত নীরস ঘটনাগুলিতে তিনি যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেন। মহাভিনিষ্ক্রমণ-ব্যাপারটি ভগবান বুদ্ধের নিকট যেরূপ বোধ হইয়াছিল, স্বামীজী ঠিক সেইভাবেই উহার বর্ণনা দিতেন।

কিন্তু তাঁহার সকল কথাবার্তাই মনোরঞ্জক অথবা শিক্ষাসংক্রান্ত ছিল না। প্রায়ই তিনি জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত নিজের জীবনের মহান উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেন। ঐ সকল সময়ে আমি পূর্ণ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতাম। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাক্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার ঐকান্তিক আগ্রহ আমার ছিল। কারণ আমি জানিতাম, ভবিষ্যতে অসংখ্য ভক্ত ও জিজ্ঞাসু জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহারা স্বামীজীর স্বপ্নগুলি বাস্তবে পরিণত করিবেন, এবং তাঁহাদের ও স্বামীজীর মধ্যে আমি কেবল বার্তাবাহী যন্ত্র বা সেতুস্বরূপ।

যখন আমরা এডেনের নিকটবর্তী হইয়াছি, সেই সময়ে এইরূপ একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। সেদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহার যে সব পরিকল্পনা, এবং অপরে যে সব উপায় নির্দেশ করে, এই উভয়ের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য কোন্ কোন্ বিষয়ে বলিয়া তিনি মনে করেন? এ বিষয়ে তাঁহার যথার্থ মনোভাব জানা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইল। বরং তিনি অন্য মতাবলম্বী নেতাদের কাহারও কাহারও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কার্য-প্রণালীর প্রশংসাই করিলেন। আমারও মনে হইল, ঐ প্রশ্নটি চুকিয়া গেল। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় তিনি নিজেই ঐ বিষয়ের পুনরবতারণা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "যারা তাদের নিজের নিজের কুসংস্কারগুলো আমার দেশবাসীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমি কখনো একমত নই। মিশরদেশের পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় রত ব্যক্তিগণের যেমন ঐদেশের প্রতি একটা স্বার্থজড়িত অনুরাগ থাকে, তেমনি ভারতের প্রতিও কারও কারও এমন অনুরাগ থাকতে পারে যা সম্পূর্ণ স্বার্থজড়িত। এরকম অনুরাগলাভ শক্ত নয়। লোকের এরকম আকাঙ্ক্ষা হতে পারে যে, এদের পড়া বইগুলিতে, চর্চায় এবং কল্পনার রাজ্যে ভারতের যে চিত্র তার মনের মধ্যে রয়েছে, অতীতযুগের সেই ভারতকেই সে আবার প্রত্যক্ষ করে। আমার ইচ্ছা, প্রাচীন ভারতের সদ্গুণগুলিই আবার জেগে উঠুক এবং তার সঙ্গে যুক্ত হোক বর্তমান যুগের যা কিছু শক্তিশালী গুণ; কেবল এই মিশ্রণব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে হওয়া চাই! নূতন ভারতকে গড়ে উঠতে হবে ভিতর থেকে, কোন বাইরের শক্তির সাহায্যে নয়।

"সেজন্য, আমি শুধু উপনিষদ্ প্রচার করি। লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবে, উপনিষদ্ ব্যতীত অন্য কিছু থেকে আমি কখনো প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিনি। আবার উপনিষদের মধ্যেও কেবল সেই ভাবটি—যা শক্তির প্রকাশক। বেদ-বেদান্তের সার ঐ

একটি শব্দে নিহিত। বুদ্ধ অপ্রতিরোধ বা অহিংসা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আমার মতে ঐ একই শিক্ষা উপনিষদের 'বীর্য' শব্দের দ্বারা আরও অধিক দেওয়া যায়। কারণ, অহিংসার পেছনে মারাত্মক দুর্বলতা থেকে যায়। দুর্বলতা থেকেই আসে প্রতিরোধের ভাব। গায়ে একবিন্দু সাগরজল লাগলে, আমি তার থেকে ভয়ে পালিয়ে যাই না, বা তাকে শাস্তি দেবার কথাও মনে আসে না। আমার কাছে ওটা গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু একটা মশার কাছে ঐ একবিন্দু জলই বিপজ্জনক। আমি চাই, যে কোন আঘাতের ক্ষেত্রেই, তাকে যেন তুচ্ছ করতে পারি। শক্তি ও নির্ভীকতা! আমার নিজের আদর্শ সেই অদ্ভুত সাধু, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যাঁকে তারা মেরে ফেলেছিল —এবং যিনি মর্মান্তিকভাবে ছুরিকাবিদ্ধ হয়েই কেবল মৌন ভঙ্গ করে বলেছিলেন, 'হাঁ, তুমিও তিনি—তত্ত্বমসি!'

"জিজ্ঞেস করতে পার, এই প্রাচীন-আধুনিক সমন্বয়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?

"তিনিই এই কার্যসাধনের প্রণালীস্বরূপ—সেই অদ্ভুত, অহংজ্ঞানরহিত পন্থা! তিনি নিজেকে জানতেন না। ইংলণ্ড বা ইংরেজদের সম্বন্ধে তাঁর এইটুকু মাত্র জ্ঞান ছিল যে, তারা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক—দূরে সমুদ্রের ওপারে বাস করে। কিন্তু তিনি সেই অসাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন—আমি তার ব্যাখ্যাকার মাত্র। তাঁর মুখে কারও সম্পর্কে কদাপি নিন্দা ছিল না। একবার আমাদের দেশের বীভৎস-আচার-বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায়কে আমি তীব্র সমালোচনা করি। তিন ঘণ্টা ধরে আমি কঠোরভাবে তার উদ্দেশ্যে বকে যাচ্ছি, তিনিও নীরবে শুনে যাচ্ছেন। আমার সব কথা শেষ হবার পর তিনি শুধু বললেন, 'দেখ, সব বাড়িতেই মেথর ঢুকবার জন্য পিছন দিকে একটা দরজা থাকে। এও সেইরকম আর কি!'

"এতদিন ধরে আমাদের (ভারতের) দেশের ধর্মের মহাদোষ ছিল এই যে, সে মাত্র দুটি কথা জানত—ত্যাগ ও মুক্তি। এ জগতে কি কেবল মুক্তিই দরকার? গৃহীদের জন্য কিছুই চাই না?

"কিন্তু আমি এই সব লোকদেরই বিশেষ করে সাহায্য করতে চাই। সব আত্মাই স্বরূপতঃ এক নয় কি? সকলেরই গম্যস্থান কি এক নয়?

"শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে হবে—এইটিই উপায়!"

সেই সময়ে মনে হইয়াছিল, এবং পরেও যত ভাবিয়াছি, ততই অধিকতররূপে আমার মনে হইয়াছে যে, আচার্যের নিকট হইতে এই একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্যও সমস্ত সমুদ্রপথ অতিক্রম করা সার্থক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্ম

স্বামীজী সর্বদাই হিন্দুধর্মকে এক অখণ্ডরূপে চিন্তা করায় মগ্ন থাকিতেন, এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রসঙ্গেই এ বিষয়টির বার বার অভিব্যক্তি দেখা যাইত। সন্ন্যাসী হিসাবে সম্ভবতঃ শৈবধর্মের ভাবসমূহের দ্বারা তাঁহার কল্পনা সমধিক প্রভাবিত ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম ও উহার বিশ্লেষণেও তাঁহার অনুরাগ ছিল চিরকাল। অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসহায়ে যে বিষয়টি তাঁহার অধিগত ছিল, তাহা হইল অদ্বৈতবাদের সত্যতা। যে দুটি প্রতীকের মাধ্যমে তিনি এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে চাহিতেন—তাহার একটি সন্ন্যাসের আদর্শ, অপরটি ভীষণের পূজা। এই উভয় সত্যই কিন্তু কেবল বীর বা যোদ্ধাপ্রকৃতির ব্যক্তির জন্য। উহাদের দ্বারা একদল সৈন্য সংগঠন করা যাইতে পারে। জগতের অধিকাংশ মানব চিরদিন ঈশ্বরকে দয়ালু, রক্ষাকর্তা এবং পালনকর্তা বলিয়া চিন্তা করিবে। প্রকৃত প্রশ্ন হইল, সর্বোচ্চ অদ্বৈতদর্শন এবং এই প্রকারের বিশ্বাসের মধ্যে যে সংযোগ আছে, সেই সম্পর্কে সাধারণ লোকের জ্ঞান কিরূপে অধিকতর দৃঢ় করা যায়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের কথা বলিতে গেলে এই সংযোগসেতু নির্মাণ করিবার প্রয়োজন ছিল। সেখানে অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে বহুপূর্বেই এ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতে এই বিষয়গুলি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত। এখন কেবল প্রয়োজন ঐ উপলব্ধির পুনরুজ্জীবন, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অংশগুলি যে পরস্পর সম্বদ্ধ তাহা ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া এবং প্রয়োজন ঐ বিষয়টির বারংবার আলোচনা, যাহাতে যে তর্কযুক্তি সহায়ে বৈষ্ণবধর্ম ও সর্বোচ্চ দর্শন অদ্বৈতবাদ অবিসংবাদিতরূপে অন্যোন্যসাপেক্ষ বলিয়া প্রমাণিত, তাহার মধ্যে কোন ছিদ্র না থাকে।

এইরূপে, তিনি হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্যের দিকটি বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। সর্বদাই তিনি অন্বেষণ করিতেন, কোন একটি ঘটনার ক্রমবিকাশের পশ্চাতে কোন্ মহাশক্তির প্রেরণা বিদ্যমান। কোন ধর্মসংস্থাপকের পিছনে সেই চিন্তাশীল মনীষী কোথায়? আবার সেই চিন্তারাশি পূর্ণতালাভ করিল

কোন্ মহাপ্রাণের চেষ্টায়! বুদ্ধ তাঁহার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত দর্শন মহর্ষি কপিলের নিকট প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে প্রেম ঐ দর্শনে প্রাণ সঞ্চার করে, তাহা বুদ্ধের নিজস্ব। কপিল বলিয়াছিলেন, এই পঞ্চতত্ত্বের কোনটির সম্পর্কেই নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না, কারণ কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। উহা অতীতে ছিল, কিন্তু বর্তমানে আর নাই। "প্রত্যেকেই জলরাশির উপর বুদ্বুদমাত্র। হে মানব, জেনে রাখো, তুমি সেই জলধিস্বরূপ।"

আবার সর্বসাধারণের বোধ্য যে হিন্দুধর্ম তাহার প্রচারক ও স্রষ্টা হিসাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজীর এমন আবেগপূর্ণ মনোভাব ছিল, যাহা ভগবান বুদ্ধের প্রতি ব্যক্তিগত প্রগাঢ় অনুরাগ অপেক্ষা কোনক্রমেই কম বলা চলে না। শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী ভাবের তুলনায় বুদ্ধের সন্ন্যাস আদর্শ প্রায় দুর্বলতাই বলা যায়। গীতা কি বিস্ময়কর গ্রন্থ!

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।"গীতা, ১২।১৮

বাল্যকালে গীতা পড়িবার সময় তিনি প্রায়ই ঐ ধরনের কোন গভীর অর্থপূর্ণ বাক্য দেখিলে থামিয়া যাইতেন, তারপর বহুদিন ধরিয়া ঐ কথাগুলি তাঁহার মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলিত। আর সেই যুদ্ধের বর্ণনা—সেই প্রচণ্ড তেজঃপূর্ণ যুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে' (গীতা, ২।৩) বাক্যে যাহার আরম্ভ! কি শক্তিপূর্ণ! ইহা ব্যতীত সত্যই গীতা অপূর্ব সৌন্দর্যের খনি! বৌদ্ধগ্রন্থগুলির পর গীতা যেন সকলের নিকট স্বস্তি বহন করিয়া আনিল। বুদ্ধ সর্বদা বলিতেন, "আমি সাধারণ লোকদের জন্য এসেছি।" অমনি বৌদ্ধগণ তাঁহার নামে ললিতকলা ও বিদ্যাচর্চার সমস্ত গৌরব পদদলিত করিয়া চূর্ণ করিল। প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই বৌদ্ধধর্মের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল।

"কারণ বৌদ্ধগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করা একপ্রকার যন্ত্রণাবিশেষ। অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত হওয়ার ফলে এক একখানি বিশাল গ্রন্থে মাত্র দু-একটি উচ্চভাব দেখতে পাওয়া যায়।[১] এই অভাব পূরণ করবার জন্যই পুরাণের উদ্ভব। ভারতে মাত্র একজন মনীষী পূর্ব থেকেই এই অভাব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—তিনি

---

১ কেহ যেন মনে না করেন, স্বামীজী এখানে 'ধম্মপদ'কে উদ্দেশ করিতেছেন। 'ধম্মপদ'কে তিনি গীতার সঙ্গে সমান স্থান দিতেন। সম্ভবতঃ স্বামীজী এখানে জাতকশ্রেণীর পুস্তকগুলির কথাই বলিতেছেন। Trubner's Oriental Series-এ উক্ত গল্পগুলি দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ। বোধ হয় তাঁর মতো মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি। সাধারণ লোকের অভাব, এবং পূর্বেই জাতির মধ্যে যা কিছু সঞ্চিত হয়েছে, তা সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা তিনিই সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু গোপী-ভাগবত ও গীতার (গীতায় পুনঃ পুনঃ স্ত্রী ও শূদ্রগণের প্রসঙ্গ আছে) সাহায্যেই তিনি সাধারণ লোকদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেননি। কারণ, সমগ্র মহাভারত তাঁরই, তাঁর ভক্তগণ কর্তৃক রচিত এবং গোড়া থেকেই ঘোষণা করছে যে, গ্রন্থখানি সাধারণ লোকদের জন্য।

"এইভাবে একটি ধর্মের সৃষ্টি হলো, যার পরিণতি বিষ্ণুপূজায় এবং তার মূল কথা হলো জীবনের গতি অব্যাহত রেখে, ভোগের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরলাভের চেষ্টা। আমাদের দেশের শেষ ধর্ম-আন্দোলন—শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্ম ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা বোধ হয় তোমার জানা আছে।[১] আবার দেখ, জৈনধর্ম প্রচার করছে ঠিক তার বিপরীত ভাব—আত্মপীড়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শরীরপাত। সুতরাং দেখছ, বৌদ্ধধর্ম হলো জৈনধর্মের সংশোধিত আকার এবং বুদ্ধ কর্তৃক সেই পাঁচজন কঠোর তপস্বীর সঙ্গত্যাগের এই হলো প্রকৃত অর্থ। ভারতবর্ষে প্রত্যেক যুগে এমন কতকগুলি ক্রমবিন্যস্ত সম্প্রদায় থাকে, যাদের মধ্যে চরম শারীরিক-নিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে চূড়ান্ত ভোগবাদ পর্যন্ত সকল প্রকার বাহ্য সাধনার নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার ঐ কালেই ঐভাবে ক্রমবিন্যস্ত কতকগুলি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়ে থাকে, যাদের সাধন প্রণালীর মধ্যে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়গুলিকে সাধনের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা থেকে তাদের বিলোপ-সাধন পর্যন্ত সবরকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম চিরকালই দুটি spiral বা পেঁচের দ্বারা গঠিত—তাদের বেড়গুলি বিপরীতমুখী; একই অক্ষ বা মেরুদণ্ড আশ্রয় করে আছে, এবং একটি অপরটির পরিপূরক।

"বৈষ্ণবধর্ম বলে, 'পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী বা সন্তানের জন্য এই যে প্রচণ্ড ভালবাসা, এসব ঠিক! হাঁ, এসবই ঠিক, যদি কেবল তুমি ভাবতে পার যে, কৃষ্ণই তোমার ঐ সন্তান, এবং তাঁকে আহার করাবার সময় মনে করতে হবে, কৃষ্ণকেই আহার করাচ্ছ।' 'ইন্দ্রিয়গুলোকে নিগ্রহ কর, ওদের দমন কর'—বেদান্তের এই নির্দেশের পরিবর্তে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ছিল—'ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তা নিয়ে পূজা কর!'

১ স্বামীজী এখানে কেবল ধর্মমতের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যের কঠোর সন্ন্যাসব্রতের কথা বলিতেছেন না। সেরূপ কঠোরতা সম্ভবতঃ জগতে অতুলনীয়।

"বর্তমান কালে আমরা জাতীয় ধর্মের তিনটি বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই—প্রাচীনপন্থী ধর্ম, আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ। প্রাচীনপন্থী ধর্ম মহাভারত যুগে বৈদিক হিন্দুগণ কর্তৃক গৃহীত পথ অবলম্বন করেছে। জৈনধর্মের স্থান অধিকার করেছে আর্যসমাজ, এবং ব্রাহ্মসমাজ বৌদ্ধধর্মের স্থান গ্রহণ করেছে।

"আমি দেখতে পাচ্ছি, ভারত নবীন ও প্রাণবন্ত। ইউরোপও তরুণ এবং সজীব। এদের মধ্যে কেউ এখনো পর্যন্ত বিকাশের এমন স্তরে উপনীত হয়নি, যাতে তাদের সব অনুষ্ঠান নিরাপদে সমালোচনা করা চলে। উভয়েই বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত, কোনটি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। ভারতে আমাদের সর্বস্তরে যে সাম্যবাদ (Social Communism) তা সমাজের অধীনে, অদ্বৈতজ্ঞানের আলো তার ওপর এবং আশে পাশে বিকীর্ণ হচ্ছে, তাকে বলা যায় আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Spiritual Individualism)। ইউরোপে তোমরা সামাজিক ব্যাপারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার (Social Individualism) পক্ষপাতী, কিন্তু চিন্তাধারায় তোমরা দ্বৈতবাদী ; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তোমরা নিজ নিজ মতে না চলে কোন একটা সাধারণ মত (Spiritual Communism) অনুসরণ কর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একের (অর্থাৎ ভারতের) দৈনন্দিন জীবনের সব অনুষ্ঠান সমাজতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা স্বাধীনতা দ্বারা সীমাবদ্ধ ; আর অপরের অনুষ্ঠানগুলি ব্যক্তিতান্ত্রিক, কিন্তু এক সাধারণ চিন্তাপ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত।

"এখন আমাদের ভারতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে তার নিজের ভাবেই সাহায্য করতে হবে। যে সব আন্দোলন কোন ব্যক্তি বা কাজকে তাদের নিজস্বভাব বজায় রেখে সাহায্য করতে চেষ্টা না করে, আন্দোলন হিসাবে তার সার্থকতা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, ইউরোপে আমি বিবাহ ও ব্রহ্মচর্যকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করি। কখনো ভুলে যেও না, দোষ ও গুণের সমাবেশেই মানুষ মহৎ হয় ও পূর্ণত্ব লাভ করে। সুতরাং কোন জাতির সবই দোষযুক্ত এ-কথা প্রমাণ করা সম্ভব হলেও, তার উন্নতির জন্য সাহায্য করতে গিয়ে তার জাতীয়ত্ব অপহরণ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, সে বিষয়ে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল। কতবার তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "তোমরা এখনো ভারতবর্ষকে বুঝতে পারনি। যাই বলো, ভারতবাসী আমরা মানুষের উপাসনা করি। আমাদের ঈশ্বর দেহধারী মানুষ।" এ স্থলে তিনি সেই সব আত্মদর্শী মহাপুরুষদের কথা বলিতেছিলেন —যেমন বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, গুরু বা মহাপুরুষ। অন্য এক সময়ে তিনি 'মানব' শব্দটি

সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মানব-উপাসনার[১] ভাব সূক্ষ্ম বীজাকারে ভারতবর্ষে বর্তমান, কিন্তু কখনো বিকাশলাভ করেনি। তোমাদের উচিত এর বিকাশসাধন। এই ভাবকে কাব্যে, ললিতকলায় রূপায়িত কর। তোমাদের মধ্যযুগের ইউরোপের মতো আবার সেই ভিক্ষুকদের পা পূজা করবার প্রথা প্রবর্তন কর। মানুষের পূজা করবে এমন এক উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কর।"

আবার, প্রতিমাপূজার উপকারিতা সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা সমভাবেই স্পষ্ট ছিল। তিনি বলিতেন, "তোমরা সব সময়ে বলতে পার যে, প্রতিমাই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতিমা ভেবে বসা—এ ভুল করো না।" একবার কয়েকজন তাঁহাকে 'হোটেণ্টটদের জড়োপাসনা'র নিন্দা করিবার জন্য অনুরোধ করে। উত্তরে তিনি বলেন, "জড়োপাসনা কাকে বলে আমি জানি না।"

তখন তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট এক বীভৎস চিত্রসহকারে ঐ উপাসনা বর্ণনা করা হইল—পূজার্হ বস্তুটিকে তাহারা ক্রমান্বয়ে প্রথমে পূজা, তারপর প্রহার এবং অবশেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করিয়া থাকে। উত্তরে তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি এর নিন্দা করব!" পরক্ষণেই সমাজে যাহারা নিম্নশ্রেণী, অসাক্ষাতে তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "দেখছ না, এটা জড়োপাসনা নয়? ওঃ, তোমাদের হৃদয় কি কঠিন! দেখতে পাও না যে, ছোট ছেলেরা ঠিকই করে থাকে! তারা সবই চৈতন্যময় দেখে। ঐহিক জ্ঞানবৃদ্ধি আমাদের বালকের সেই দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু অবশেষে উচ্চতর জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা পুনরায় ঐ অবস্থায় উপনীত হই। ছোট ছেলেরা গাছপালা, ইট, কাঠ, পাথর, সব জিনিসের মধ্যে একটা জীবন্ত শক্তি দেখতে পায়। আর সত্যি কি এদের পিছনে কোন জ্বলন্ত শক্তির অস্তিত্ব নেই? এটা প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা নয়। দেখতে পাচ্ছ না?"

কিন্তু যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিক মনোভাব ছিল তাঁহার নিকট পবিত্র, মুহূর্তের জন্যও তিনি হিন্দুধর্ম-দর্শনের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইতেন না। আইনবিদ্‌গণের বোধ্য শুষ্ক যুক্তিতর্ক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে গিয়া তিনি তাহাদের উপর অবিরত কবিত্বের অনন্ত উৎস খুলিয়া দিতেন। কী অনুরাগের সহিত মীমাংসা দর্শনের ব্যাখ্যা করিতেন। কী গর্বের সহিত তিনি শ্রোতাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, হিন্দু-পণ্ডিতগণের মতে সমগ্র জগৎ শুধু পদার্থময় ('পদের অর্থ'): আগে শব্দ বা পদ,

---

১ অর্থাৎ মানবমাত্রেই উপাসনা—মানবত্বের উপাসনা; ব্যক্তিবিশেষকে তাহার উন্নত মন বা চরিত্রের জন্য পূজা না করিয়া সকল মানুষকে গুণনির্বিশেষে পূজা করা।

পরে বস্তু। সুতরাং অর্থ বা ভাবই সব! বস্তুতঃ ঐ বিষয়ে তিনি যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন মীমাংসকদিগের অতি সাহসপূর্ণ যুক্তিপ্রণালী, নির্ভীকতার সহিত কতকগুলি বিষয়ের স্বীকৃতি এবং অনুমানের দৃঢ়তা আমাদের নিকট হিন্দুধর্মের বিশেষ গৌরবস্থল বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ বলিতে পারেন যে, 'প্রতিমা পূজা করিলেও প্রতিমা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে চিন্তার অবলম্বন ব্যতীত আর কিছু নহে'; প্রার্থনার একাগ্রতার উপরেই উহার শক্তিবৃদ্ধি নির্ভর করে; দেবদেবীর অস্তিত্ব শুধু মনে, কিন্তু সে কারণেই জোর করিয়া বলা যায়, তাঁহারা সত্যই আছেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে আর এ-কথা বলা যায় না যে, তর্কের যে-কোন মীমাংসা তাঁহারা কৌশলে পরিহার করিতে চাহেন। সমগ্র চিন্তাধারা যেন মূর্তিবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের সর্ববিধ্বংসী আক্রমণ বলিয়া মনে হইয়াছিল অথচ উহাই প্রযুক্ত হইয়াছিল একটি মত-ব্যাখ্যার অনুকূলে।

একদিন তিনি সত্যভামার ব্রত অনুষ্ঠানের গল্প বলেন। একটি তুলসীপত্রে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখিয়া তুলাদণ্ডের একদিকের পাল্লায় রাখা হইল; অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার নামযুক্ত পাল্লা অধিক ভারী হইল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "প্রাচীনপন্থী হিন্দুধর্ম 'শ্রুতি' বা শব্দকেই সর্বস্ব বলে থাকেন। 'বস্তু' হলো পূর্ব থেকে বর্তমান শাশ্বত ভাবের একটা ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং ঈশ্বরের 'নাম'ই সব; ভগবান নিজেই বিরাট মনে অবস্থিত সেই ভাবের বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। তোমার নিজের নামও, তুমি যে ব্যক্তি বা সান্ত, তার অপেক্ষা অনন্তগুণে পূর্ণতর। ঈশ্বর অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য অধিক। অতএব বাক্যপ্রয়োগ সম্পর্কে সাবধান হবে।" সত্য সম্পর্কে এরূপ নির্ভীক মতবাদ ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই দেখা যায় নাই। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বুঝিলাম, সমস্ত ব্যাপারটি প্রাচ্য মনের এই অন্তর্নিহিত, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত যে, ধর্ম উপলব্ধির বস্তু, কোন মতবাদ নহে; স্বামীজী নিজেই যেমন অন্যত্র বলিয়াছেন, উহা ক্রমিক অবস্থান্তর-প্রাপ্তি—ধর্মের প্রভাবে মানুষ উত্তরোত্তর নূতন ও উচ্চতর জীবন লাভ করে। যদি এ-কথা সত্য হয় যে, এই উপায়ে মানবকে বহুত্বের ধারণা হইতে ক্রমে নিশ্চিতরূপে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বে উপনীত করে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি সবই মনে; বাহ্য জগৎ মনের কল্পনারই স্থূল রূপমাত্র। সুতরাং প্লেটো-প্রচারিত গ্রীকদর্শন প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মীমাংসা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইউরোপীয়গণ যাহাকে শুধু 'ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করেন, ভারতীয় দর্শনে তাহার যুক্তিমূলক কারণ

দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপেই আর একদিন, কোন স্বতঃসিদ্ধ সত্য সম্পর্কে যেমন কেহ বলিয়া থাকে, সেইভাবে তিনি বলেন, "আমি গ্রীক দেবতাদেরও পূজা করব না, কারণ স্বরূপতঃ তাঁরা মানুষ থেকে পৃথক ছিলেন। কেবল তাঁদেরই পূজা করা উচিত, যাঁরা আমাদেরই মতো, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মহত্তর। দেবতা ও আমার মধ্যে যে প্রভেদ, তা শুধু প্রকাশের তারতম্য—আমি ক্ষুদ্র, তাঁরা বৃহৎ এইমাত্র।"

কিন্তু দর্শন সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা কোনক্রমেই সব সময় এইরূপ সৌখীন মতবাদ বা একটু আধটু সুস্বাদু চাটনীর মতো ছিল না। সাধারণতঃ তাঁহার দাবি ছিল, সকলেই পূর্ণমাত্রায় বিচারশক্তির প্রয়োগ করুক—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্দয়। প্রাচীন মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কখন কখনও তিনি দুই ঘণ্টাকাল পর্যন্ত কাটাইয়া দিতেন; শ্রোতৃবর্গ যে পণ্ডিত নহেন, এবং তাঁহারা বিরক্তি বা কষ্ট বোধ করিতে পারেন—এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ হইত না। ঐ সকল সময়ে ইহাও স্পষ্ট বোঝা যাইত যে, বিচারটি তিনি মনে মনে অপর এক ভাষায় অনুধাবন করিতেন, কারণ দেখা যাইত, পারিভাষিক শব্দগুলি অনুবাদ করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

এইরূপে তিনি বৈশেষিক মতে যে ছয়টি পদার্থের বিচারের দ্বারা জগতের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাদের উল্লেখ করিতেন। উহাদের নাম—দ্রব্য[১], গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায় এবং বিশেষ। ইহাদের সহিত তিনি বৌদ্ধদের পঞ্চতত্ত্বের তুলনা করিতেন—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। বৌদ্ধদের মতে রূপ অন্য চারিটি তত্ত্বের ফলস্বরূপ, নিজে কিছুই নহে। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের মতে লক্ষ্যবস্তু বিজ্ঞানের পারে অবস্থিত বা পঞ্চতত্ত্বের বহির্ভূত। ইহাদের সঙ্গে আবার তিনি বেদান্তের (এবং ক্যান্টেরও) কাল, দেশ, নিমিত্ত—এই তিনটি প্রাতিভাসিক বস্তুর উল্লেখ করিতেন—উহারাই নামরূপাকারে প্রকাশ পায়। এই নামরূপই মায়া—অর্থাৎ উহা সৎ নহে, আবার অসৎও নহে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, দৃশ্যমান এই জগতের কোন স্থায়ী সত্তা নাই—বরং উহা এক নিত্য পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। সৎ বস্তু এক, কিন্তু প্রক্রিয়াবশতঃ ঐ সৎ বস্তু নানারূপে প্রতিভাত হয়। ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ—উভয়ই মায়ার অন্তর্গত। সৎ বস্তুর বা প্রকৃত সত্তার অভিব্যক্তি অথবা সঙ্কোচ কিছুই হয় না, উহা নিত্য একরূপে অবস্থিত।

---

১ বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয়টি—পঞ্চভূত, কাল, দিক,আত্মা ও মন।—অনুঃ

যে পথ অনুসরণ করিয়া হিন্দুজাতি বর্তমান অবস্থায় উপনীত, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপ মহৎ ব্যাপার-প্রসঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্য চিন্তার ফলাফল বিস্মৃত হন নাই। কারণ তাঁহার মন এরূপ উপাদানে গঠিত ছিল, যাহা কেবল লক্ষ্য করিত মানবের অনুসন্ধিৎসা কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে; সেখানে প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে কোন কৃত্রিম প্রভেদ করিত না। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে সিলোজিসম (Syllogism) বলে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় 'পঞ্চাবয়ব[১] ন্যায়ের' অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখাইতেন। তারপরেই ন্যায়শাস্ত্রের চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনায় আসিতেন, উহারা হইল—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। এই ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে আধুনিক অবরোহী প্রথা[২] (Induction) ও আরোহী প্রথা[৩] (Deduction) স্বীকৃত হইত না। এই মতে অনুমান মাত্রেই দুই প্রকার—অধিক পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে অল্প পরিজ্ঞাত বস্তুর এবং অল্প পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে অধিক পরিজ্ঞাত বস্তুর আবিষ্কার। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে যে অনুমান, তাহা ত্রিবিধ—প্রথম, যাহাতে কারণদৃষ্টে কার্য অনুমিত হয় (ন্যায়ের ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'পূর্ববৎ'); দ্বিতীয়, যাহাতে কার্যদৃষ্টে কারণ অনুমিত হয় ('শেষবৎ'); এবং তৃতীয়, যাহাতে আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবস্থা পর্যালোচনার দ্বারা অনুমান করা হয় ('সামান্যতোদৃষ্ট')। আবার অনুমানের প্রণালী পাঁচপ্রকার—সাধর্ম্য দ্বারা, বৈধর্ম্য দ্বারা, সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য উভয় দ্বারা, আংশিক সাধর্ম্য দ্বারা এবং আংশিক বৈধর্ম্য দ্বারা। শেষোক্ত দুইটি কখন কখনও একত্র 'পারিশেষ্য' নামে অভিহিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেবল তৃতীয় প্রণালী অবলম্বনেই ত্রুটিশূন্য বা নির্ভুল অনুমান করা চলে, অর্থাৎ "অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয় ভাবে প্রমাণ করিলে তবেই প্রমাণ যথার্থ হয়।" নৈয়ায়িকেরা অনুমান-প্রমাণবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন; বৈদান্তিকেরা কিন্তু শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধনের মূল প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনুমান সহকারী প্রমাণ মাত্র।

---

১ পঞ্চাবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। যথা (১) প্রতিজ্ঞা—"এই পর্বত বহ্নিযুক্ত"; (২) হেতু—"যেহেতু ইহাতে ধূম রহিয়াছে"; (৩) উদাহরণ—"যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে অগ্নিও থাকে; যেমন রন্ধনশালা"; (৪) উপনয়—"এই পর্বতও সেইরূপ অর্থাৎ ধূমবান"; (৫) নিগমন—"যেহেতু এই পর্বত ধূমবিশিষ্ট, সেই হেতু উহা অবশ্যই বহ্নিবিশিষ্ট।"—অনুঃ

২ বিশেষের জ্ঞান হইতে সাধারণ নিয়মের জ্ঞান।—অনুঃ

৩ উহার বিপরীত অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম হইতে বিশেষের জ্ঞান।—ঐ

"আবার ব্যাপ্তি বলে একটা ব্যাপার আছে। একখানা পাথর পড়ে গেল এবং তাতে একটা কীট মারা গেল। এর দ্বারা আমরা অনুমান করি. সকল পাথরই পড়লে কীট বিনাশ করে। একটি প্রত্যক্ষ ঘটনাকে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে অন্যস্থলে প্রয়োগ করি কেন ? কেউকেউ বলেন, 'ওটা অভিজ্ঞতারই ফল।' কিন্তু মনে কর, ওটা প্রথমবারই ঘটল। একটি শিশুকে শূন্যে ছুড়ে দাও, সে কাঁদবে। অতীত জন্মের অভিজ্ঞতা বলছ ? কিন্তু ভবিষ্যতে কেন প্রযুক্ত হয় ? তার কারণ, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে একটি প্রকৃত সম্পর্ক আছে—ব্যাপ্তি সম্বন্ধ। আমাদের শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনভাবে ওতে অতিব্যাপ্তি অথবা অব্যাপ্তি দোষ না ঘটে। এই বিচারের ওপরেই মানবের সমস্ত জ্ঞান নির্ভর করছে।

"হেত্বাভাস অথবা ভ্রান্তযুক্তি সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যক্ষ অনুভব তখনই প্রমাণস্বরূপ গণ্য হতে পারে, যখন ঐ অনুভবের ইন্দ্রিয়, (অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব হবে) যে উপায় মাধ্যমে অনুভব হবে তা এবং ঐ অনুভবের অবিচ্ছিন্ন স্থিতি—সমস্তই হবে নির্দোষ। পীড়া বা ভাবাবেগ থাকলে লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুভবও এক রকমের অনুমান। অতএব, সর্বপ্রকার মানবীয় জ্ঞান অনিশ্চিত এবং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হতে পারে। প্রকৃত দ্রষ্টা কে ? তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা, যাঁর নিকট আলোচ্য বিষয়টি প্রত্যক্ষ অনুভূত। সুতরাং বেদই সত্য, কারণ বেদ আপ্তপুরুষের সাক্ষ্য। কিন্তু এই দর্শন বা অনুভবশক্তি কি কারও বিশেষ সম্পত্তি ? না। ঋষিমাত্রেরই—আর্য বা ম্লেচ্ছ যেই হোন—এই ক্ষমতা আছে।

"আধুনিক বাঙালীরা বলেন, আপ্তবাক্য প্রত্যক্ষ অনুভবের এক বিশেষ অবস্থামাত্র. এবং উপমান ও সাদৃশ্যমূলক বিচার অপকৃষ্ট অনুমানমাত্র, সুতরাং প্রকৃত প্রমাণ মাত্র দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

"দেখছ, একদল লোক বাহ্যবিকাশকে প্রাধান্য দেয়, আর একদল অন্তরের ভাব বা ধারণাকে। কোন্‌টি আগে ? পাখি আগে, তারপর ডিম—না ডিম আগে, তারপর পাখি ? পাত্রাধার তৈল, অথবা তৈলাধার পাত্র ? এ সমস্যার মীমাংসা নেই, এ-সব বিচার ছেড়ে দাও। মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ কর।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
পাশ্চাত্যদেশে স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন

৩১ জুলাই আমরা লণ্ডনে পৌঁছাই, এবং যে সমুদ্রযাত্রা আমার নিকট এত স্মরণীয় হইয়াছিল, তাহারও অবসান ঘটে। স্বামীজী উইম্বলডনে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন, কিন্তু বৎসরের এই সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের অধিকাংশই লণ্ডনে ছিলেন না। এদিকে আমেরিকা হইতে ক্রমাগত আমন্ত্রণ আসিতেছিল। সুতরাং অল্পদিন পরেই তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক আমেরিকা যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিল—সেখানে হাড্‌সন নদীর তীরে এক রমণীয় পল্লীনিবাসে অবস্থানপূর্বক অতঃপর তাঁহার পরবর্তী কর্মক্ষেত্র বিষয়ে ভগবানের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিবেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঐ ইঙ্গিত আসিবেই। একমাস পরে আমি ঐ ভবনেই অতিথিরূপে বাস করি, এবং ৫ নভেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ ছয়-সাত সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তাঁহার দর্শনলাভের সুযোগ পাই। ঐ তারিখে আমরা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার পর স্বামীজী নিউ ইয়র্ক এবং উহার কাছাকাছি কয়েকটি স্থান দর্শন করেন। ঐ মাসের শেষের দিকে কালিফোর্নিয়া যাইবার পথে তিনি শিকাগো হইয়া যান। আমিও তখন শিকাগোতে ছিলাম। পরবর্তী জুন মাসে (১৯০০ খ্রীঃ) আমি পুনরায় নিউ ইয়র্কে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করি। সেখানে কয়েক সপ্তাহ এবং পরে প্যারিসেও অনুরূপ সময় তাঁহার ঘন ঘন সাক্ষাৎ পাইতাম; অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে, ব্রিট্যানিতে তাঁহার সহিত আমেরিকাবাসী বন্ধুগণের অতিথিরূপে একই ভবনে একপক্ষ কাল অতিবাহিত করি। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের যে অমূল্য স্মৃতি আমার মনে বর্তমান রহিয়াছে—এখানেই তাহার পরিসমাপ্তি। কারণ, ইহার পর ভারতবর্ষে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে যখন আমি স্বামীজীর সাক্ষাৎ লাভ করি, সে কেবল তাঁহার শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার এবং শেষ বিদায় লইবার জন্য।

গুরুর সমীপে অবস্থানকালে শিষ্যের কর্তব্য শান্ত সংযতভাবে গুরুর আদেশ-পালন; কিন্তু গুরু অন্যত্র গমন করিলে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের যথাশক্তি উদ্যম ও তৎপরতা দেখানো প্রয়োজন। এই শেষোক্ত আচরণই স্বামীজী তাঁহার শিষ্যগণের

নিকট সর্বদা প্রত্যাশা করিতেন। একবার তিনি বলেন, যখনই কোন তরুণ সন্ন্যাসী কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস মঠ-বাসের পর 'কিছুই শিখিলাম না' বলিয়া অভিযোগ করিত, তিনি তখনই তাহাকে কিছুদিনের জন্য পূর্বাশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন ; এবং সেখানে যাইবার পর সে বুঝিতে পারিত, ইতিমধ্যে অজ্ঞাতসারে সে কতটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিবার তাঁহার নিকট বিদায় লওয়ার অর্থ ছিল, সেই শিষ্যের হস্তে যুদ্ধপতাকার ভার অর্পিত হইল। একবার এক বালিকা তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে বিদায় দিবার সময় ভাবের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, এমন সময়ে স্বামীজী তাহাকে অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, 'রাজপুত রমণীর ন্যায় বীরপত্নী হও, তাঁরা হাসিমুখে পতিকে বিদায় দিতেন।' কথাগুলি যেন মন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল। শিকাগো নগরে অল্পক্ষণ সাক্ষাতের পর যখন আমি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন তাঁহার শেষকথা ছিল, "মনে রেখো, ভারত চিরকালই ঘোষণা করছে, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতিই আত্মার জন্য।"

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আমি ব্রিট্যানিতে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন আমি একাকী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছিলাম, উদ্দেশ্য, ভারতীয় কার্যের জন্য সহায়তা লাভ ও অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা। কতদিন আমাকে সেখানে থাকিতে হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না। কোন কার্যপ্রণালীও নির্দিষ্ট ছিল না। সম্ভবতঃ স্বামীজীর মনে এই চিন্তার উদয় হইয়া থাকিবে যে, পুরানো সম্পর্কগুলি বহুসময়ে বিদেশে নূতন সম্পর্কস্থাপনের প্রবল অন্তরায় হয়। বহুলোককে তিনি কথা দিয়া কার্যের সময় পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়াছেন। মনে হইত, অন্য যে কেহ ঐরূপ করিতে পারে, এজন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। যেভাবেই হউক, তাঁহার শিষ্যের পক্ষে ঐ সময়টি ছিল সঙ্কটকাল, এবং উহা তিনি অবহিত ছিলেন। ব্রিট্যানিতে অবস্থানের শেষদিন সন্ধ্যার পর আমার লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারপ্রান্তে আমি সহসা স্বামীজীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তখন রাত্রির আহার সমাপ্ত হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্বামীজী আমাকে উদ্যানে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। আমি বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম, তিনি জনৈক বন্ধুর সহিত নির্দিষ্ট কুটিরে যাইবার পথে আমাকে আশীর্বাদ জানাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে ; শোনা যায়, তারা এত গোঁড়া যে, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে বলে, 'যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তোমার মৃত্যু হোক, আর

যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক।' শিশুকে তারা যা বলে থাকে, আজ রাত্রে আমিও তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু কথাটাকে উল্টে দিয়ে—যাও কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।"

তথাপি পরদিন সকালে, সূর্যোদয়ের একটু পরেই তিনি পুনরায় আসিলেন আমাকে বিদায় দিতে। ইউরোপের ভূখণ্ডে তাঁহার সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। আর একবার কৃষকের পণ্যবাহী শকট হইতে এই শেষ দিনটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই, স্বামীজী আমাদের ল্যানিয়ঁর কুটিরের বাহিরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছেন এবং উর্ধ্বে হাত তুলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে প্রভাতের আলোকে সমুজ্জ্বল আকাশ, প্রাচ্যদেশের অধিবাসিগণের নিকট ইহা কেবল অভিনন্দন নহে, আশীর্বাদও।

ইউরোপ ও আমেরিকায় এই কয়মাস অবস্থানকালে স্বামীজীর জীবনযাপন দেখিয়া বিশেষভাবে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রচলিত জিনিসের মূল্যবোধের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভ তাঁহাকে কদাপি চমকিত অথবা সন্দিহান করিত না। বিস্মিত না হইবার কারণ, যে মহাশক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছিল, তাহার মাহাত্ম্য তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কর্মে ব্যর্থতাও তাঁহাকে হতাশ করিত না। জয়-পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে ; তিনি উহাদের সাক্ষিস্বরূপ। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি জগৎটাই অদৃশ্য হয়ে যায়, তাতেই বা আমার কি ? আমার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তা হবে অতি চমৎকার।" পরক্ষণেই সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে যা কিছু আমার প্রতিকূলে, তা সবই শেষে স্বপক্ষে আসবে। আমি কি মহামায়ার সৈনিক নই!"

পাশ্চাত্যের বিলাসপূর্ণ জীবনে তিনি নির্ভীকভাবে এবং বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বিচরণ করিতেন। যেমন তাঁহাকে ভারতে অবিচলিতভাবে সাধারণ লোকের মতো বস্ত্র ও উত্তরীয়মাত্রে সজ্জিত এবং মেঝের উপর বসিয়া হাত দিয়া আহার করিতে দেখিয়াছি, ঠিক অনুরূপভাবে তিনি কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ না করিয়া আমেরিকা ও ফ্রান্সের জটিল ভোগবহুল জীবনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "সাধু ও রাজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুর ভোগ ও ত্যাগ—এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। ভারত অতীতে দারিদ্র্যকেই

সকল গৌরব প্রদান করেছিল। ভবিষ্যতে সম্পদকেও কিছুটা গৌরব দান করতে হবে।"

কিন্তু, বিদেশে যাঁহারা দ্বারে দ্বারে আতিথ্য গ্রহণপূর্বক বিচরণ করেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে দ্রুত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থা-বিপর্যয় তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডি অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাকে সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় সত্তা বিদ্যমান—যাহার সম্পর্কে তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন—সেই সত্তার প্রতি তাঁহার এরূপ পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী, প্রভুত্বপরায়ণ অভিজাত ব্যক্তি, কিংবা আমেরিকার কোটিপতি ঐশ্বর্যশালী, অথবা যাহারা নিপীড়িত, অত্যাচারিত—তাহাদের সকলের সহিত আলাপকালে সর্বক্ষেত্রে সমভাবে তাঁহার প্রত্যক্ষ আবেদন ছিল মানবের ঐ সত্তার প্রতি। কিন্তু তাঁহার প্রেম ও সৌজন্য বিশেষ করিয়া প্রবাহিত হইত সাধারণ দীন-দরিদ্রের উপর।

আমেরিকায় ভ্রমণকালে যখন দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন শহরে নিগ্রো মনে করিয়া তাঁহাকে হোটেলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, তখন এ-কথা তিনি কদাপি বলেন নাই যে, তিনি আফ্রিকাবাসী নিগ্রো নহেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যখন এইরূপ আচরণের দ্বারা তাঁহাকে অপমান করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসেন, তখন যেমনভাবে তিনি তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন,তেমন কৃষ্ণকায় নিগ্রো সমাজের আতিথ্যও অনুরূপভাবে নীরবে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে এক ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত জাতি সম্পর্কে তাঁহার এই নীরবতার উল্লেখ করিলে তাঁহাকে এইরূপ স্বগতোক্তি করিতে শোনা গিয়াছিল, "কী! একজনকে ছোট করে বড় হতে হবে! সেজন্য আমি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিনি।" সন্ন্যাসীর কোন জিনিস চাই বলিয়া জোর করিবার অধিকার নাই; তাঁহাকে সকল অবস্থাই মানিয়া লইতে হয়। এই সময়ে বহু কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশ্বস্তচিত্তে গোপনে শ্বেতকায় জাতি কর্তৃক তাহাদের অধিকার বঞ্চনার যে করুণ কাহিনী নিবেদন করিত, পরবর্তী কালে স্বামীজী প্রায়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। একবার কোন কারণে স্বামীজী স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রেলের এক নিগ্রো ভৃত্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলে যে, সে শুনিয়াছে, তাহার স্বজাতির মধ্যে একজন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং সে ব্যক্তি তিনি, সুতরাং সে তাঁহার সহিত করমর্দন করিতে চাহে। ঐ ঘটনার

ন্যায় আনন্দ তিনি অল্প ঘটনাতেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার সামনে কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি সামাজিক পদমর্যাদা হেতু ইতরজনোচিত উল্লাস প্রদর্শন করিলে তিরস্কৃত হইত না, ইহা কখনও সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে এতটুকু আভাস পাইবামাত্র তিনি কি কঠোরভাব ধারণ করিতেন! কী তীব্র ছিল তাঁহার তিরস্কার! সর্বোপরি, এই জাতির সন্তানগণই হয়তো ভবিষ্যতে কখনও অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে, এই সম্পর্কে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র কতই না উজ্জ্বল ছিল! অধিকারপ্রাপ্ত জাতিসমূহ কর্তৃক নিজেদের উৎপত্তির অসত্য বিবরণের প্রতি তাঁহার প্রতিবাদ ছিল ঘৃণাপূর্ণ। বলিতেন, "যদি আমি আমার শ্বেতকায় আর্য পূর্বপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, তবে আমার পীতকায় মোঙ্গল পূর্বপুরুষদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ, আর সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতির কাছে।"

নিজের শারীরিক গঠনের মধ্যে, তাঁহার মোঙ্গলীয়সদৃশ চোয়ালের জন্য তিনি বিশেষ গর্ববোধ করিতেন। উহাকে তিনি 'বুলডগের লক্ষণ— অর্থাৎ কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ার চিহ্ন বলিয়া' গণ্য করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মোঙ্গলদের এই বিশেষ গুণটি আর্য জাতির সকল শাখা-প্রশাখার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে, এবং সেজন্য একদিন উহার উল্লেখপূর্বক বলিয়া ওঠেন, "দেখছ না? তাতার জাতিই আর্যজাতির মদিরাস্বরূপ। তাতার জাতিই সকলের রক্তে শক্তি ও বল সঞ্চার করেছে!"

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি তাঁহার উদাসীনতার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্বদাই তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল চিন্তার সহায়ক আদর্শ স্থান খুঁজিয়া বাহির করা। প্রত্যেকটি পরিবার, গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি মুখ্য উপকরণ তাঁহার নিকট সেই পরিমাণে সমাদর লাভ করিত, যে পরিমাণে তাহারা উচ্চতম চিন্তাশীল জীবনগঠনের পক্ষে আবশ্যক চিত্ত ও ভাবের স্থৈর্য প্রদান করিতে পারিত। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মাইকেলমাস[১] দিবসে কয়েকজন ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সঁ্যা মিশেল পর্বত (Mont Saint Michel) দর্শনে গমন করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বামীজীর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বামীজী তখন মধ্যযুগে কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট অন্ধকার খাঁচার মতো ঘরগুলি দেখিতেছিলেন। সহসা ঐ ব্যক্তি চমকিত হইয়া শুনিলেন, স্বামীজী অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন, "আহা, কি চমৎকার ধ্যানের জায়গা!" যাঁহারা তাঁহাকে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আতিথ্যদানে আপ্যায়িত করেন,

---

১ ২৯ সেপ্টেম্বর।—অনুঃ

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও বর্তমান। তাঁহারা বর্ণনা করেন, পাশ্চাত্যদেশে প্রথম পদার্পণের পর সর্বদা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাওয়ার অভ্যাস দূর করিবার জন্য স্বামীজীকে কিরূপ বেগ পাইতে হইত। ট্রামে উঠিয়া তিনি এমন গভীরভাবে চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, গন্তব্যস্থলে কখন পৌঁছিয়াছেন সে বিষয়ে হুঁশ থাকিত না; ফলে কোন এক জায়গায় যাইবার জন্য হয়তো তাঁহাকে দুই-তিনবার সমস্ত পথের ভাড়া দিতে হইত। যেমন বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং এই বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, ক্রমশঃ বাহিরের তৎপরতা ও লৌকিক ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু স্বভাবের এই পরিবর্তন ছিল নিতান্তই বাহ্য। ভিতরে পূর্বের ন্যায় সেই জ্বলন্ত ইচ্ছাশক্তি বিরাজ করিত, এবং মন সর্বদা ভাবমুখে অবস্থান করিত! তাঁহার নিজের অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বলা যায়, মনে হইত, যেন কোন প্রতিকূল শক্তির দ্বারা তিনি 'বলের মতো একস্থান হইতে অপর স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন এবং ঐরূপে ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া যাইতেছেন'। একবার আবেগের সহিত তিনি বলিয়া ওঠেন, "আমি জানি, সারা পৃথিবী আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু ভারতে আমি কেবল ধ্যান করবার জন্য গুহাই খুঁজে বেড়িয়েছি, আর কিছু নয়!"

আবার এ-সব সত্ত্বেও সর্বদাই তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। ছাত্রের আগ্রহ লইয়া তিনি যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতির খোঁজ লইতেন। তবে কোন স্থানেরই রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি তাঁহাকে কদাপি প্রভাবিত করিতে পারিত না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তাহা অনুভব করিয়া তাহাদের আবেদনে যথোচিত সাড়া দিবার মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল! প্রত্যেক বস্তু যে ভাবরাশি অভিব্যক্ত করিতে প্রয়াস পায়, সেই ভাবের মাধ্যমেই তিনি সব কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ড-যাত্রাকালে একদিন তিনি গভীর নিদ্রার পর জাহাজের ডেকে আসিয়া আমাকে বলেন যে, স্বপ্নে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের বিবাহসম্পর্কিত কতকগুলি আদর্শের বিচার করিতেছিলেন, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উভয়ের মধ্যেই কিছু কিছু জিনিস আছে যাহা জগতের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য। শেষবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি আমাকে বলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয়ে আমি তার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলাম; কিন্তু এখন প্রধানতঃ তার অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতাই দেখতে পাচ্ছি। অপর সকলের মতো আমিও চিন্তা না করে ধরে নিয়েছিলাম যে, যন্ত্রপাতির

দ্বারা কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হবে ; কিন্তু এখন দেখছি যে, যন্ত্রের দ্বারা আমেরিকার কৃষকের সুবিধা হতে পারে, কারণ তাকে বহু বর্গমাইল চাষ করতে হয়, কিন্তু ভারতীয় চাষীদের ছোট ছোট জমির পক্ষে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। ভারত ও আমেরিকার সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক, অন্ততঃ এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই।" ধনের সমবণ্টন সমস্যা সম্বন্ধেও—যাহা দুর্বল বা দরিদ্রশ্রেণীর সমূল উচ্ছেদসাধন চাহে, এমন সব তর্কের প্রতি তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে কর্ণপাত করিতেন। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও যেন অজ্ঞাতসারেই তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। কোন জাতির মধ্যে দলবদ্ধ হইবার প্রবল অভ্যাস দেখিলে তিনি উহার প্রশংসা করিতে জানিতেন, কিন্তু হিংস্রপ্রকৃতির বৃকযূথের দলবদ্ধ হওয়ার মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়?

বিদেশে ভারতের অভাব অথবা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় তাঁহার ঘোর আপত্তি ছিল, এবং তাঁহার উপস্থিতিতে ঐ প্রকার আলোচনায় তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেন। পক্ষান্তরে, সমগ্র জগৎ বিপক্ষে থাকিলেও কোন স্বদেশবাসীকে সাহায্য করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। যদি কোন ভারতীয় কোন বিষয়ে অনুসন্ধান দ্বারা এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, যাহা ইউরোপীয়দের সিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে তাহাদের শত যুক্তি তর্কও তাঁহার নিকট ভাসিয়া যাইত। বালকের সরলতার সহিত তিনি স্পষ্ট উত্তর দিতেন, "আশা করি, আপনি আরও সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করবেন, আপনার মাপজোখ আরও নিখুঁত হবে, যাতে আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণিত হতে পারে।"

এইরূপে, যদিও অপর সকলে তাঁহাকে লইয়া গর্ব অনুভব করিতেন যে, তিনি সমগ্র বিশ্বেরই অধিবাসী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্র, তিনি স্বয়ং কিন্তু ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই সর্বদা গৌরব বোধ করিতেন। আর রাজোচিত পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ও নানা সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অবস্থান করিলেও তিনি যে সন্ন্যাসী, ইহাই লোকের নিকট দিন দিন স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ পাইত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্বামীজী-প্রচারিত মতসমূহের সমষ্টিভাবে আলোচনা

খ্রীস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধের আবির্ভাব দ্বারা দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হয়। যে শক্তিপ্রবাহ স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া দূরবর্তী দেশসমূহকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, একদিকে তিনি ছিলেন তাহার উৎসস্বরূপ। ভারতবর্ষ তাঁহার বাণী সমগ্র প্রাচ্য জগতে বিস্তার করিয়া অবশেষে নিজ সীমার বহুদূরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশে নানা জাতি, ধর্মসম্প্রদায়, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানচর্চার স্রষ্টারূপে গণ্য হয়। কিন্তু ভারতের নিজসীমার মধ্যে ঐ মহাপুরুষের জীবনই ছিল জাতি সংগঠনের প্রথম উপায়স্বরূপ। উপনিষদ্-নিহিত আর্য সংস্কৃতি আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া বুদ্ধ সাধারণ ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ নির্ণয় করেন, এবং ভাবীকালের জন্য এক অখণ্ড ভারতীয় জাতির সূত্রপাত করেন।

যে মহান জীবনের পরিচয় আমি লাভ করি, আমার স্থির বিশ্বাস, সেই জীবনেও অনুরূপভাবে দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়াছেঃ প্রথম—সমগ্র জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়—এক মহাজাতি সংগঠন। বিদেশের কথা বলিতে গেলে, স্বামী বিবেকানন্দই পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট বেদ ও উপনিষদের ভাবাদর্শের প্রথম প্রামাণিক ব্যাখ্যাকার। তাঁহার নিজস্ব কোন ধর্মমত প্রচার করিবার ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "বেদ ও উপনিষদ্ ব্যতীত আমি অন্য কোন গ্রন্থ থেকে কখনো কিছু উদ্ধৃত করিনি, এবং তাদের মধ্য থেকেও কেবল শক্তির কথাই বলেছি।" স্বর্গের পরিবর্তে তিনি প্রচার করেন মুক্তি, 'পরিত্রাণের' পরিবর্তে 'জ্ঞানলাভ'; ঈশ্বরের পরিবর্তে সর্বব্যাপী বা সর্বভূতে অবস্থিত অখণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ছিল তাঁহার উপদেশ, এবং কোন বিশেষ ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণার পরিবর্তে তিনি ঘোষণা করিতেন সকল ধর্মের সত্যতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে বিস্মিত এবং অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন যে, ধৈর্যসহকারে বহু গবেষণার দ্বারা তাঁহারা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এই

প্রচারক ধর্মব্যাখ্যাতার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত সেই সব কথা জীবন্ত সত্যের ন্যায় অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যত প্রকার পরীক্ষাই উপস্থিত করুন না, এই প্রচারকের পাণ্ডিত্য অনায়াসে তাঁহাদের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া প্রমাণিত হইত। তাঁহার প্রচারিত মতবাদ কেবল বিদ্যালয়ে অধিগত দর্শনচর্চামাত্র ছিল না, যাহা ঐতিহাসিক ও প্রাচীন ভাষাবিদ্যাগত—অতএব লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে, উহা ছিল এক জীবন্ত জাতির হৃদয়ের চিরপোষিত বিশ্বাস, যে জাতি পঞ্চবিংশ শতাব্দী ধরিয়া জীবনে-মরণে ঐ সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। ধর্মগ্রন্থসকল তাঁহার নিকট জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই; পরন্তু এক মহান জীবনের টীকা ও ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিল, যে জীবনের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ঐ সকল গ্রন্থের কোনরূপ সহায়তা ব্যতীত তাঁহার চক্ষুকে প্রতিহত করিত, এবং যাহার বিশ্লেষণে তিনি একান্ত অপারগ ছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেয় যে, শঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদই শেষ পর্যন্ত একমাত্র সত্য। পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার নিজস্ব অনুভূতির দ্বারা দৃঢ় হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয় যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি যে-সকল বিভিন্ন মতবাদ সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলেও প্রায় উহার সমীপবর্তী হইয়াছে, তাহারাও অবশেষে অদ্বৈতাবস্থারূপ সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতিরই নিম্নতর বিভিন্ন অবস্থা বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু এই চরম আদর্শের প্রকাশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিক বিশ্বাসই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যেখানে অন্যান্য লোকে উপাসনা করে, সে স্থানকে প্রণাম ও পূজা করবে, কারণ লোকে যে রূপে তাঁকে আরাধনা করে, তিনি সেইরূপেই তাকে দেখা দেবেন—এটা ধ্রুব সত্য।" স্বামীজী বলিলেন, "পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে ব্যবধান, তার প্রতি পদক্ষেপে যদি আমরা কল্পনার সাহায্যে সূর্যের এক-একটি ফটো তুলি তাহলে তার কোন দুইটিই পরস্পরের অবিকল অনুরূপ হবে না, তবু ঐ ফটোগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি অসত্য বলতে পার?" এই সকল উক্তির তাৎপর্য এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে বিরোধ, তাহাদের সমন্বয় সম্ভব। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সেই আচার্যশ্রেষ্ঠ যখন সাধনা দ্বারা আবিষ্কার করিলেন যে, নারীগণের জীবনেও উচ্চতম জ্ঞানলাভ সম্ভব, তখন হয়তো আমাদের এইরূপ ধারণা সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে যে, সাধারণতঃ যে-সকল ব্যবহারকে সামাজিক ও সাংসারিক বলিয়া হেয় করা হয়, তাহাদেরও পবিত্রজ্ঞানে যথোচিত

সমাদর করিতে হইবে। যে জগতে রূপকের এত আধিক্য, যেখানে শত শত বস্তু প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়া ঈশ্বরের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেই জগতে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, মন্দিরে পূজা-অর্চনার ন্যায় গৃহকর্মের সম্যক অনুষ্ঠান ভগবানলাভের সহায়ক হয়; মন্দিরে পুরোহিত দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করিয়া যে আশীর্বাদ লাভ করেন, গৃহে জননী বা পত্নী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পরিবারের সকলকে পরিবেশনপূর্বক তাহা অপেক্ষা কম ভগবৎ-কৃপা লাভ করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যা কিছু সবই মায়ার ভেতরে—ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত। কিন্তু এই মায়ার কতক অংশ জীবকে মুক্তির পথে সাহায্য করে; বাকি অংশ শুধু অধিকতর বন্ধনের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।" আমার মনে হয়, সাধ্বী নারীর প্রাত্যহিক জীবনও যে এইরূপে ঈশ্বরের আশীর্বাদলাভে ধন্য হইয়া থাকে, গৃহ যে মন্দিরস্বরূপ, এবং শিষ্টাচার, অতিথির সেবা ও সাংসারিক কর্তব্যপালন প্রভৃতি যে এক দীর্ঘকালব্যাপী পূজার অঙ্গরূপে পরিণত হইতে পারে—ইহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে তাঁহার মহান শিষ্যের জীবনে এক মুখ্য চিন্তাধারার ভিত্তি স্থাপন ও অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাঁহার ভারত-ভ্রমণকালে স্বামীজী উহার পৃথক পৃথক ধর্মমতবিশিষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং উহার প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি সেই ধর্মজ্যোতির সামান্য একটু আধটু প্রকাশ দেখিতে পান, যাহার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার গুরুদেবের চরিত্রেই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যখন ভারতের বাহিরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি দেখিতে আরম্ভ করেন, তখনই তিনি জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ দ্বারা একতাবদ্ধ জনসঙ্ঘসমূহের সম্মুখীন হইলেন। আর স্বভাবতই স্বদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতো এই সকল জনসমষ্টির মধ্যেও তিনি মানবের অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মভাবের লীলাবিলাস অনুভব করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ঘটিতেছিল; তথাপি বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাহাদের বিশেষ গুণগুলি অনুধাবন করিবার যে আন্তরিক চেষ্টা তিনি করিতেন, অন্তরঙ্গ ভক্ত মাত্রকেই তাহা আকৃষ্ট করিয়াছিল।

একদিন ইংলণ্ডযাত্রার পথে তিনি অত্যন্ত আনন্দসহকারে আমাকে তুর্কী নাবিকের দক্ষতা ও অপূর্ব সৌজন্যের বিষয় বলিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার চরিত্রের ঐ বিস্ময়কর উৎসাহ প্রদর্শনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সম্ভবতঃ তিনি জাহাজের খালাসীদের কথা ভাবিতেছিলেন; তাঁহার প্রতি তাহাদের বালকের ন্যায়

প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। যেন আমি তাঁহাকে কোন দোষে অভিযুক্ত করিয়াছি, এইভাবে তিনি শুধু বলিলেন, "কি জান, আমার মুসলমানদের আমি ভালবাসি।" উত্তরে আমি বলি, "তা বুঝলাম, কিন্তু আমি জানতে চাই, এই যে প্রত্যেক জাতিকে তাদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করার অভ্যাস, এ আপনি কোথা থেকে পেলেন ? কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্রে কি আপনি এটা দেখতে পেয়েছেন ? অথবা কোন সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই লাভ করেছেন !"

ধীরে ধীরে তাঁহার মুখের বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাব অপনীত হইল। তিনি উত্তর দিলেন, "খুব সম্ভব এ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষারই ফল। আমরা সকলেই কতকটা তাঁরই পথে চলেছিলাম। অবশ্য, তিনি নিজে যে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের ততদূর করতে হয়নি। তিনি যে-সব ব্যক্তির ভাব আয়ত্ত করতে চাইতেন, তাদের মতো আহার করতেন, তাদের পরিচ্ছদ ধারণ করতেন ; তাদের দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলতেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের যেন অপরের সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করাতে হবে।' এই যে প্রণালী, এ তাঁর নিজস্ব। ভারতবর্ষে এর পূর্বে কেউ এমনভাবে পর পর বৈষ্ণব, মুসলমান ও খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেননি।"

এইরূপে, স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ন্যায় পবিত্রতাস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহার মতে, প্রত্যেকেই যেন আদর্শ মানবত্ব সম্পর্কে নিজের ধারণা প্রকাশ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একবার তিনি সহসা বলিয়া ওঠেন, "যত বয়স হচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে, 'মনুষ্যত্ব' বা 'পৌরুষে'র মধ্যেই সব তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।"

মনের এক স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, যতই তিনি অন্যান্য জাতির শক্তির পরিমাণ ও প্রীতিকর গুণগুলির সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের জন্য তিনি নিজেকে অধিকতর গৌরবান্বিত বোধ করিতেন ; কারণ, যে-সকল গুণে তাঁহার জন্মভূমি সকলের উর্ধ্বে বিরাজ করিতেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে প্রতিদিন তিনি অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বিভিন্ন যুগের ন্যায় বিভিন্ন জাতিকেও তিনি ক্রমান্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে আলোচনা করিতেন—তাহাদের বিরাট সত্তার একটি দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন না। রোমক সাম্রাজ্যের বংশধরদের তিনি সর্বদাই নিষ্ঠুর প্রকৃতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন

এবং জাপানীদের বিবাহসম্পর্কীয় ধারণা তাঁহার নিকট ভয়াবহ ছিল। তথাপি, কোন জাতির সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিবার সময় সর্বদা তিনি তাহাদের গঠনমূলক আদর্শ গুণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, কখনও কোন সম্প্রদায়ের দোষগুলি দেখিয়াই বিচার করিতেন না। এই-সকল বিষয়ে আলোচনার সময়ে আমি তাঁহাকে শেষ যে-সব মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি, তাহার অন্যতম হইল, "স্বদেশপ্রীতি দেখতে হলে জাপানীদের দেখ। পবিত্রতা চাইলে হিন্দুদের দেখ, আর যদি পৌরুষ দেখতে চাও, তবে ইউরোপীয়দের দিকে তাকাও।" তারপর জোরের সহিত বলিলেন, "কোন ব্যক্তির পক্ষে মানুষের গৌরবের বস্তু কি হওয়া উচিত, তা ইংরেজ যেমন বোঝে, জগতে আর কোন জাতি তেমন বোঝে না।"

এক ব্যক্তিগত আলোচনাকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারত সম্পর্কে তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল, "হিন্দুধর্মকে অপর ধর্মের উপর প্রভাবশালী করা।" সনাতন ধর্মকে সক্রিয় ও প্রচারশীল হইতে হইবে ; বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকদল প্রেরণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে স্বমতে আনয়ন, এবং তাহার নিজের যে সকল সন্তান কুহকে পড়িয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পুনরায় নিজ ক্রোড়ে গ্রহণের সামর্থ্য থাকা চাই ; পরিশেষে জ্ঞাতসারে ও বিশেষ বিবেচনাপূর্বক নূতন নূতন ভাবকে আত্মসাৎ করিতে হইবে। স্বামীজী কি জানিতেন যে, কোন জাতি অথবা সম্প্রদায় যে মুহূর্তে নিজেদের জীবশরীরের ন্যায় সুসংবদ্ধ বলিয়া সচেতন হয়, সেই মুহূর্তে উহা অপরের উপর প্রভাবশালী এবং সক্রিয় হইয়া উঠে ? তিনি কি জানিতেন যে, তিনিই তাঁহার পূর্বপুরুষগণের ধর্মের মধ্যে স্বস্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধির পুনরুদ্বোধনে সহায়ক হইবেন ? যেভাবে হউক, তাঁহার নিজের উক্তি অনুসারে প্রথমাবধি তাঁহার একমাত্র কার্য ছিল, 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি আবিষ্কার করা'। স্বাভাবিক প্রেরণার বশে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, এইগুলির আবিষ্কার ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত উহাদের সমর্থনই একমাত্র পন্থা, যাহা দ্বারা তিনি জননীস্বরূপ হিন্দুধর্মকে নিজের অটুট যৌবন ও শক্তি সম্বন্ধে এক আনন্দময় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারেন। বুদ্ধ কি ত্যাগ ও নির্বাণ প্রচার করেন নাই, এবং যেহেতু এই ত্যাগ ও নির্বাণলাভ জাতীয় জীবনের সারবস্তু, তাঁহার দেহাবসানের দুই শতাব্দীর মধ্যেই কি ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয় নাই ? সুতরাং স্বামীজীও সেইরূপ জাতীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সার বস্তুগুলির উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের প্রচার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন—ফল যাহা হয় হউক।

তিনি বলিতেন, হিন্দুধর্ম ঘোষণা করে, একমাত্র এই ধর্মই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যরূপ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বলে, 'ইহাকেই একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ কর'। সকল শাস্ত্রের মূলে জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক যে-সকল নিয়ম বর্তমান, এবং যাহা হইতে সকল শাস্ত্রের উদ্ভব, হিন্দুধর্মে 'বেদ' শব্দে প্রকৃতপক্ষে তাহাই বুঝায়। হিন্দুধর্মের সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ বেদ-নামক গ্রন্থসমূহে আস্থা স্থাপন করেন নাই—যেমন, জৈনেরা ; তথাপি জৈনেরা হিন্দুপদবাচ্য ব্যতীত আর কিছু নহে। যাহা কিছু সত্য, তাহাই বেদ, এবং জৈনেরাও সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই পূর্ণরূপে মানিয়া চলিলেই হইল। যতদূর সম্ভব হিন্দুধর্মের পরিধি বিস্তৃত করিয়া দেওয়া ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। পক্ষিণী যেমন দুটি ডানা দিয়া তাহার শাবকগুলিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, হিন্দুধর্মও তাহার সকল শাখাপ্রশাখা তেমন আচ্ছাদন করিয়া রাখুন—ইহাই ছিল স্বামীজীর মনোগত ভাব। প্রথম বার আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেন, "আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, এবং খ্রীস্টধর্ম সকল আস্ফালন সত্ত্বেও যার দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র।" স্বামীজী বলিতেন, 'বেদ' শব্দে যদি গ্রন্থগুলিকেই ধরা যায়, তথাপি ধর্মের ইতিহাসে বেদের মাহাত্ম্য অতুলনীয়। কেবল উহাদের অতি প্রাচীনত্বের জন্য নহে, পরন্তু এই কারণেই উহা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ যে, জগতের সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র বেদই মানবকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন, তাহাকে সকল গ্রন্থের পারে যাইতে হইবে।[১]

এইরূপে, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সত্য। আবার এই সত্য গ্রন্থনিবদ্ধ নহে, সুতরাং উহাকে শুধু মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে ; সকলেই অনুভূতি দ্বারা এই সত্য লাভ করিতে পারেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, হিন্দুধর্মে বিজ্ঞানসম্মত-বিশ্বাস এবং ধর্মবিশ্বাস এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বাস্তব ও কাল্পনিক বিরোধ নাই। এই বিষয়ে স্বামীজী দেখিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানকে জ্ঞানরাজ্যের সর্বত্র প্রয়োগ করিবার আধুনিককালের যে বৈশিষ্ট্য, ভারতবাসীর সেই ভাবগ্রহণে বিশেষ যোগ্যতা আছে। ভারতের ধর্মচর্চায় রত মনীষিগণ কখনও কোন

---

১ গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বতঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ ॥—অমৃতবিন্দু উপনিষদ্
শাস্ত্রান্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবৎ তান্যথোৎসৃজেৎ ॥—অমৃতনাদোপনিষদ্

জ্ঞানের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করেন নাই। ইহাও গৌরবের কথা, এখনও পর্যন্ত হিন্দু যাজকগণ কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদে বিশ্বাস করিবার অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। শেষোক্ত তথ্য হইতেই ইষ্টদেবতার প্রতি নিষ্ঠারূপ মনের উদ্ভব—অর্থাৎ প্রত্যেককে আত্মোন্নতির জন্য স্বয়ং নিজের পথ নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে, এবং স্বামীজীর মতে ইহাই হিন্দুধর্মের একমাত্র সার্বভৌম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মকে জগতের সর্বপ্রকার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি কেবল যে সহনশীল করিয়াছে তাহা নহে, উহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া লইবার সামর্থ্যও প্রদান করিয়াছে। তিনি দেখাইয়া দেন যে, এমনকি, সাম্প্রদায়িক ভাবও—যাহাতে ঈশ্বর স্বয়ং বিশ্বাসীর বা সাধকেরই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাসের দ্বারা সূচিত, এবং নিজের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টি একমাত্র খাঁটি সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত,এবং যাহাতে সময় সময় চরম গোঁড়ামি পর্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে—হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে তাহা অসত্য বা সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন নহে, পরন্তু অপরিণত মনেরই লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, উহা বিচারের বেড়া—চারাগাছের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু বৃক্ষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমরা যে কোন কিছুর সীমা নির্দেশ করি, ইহাই প্রমাণ করে যে, আমরা এখনও পর্যন্ত সসীম বস্তু লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি। যখন অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের মন কেবল অনন্তের চিন্তায় মগ্ন থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "সকলেই জমির খানিকটা অংশে বেড়া দিয়ে বলে, 'ওটা আমার জমি', কিন্তু আকাশকে কে বেড়া দিয়ে ভাগ করতে পারে?"

যে অসংখ্য সম্প্রদায় ও মতমতান্তর লইয়া হিন্দুধর্ম গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকটির ভিত্তি হইল অপরোক্ষানুভূতি, এবং সকলেরই বৈশিষ্ট্য হইল অনন্ত উদারতা—যাহা সকলকে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অবশ্য পালনীয় বলিয়া পুরোহিতশ্রেণী যে-সকল নিয়মের প্রবর্তন করেন, তাহা কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে। যদিও ইহার ফলে আচার প্রথায় অত্যধিক কড়াকড়ির সৃষ্টি হয়, ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয়, তাঁহাদের মতে মানবমন চিরকালই স্বাধীন। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, হিন্দুধর্মের মধ্যে চিন্তাশক্তির যতদূর প্রসারলাভ ঘটে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় এইগুলি ছিল স্বামীজীর বক্তৃতার প্রধান বিষয়।

অস্থিমজ্জাস্বরূপ যে-সকল বিশিষ্ট ধারণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের অস্তিত্ব ভাবা যায় না, তাহার প্রথমটি হইল সৃষ্টিপ্রবাহের চক্রবৎ আবর্তন। সৃষ্টি

থাকিলেই তাহার একজন স্রষ্টা থাকিবে, এবং স্রষ্টা বলিলেই সৃষ্টি বুঝা যায়—উভয়েই তুল্যভাবে পরস্পর সাপেক্ষ। এই দ্বৈতমূলক সম্পর্ক আপেক্ষিক সত্য ব্যতীত আর কিছু নহে। হিন্দুধর্মে এ বিষয়ে গভীর দার্শনিক বিচার আছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দ্বারা স্বল্প কথায় উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। সাধারণভাবে ভারতীয় চিন্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ তিনি যে দ্বিতীয় মতটির আলোচনা করেন, তাহা পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ, যাহার চরম পরিণতি মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পূর্ণ বিকাশে। পরিশেষে, চিন্তা ও উপাসনার মধ্যে আকারভেদ সত্ত্বেও সকল সময়ে এবং সর্বাবস্থায় সত্যের সর্বজনীনত্ব ঘোষণা দ্বারা তিনি হিন্দুধর্মের এই সকল বৈশিষ্ট্য যে প্রকৃতপক্ষে গৌণ সে বিষয়ে তাঁহার বক্তব্যের সমাপ্তি করেন। কয়েকটি প্রাঞ্জল বাক্যের মাধ্যমে তিনি সর্ববাদিসম্মতরূপে হিন্দুধর্মের একত্ব প্রতিপাদন করেন এবং উহার মুখ্য লক্ষণগুলি চিত্রিত করেন। পাশ্চাত্য-জগতে তাঁহার অবশিষ্ট কার্য ছিল, প্রধানতঃ সনাতন ধর্মের অন্তর্গত মহান সত্যগুলিকে আধুনিক কালের ও সর্বজনের উপযোগী করিয়া অকাতরে সকলের মধ্যে বিতরণ করা। ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎই ছিল ভারতবর্ষ, সর্বদেশের মানবমাত্রেই তাঁহার নিজধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরেই, স্বামীজী তাঁহার স্বদেশবাসীর চিন্তাধারায় তাঁহার দান দার্শনিক আকারে প্রদান করেন। ভারতের সকল যুগপ্রবর্তকেরই উহা দিবার প্রয়োজন হয়, এ-কথা পূর্বেই অন্যত্র বলা হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এই তিনটি দর্শন জীবাত্মার মুক্তির তিনটি বিভিন্ন আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা কবা হইত। এই বিভিন্ন মতবাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের কোন চেষ্টা ইতিপূর্বে হয় নাই। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে উপনীত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ সাহসপূর্বক ঘোষণা করেন যে, দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের চরম অনুভূতিও অদ্বৈতবাদেরই নিম্নতর বিভিন্ন অবস্থামাত্র, এবং সকলের পক্ষেই চরম আনন্দ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্বে বিলীন হইয়া যাওয়া। শোনা যায়, তাঁহার কোন এক মধ্যাহ্নকালীন প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করেন, ইহা সত্য হইলে, পূর্ববর্তী আচার্যগণের কেহ এ বিষয়ে কখনও উল্লেখ করেন নাই কেন? উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী জানিতেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য ক্লাসে নিয়ম ছিল, ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রথমে ইংরেজীতে এবং পরে সংস্কৃতে দেওয়া হইবে। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই

বৃহৎ সভায় উপস্থিত সকলেই তাঁহার উত্তর শুনিয়া চমকিত হইলেন, "যেহেতু ঐজন্যই আমার জন্ম, এবং ঐ কাজ আমারই জন্য নির্দিষ্ট ছিল।"

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার কোন একটিকেও তাহার গণ্ডির বাহিরে রাখিবার কোনপ্রকার চেষ্টা স্বামীজী আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ব্রাহ্ম অথবা আর্যসমাজভুক্ত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট অহিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেন না। তাঁহার মতে শিখদের বিখ্যাত খালসা সৈন্যদলের ন্যায় অতি সুন্দর, সুগঠিত সঙ্ঘ হিন্দুধর্মেরই সৃষ্টি, এবং উহা হিন্দুধর্মেরই অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। গুরুগোবিন্দ সিংহ ধর্মের জন্য তাঁহার শিষ্যদের প্রাণ উৎসর্গের যে আহ্বান করিতেন—সেই দৃশ্যটি তিনি কী আবেগের সহিত বারংবার আমাদের নিকট অঙ্কিত করিতেন! তাঁহার মতে, হিন্দু ধর্মের তিনটি পৃথক স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। তাহার মধ্যে প্রথম হইল—প্রাচীন, ঐতিহাসিক ধর্ম যাহা শাস্ত্রানুবর্তী। দ্বিতীয়—মুসলমান রাজত্বকালে ধর্মসংস্কারকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহ। তৃতীয়—বর্তমানকালের সংস্কারপ্রয়াসী বিভিন্ন সম্প্রদায়। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই সমভাবে হিন্দুধর্মভুক্ত। স্বদেশ ও নিজের ধর্মের সমস্যাগুলি বিস্তৃতভাবে অনুধাবন করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ যে যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য থাকাকালে প্রথম পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়, একথা তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নাই। ঐ সদস্যপদের কথা অস্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং একদিন আগ্রহের সহিত তিনি বলিয়া ওঠেন,"তাঁরাই বলুন, আমি তাঁদেরই একজন কিনা! আমার নাম যদি তাঁরা কেটে না দিয়ে থাকেন, তাহলে তা এখনো তাঁদের খাতায় আছে।" এইরূপে, কোন ব্যক্তি নিজেকে আর্য, ব্রাহ্ম বা সনাতনপন্থী—ইত্যাদি যে বিশেষণেই অভিহিত করুক, স্বামীজীর মতে সে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুই। জৈনদের হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি তো অতি সহজেই সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। পশ্চিম ভারতের জৈনরা আজ পর্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন, যদি তাঁহারা যথার্থ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত কিনা এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এখনও পর্যন্ত তাঁহারা বিবাহকালে সমান শ্রেণীর হিন্দুদের নিকট কন্যা আদান-প্রদান করিয়া থাকেন, এবং আজ পর্যন্ত তাঁহাদের মন্দিরে সময়ে সময়ে পৌরোহিত্য করেন সাধারণ ব্রাহ্মণগণ। সকল ধর্মের মধ্যেই স্বামীজীর শিষ্য ছিল—এমনকি, মুসলমানদের মধ্যেও, এবং তাঁহার কয়েকজন জৈন বন্ধুর সহায়তায় তিনি এমন কতকগুলি জৈন ধর্মগ্রন্থ পড়িতে পারিয়াছিলেন, যাহা অপর সম্প্রদায়ের

লোকেদের সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। এই অধ্যয়নের ফলে জৈনদের ধর্মমত ও বংশপরম্পরা ভাবধারার প্রাধান্য সম্পর্কে এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশলাভে জৈনধর্মের বিশেষ অবদান সম্পর্কে স্বামীজী গভীরভাবে প্রভাবিত হন। হিন্দুধর্মের প্রবল আদর্শগুলির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, মূক পশুগণের ভিতরেও সেই বিভু বর্তমান বলিয়া তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার, এবং সাধুজীবনে ত্যাগ-তপস্যার আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এই দুই বৈশিষ্ট্য জৈনগণ কর্তৃক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত ও বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। আবার জীবাণুঘটিত তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত হইতে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষতঃ উহা আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণার পরীক্ষা-নিরীক্ষাদ্বারা সমর্থিত। স্বামীজী বলিতেন, "জৈনরা যে বলে থাকেন, তাঁদের মতগুলি প্রথমে ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল—এ অতি সত্য, এবং সহজেই বোঝা যায়।"

বর্তমানে ভারতের যে-সব জাতি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে স্বামীজী আশা করিতেন, রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভুত্বপ্রাপ্ত জাতির ধর্মগ্রহণ করিয়া তাহারা সামাজিক পদমর্যাদায় উন্নীত হইবে, এবং ভাবী যুগে লোকে খ্রীস্টধর্ম বিস্মৃত হইয়া গেলেও তাহারা ঐ উন্নতি বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে, আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে ঊনবিংশ শতাব্দীকে বিভেদসৃষ্টিকর শক্তি বলিয়া লোকে আর মনে রাখিবে না, এবং এই শতাব্দী তখন ভারতের সকল বিষয়ে স্থায়ী উন্নতিরূপ সুফল প্রসব করিবে। এইরূপ উন্নতির সম্ভাবনার দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তরভারতে চৈতন্যদেবের কার্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি কি তাঁহার অনুবর্তীদের একটি বিলক্ষণ খ্যাতি-প্রতিপত্তিশালী সমাজে পরিণত করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই?

খ্রীস্টধর্মের বর্তমান কার্যাবলীর জন্য তাহাকে ক্ষমা করা কঠিন। হিন্দুধর্মের অপর প্রতিযোগী ধর্ম, অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম কিন্তু সেরূপ নহে। ঐ ধর্মের নাম শ্রবণমাত্র আমাদের আচার্যদেবের মনে সর্বদাই এক আগ্রহপূর্ণ ভ্রাতৃভাবের চিত্র উদয় হইত—যে ধর্ম সাধারণ ব্যক্তিগণকে সর্ববিধ স্বাধীনতা প্রদানে এবং উচ্চপদস্থগণকে সর্বসাধারণের পর্যায়ে রাখিতে তৎপর। স্বামীজী মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না যে, মুসলমানগণ এদেশে অনধিকার প্রবেশ করিলেও বর্তমান ভারতের ক্রমোন্নতির মূলে যে সকল উপাদান বর্তমান, তাহাদের অন্যতম হইল মুসলমান কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি গ্রহণ। নীচবংশে যাহারা

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কেবল উচ্চ সামাজিক অধিকারপ্রদানপূর্বক উন্নত করা নহে, পরন্তু এই অতি শান্তজাতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার জন্য উদ্যম এবং বাধাপ্রদানের প্রচেষ্টা এই উভয় আদর্শের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন দ্বারা তাঁহারা যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাও স্বামীজীর নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। তিনি সর্বদা দেখাইয়া দিতেন, মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, পাঠান, মোগল ও শেখ—এই চারিটি শ্রেণী আছে, এবং ইহাদের মধ্যে ভারতের মাটি ও অতীত-স্মৃতিতে শেখদের উত্তরাধিকারস্বত্ব রহিয়াছে। ঐ স্বত্ব হিন্দুদের মতোই প্রাচীন এবং ঐ সম্পর্কে কোন বিতর্কের স্থান নাই। অবিবেচনাপূর্বক লিখিত একটি শব্দ প্রসঙ্গে তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "সাজাহান নিজেকে 'বিদেশী' নামে অভিহিত হতে শুনলে কবরের ভিতর থেকে ফিরে দেখবেন, কে তাঁকে ঐ রকম বলছে।" সর্বোপরি, মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল—ভারত যেন 'ইসলামীয় দেহ ও বৈদান্তিক হৃদয়' এই দ্বিবিধ আদর্শকে প্রকাশ করিতে পারে।

এইরূপে, এই সকল ঘটনার রাজনীতিক গুরুত্বের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার নিকট এক, অখণ্ড এবং গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, ঐ একতা মনের দিক দিয়া নহে, ঐ একতা হৃদয়ের। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জগতে তাঁহার কার্য তাঁহার গুরুদেবের বার্তা আচণ্ডালে বিতরণ করা। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা স্বদেশের কল্যাণসাধনের অদম্য কামনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। তিনি নিজে কখনও নিছক জাতীয়তা প্রচার করেন নাই; কিন্তু তিনি স্বয়ং ছিলেন জাতীয়তাশব্দে যাহা বুঝায়, তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্তিস্বরূপ। ভারতের জাতীয় আদর্শ যে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি, আমাদের গুরুদেব নিজের জীবনেই তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে, ভারতের অতীতের কেবল পুনরুজ্জীবন অথবা পুনঃসংস্থাপন স্বামীজীর একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না। যাঁহারা ঐরূপ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেন, "মিশর দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় রত ব্যক্তিগণের যেমন ঐ দেশের প্রতি একটা স্বার্থজড়িত অনুরাগ থাকে, তেমনি ভারতের প্রতি এঁদের অনুরাগও সম্পূর্ণ স্বার্থজড়িত।এঁদের পড়া বইগুলিতে, চর্চায় এবং কল্পনারাজ্যে যে ভারতের চিত্র মনের মধ্যে রয়েছে. সেই অতীত যুগের ভারতকেই আবার দেখবার জন্য এঁরা লালায়িত।" তিনি নিজে চাহিতেন, ভারতের প্রাচীন শক্তির নূতন প্রয়োগ, এই নূতন যুগে তাহার কল্পনাতীত বিকাশ। তিনি

'ডাইনামিক রিলিজন' অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ধর্ম দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। ধর্মের মধ্যে যতপ্রকার নীচতা, অধঃপতিত অবস্থা, এবং উন্নতির পরিপন্থী অংশ বিদ্যমান, কেবল সেগুলিকেই বাছিয়া লইয়া লোকে তাহাদেব 'প্রাচীনপন্থী' বা 'গোঁড়া' আখ্যায় অভিহিত করিবে কেন? 'প্রাচীনপন্থী' শব্দ এত মহান, এত শক্তিশালী, প্রাণপ্রদ যে কিছুতেই উহার ঐভাবে প্রয়োগ চলে না। যে পরিবারে সকল পুরুষই পাণ্ডব বীরগণের তুল্য, সকল নারীই সীতার ন্যায় মহীয়সী, বা সাবিত্রীর ন্যায় নির্ভীক, সেই পরিবার সম্পর্কেই কেবল ঐ শব্দের যথার্থ প্রয়োগ হইতে পারে। রক্ষণশীল অথবা সংস্কারমূলক সকলপ্রকার বিশেষ সমস্যা হইতেই তিনি দূরে অবস্থান করিতেন। তাহার কারণ ইহা নহে যে, একদল অপেক্ষা অন্যদলের প্রতি তিনি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন; প্রকৃত কারণ, তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে, উভয়ের পক্ষেই প্রকৃত প্রশ্ন হইল আদর্শটিকে ঠিক ঠিক ধরিতে পারা, এবং ভারতের সহিত উহার একাত্মতা সাধন। নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ—এই উভয়ের জন্য তাঁহার অভিমত ছিল যে, তাহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য সমাজের বর্তমান ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তনসাধন নহে, পরন্তু তাহাদের জন্য শিক্ষার দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করিয়া লইতে পারে।

অজ্ঞতার প্রতি তাঁহার যেমন বিদ্বেষ ছিল, জগতে অলৌকিক রহস্য নামে পরিচিত বস্তুর সহিত ভারতের অভিন্নতাবোধও তাঁহার নিকট ছিল তেমনই উৎকট ভীতিস্বরূপ। এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের যে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ও কৌতূহল, তাহা তাঁহারও ছিল, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, আগুনে হাত দেওয়া প্রভৃতি শুনিলে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অসুবিধা স্বীকার করিতেও তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমরা সকলেই অবগত আছি যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এইসকল ব্যাপার শেষে প্রায়ই অত্যন্ত অবিশ্বাস্য শোনা-কথায় পর্যবসিত হয়। যাহা হউক, এইরূপ কোন ক্ষেত্রে ঐ-সকল ঘটনা কেবল ইহাই নির্দেশ করে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলির বর্তমান শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ, এবং উহার সংশোধন অবশ্যই করা উচিত, যাহাতে সচরাচর দৃষ্টিতে পড়ে না, অথচ সম্ভবপর, এরূপ ব্যাপারগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। উহারা আমাদের এই সরল উপদেশটুকু দেয়, ইহা ব্যতীত উহাদের আর কোন তাৎপর্য তাঁহার নিকট ছিল না। তাঁহার নিকট ঐ-সকল ঘটনা কোনক্রমেই অলৌকিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। ঐরূপ অতিপ্রাকৃত কার্যের জন্য ভগবান বুদ্ধ কোন ভিক্ষুর সন্ন্যাসের পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়াছিলেন—এবং এই

গল্পটি তাঁহার নিকট বুদ্ধজীবনের অপরাপর ঘটনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী বোধ হইত। খ্রীস্টান বাইবেলে যে মহাপুরুষের লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, কতকগুলি অদ্ভুত কর্মের দ্বারা লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা না করিলে, ঐ চরিত্র তাঁহার নিকট অধিকতর সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হইত। এই বিষয়ে পরবর্তী কালে স্বামী সদানন্দ আমাকে যাহা দেখাইয়া দেন, সম্ভবতঃ তাহাই সত্য—অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধিক পার্থক্যের ন্যায় একটা মানসিক ধাতুগত পার্থক্যও আছে। পশ্চিম এশিয়া চিরকাল শক্তি অথবা সিদ্ধাই-এর একটা নিদর্শন চায়, কিন্তু পূর্ব এশিয়া উহা বরাবর ঘৃণা করে। স্বামী সদানন্দের মতে, এই বিষয়ে মোঙ্গলীয় ও সেমিটিকদিগের ধারণা বিশেষরূপে পরস্পরবিরোধী; আর আর্যগণ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া উহার ঔচিত্য সম্পর্কে বিচার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপারে আধুনিক কালের আগ্রহই অনেক পরিমাণে এই অনিষ্টকর ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, প্রাচ্য মানব এক দুর্বোধ্য প্রকৃতির জীব, মানবজাতির সাধারণ ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত তার যেন কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহাদের শরীর যেন অলৌকিক শক্তির গুপ্ত বৈদ্যুতিক আধার। স্বামীজীর নিকট এ-সকল ছিল ঘৃণার বস্তু। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সকলে বুঝুক যে—ভারতবর্ষ মানুষের দ্বারাই অধ্যুষিত; ভারতবাসীদের চরিত্র প্রকৃতই গভীরভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; এবং তাহাদের সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য-সূচক, কিন্তু সকল মানুষের ন্যায় তাহারাও সর্বতোভাবেই মানুষ, এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় সকল কর্তব্য, অধিকার বোধ ও সুখদুঃখ তাহাদেরও আছে।

অতীতে ভারতীয় ঋষিগণ ভারতবাসীর নিকট যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উদারহৃদয় স্বামীজী পাশ্চাত্যগণের নিকট সেই ধর্মই প্রচার করেন, উহা হইল, মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব, এবং যে কোন আকারের নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার মাধ্যমে উহার উপলব্ধি—ইহাই তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মর্মকথা। বাহ্য জগতের যে জীবনে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে সার জ্ঞান করিয়া তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হওয়া—স্বামীজীর মতে উহা কেবল সম্মোহন বা স্বপ্নমাত্র; কোনক্রমেই মহৎ ভাবযুক্ত নহে। প্রাচ্যবাসীর ন্যায় পাশ্চাত্যবাসীরও আত্মার আকাঙ্ক্ষা—এই স্বপ্ন ভাঙিয়া ফেলা, এক গভীরতর এবং অধিকতর শক্তিশালী বাস্তব সত্তায় জাগ্রত হওয়া। সকল মানবের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সেই অনন্ত শক্তি—তাঁহার এই বিশ্বাস তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন ভাবে প্রকাশ করিতে চাহিতেন। একবার তিনি বলেন, "সত্য বটে, আমার নিজের জীবন

এক মহাপুরুষের প্রতি প্রগাঢ় ভাবাবেগের অনুপ্রেরণায় পরিচালিত, কিন্তু তাতে কি ? অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি শুধু এক ব্যক্তির মধ্য দিয়েই প্রচারিত হয় না !"

তিনি আবার বলেন, "সত্য বটে, আমি বিশ্বাস করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন একজন আপ্তপুরুষ—ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু, আমিও ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তুমিও ঐরূপ অনুপ্রাণিত। আর তোমার শিষ্যেরাও ঐরূপ হবে, তারপরে তাদের শিষ্যেরাও—এইভাবে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে !"

পরীক্ষা দ্বারা যাহারা উপযুক্ত প্রমাণিত হইবে, তাহাদেরই কেবল সত্যের উপদেশ প্রদান করা হইবে—প্রাচীনকালে আচার্যদের এই নিয়ম সম্পর্কে এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে স্বামীজী অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া ওঠেন, "দেখতে পাচ্ছ না, রহস্যব্যাখ্যার নাম করে সত্যকে জনকয়েক লোকের মধ্যে আটকে রাখবার যুগ চলে গেছে? ভালোর জন্যই হোক, অথবা মন্দের জন্যই হোক, সেদিন বিলীন হয়ে গেছে, আর কখনো ফিরবে না। ভবিষ্যতে সত্যের দ্বার সকলের নিকট উদ্ঘাটিত থাকবে !"

ইউরোপীয়দের প্রবর্তিত ধর্মভাব ও সম্প্রদায়সমূহের দ্বারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিবার প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্বামীজী অপূর্ব কৌতুক সহকারে বলিতেন যে, উহা এক জাতির কল্যাণকল্পে অপর এক জাতির উচ্ছেদসাধন বা শোষণের এক সুদীর্ঘ উদ্যমের চরম পরিণতিমাত্র। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ঐরূপ ইউরোপীয় নেতৃত্বকে তিনি কদাপি গুরুত্ব প্রদান করিতেন না।

সর্বোপরি, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক কর্তৃক দেশবিদেশে প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণের প্রতি মহান ভার অর্পণের ন্যায় তাঁহার স্বজাতির ইতিহাসের আর কোন ঘটনাই তিনি বারংবার উল্লেখ করিতেন না। যাঁহারা বিভিন্ন দেশে বুদ্ধের ধর্ম বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, তাঁহাদের প্রতি সেই পরাক্রমশালী সম্রাট বলিয়াছিলেন, "মনে রাখবেন, সকল স্থানেই ধর্ম ও সদাচারের কিছু বীজ আপনারা দেখতে পাবেন। দেখবেন, আপনারা যেন ঐ-সকল পোষণ করেন এবং কখনো নষ্ট না করেন।" এইরূপে অশোক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, সমগ্র জগৎ একদিন বিভিন্ন ভাবরাশির দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত হইবে—যে-সকল ভাব সর্বদাই চরম সত্যলাভ ও আদর্শ চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রচেষ্টায় পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত। কিন্তু অশোকের ঐ স্বপ্ন সফল হইবার পথে অন্তরায় ছিল, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান এইরূপ অর্ধজানিত বিশাল বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও গমনাগমনের জন্য প্রাচীনকালের পথ ও যানবাহনের অসুবিধা। সুতরাং তাঁহার

সঙ্কল্পিত সংযুক্ত জগৎ গঠনের প্রাথমিক ধাপগুলি সম্পন্ন করিতেই স্বভাবতঃ এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল যে, বিশ্বাস ও শক্তির যে প্রথম আবেগ ঐ কার্যের সূত্রপাত করে, ইতিমধ্যে তাহার হয়তো বিলোপ ঘটিবে। সম্ভবতঃ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াই আমরা যখন কাঠগুদাম পার হইয়া উপরে অবস্থিত গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিলাম, তখন একদিন দীর্ঘকাল গভীর চিন্তার পরে সহসা উর্ধ্বে তাকাইয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "বৌদ্ধদের যে কল্পনা ছিল আধুনিক জগৎই কেবল তার উপযুক্ত হয়েছে। আমাদের পূর্বে আর কেহই ঐ কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পায়নি।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বামীজী বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন

স্বামীজীর জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তিই ছিল সর্বপ্রধান বিচারমূলক অনুরাগ। সম্ভবতঃ ভারতের এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে আনন্দ প্রদান করিত। তিনি বলিতেন, "ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সম্পর্কেই আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানি, কারণ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের শত্রু মিত্র দুই-ই ছিল।"তাঁহার আদর্শ পুরুষের (বুদ্ধের) চরিত্রে যে পূর্ণ বিচারবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বার বার তিনি সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধ কেবল আর্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নহেন, পরন্তু জগতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্পূর্ণ স্থির-মস্তিষ্ক ছিলেন। তিনি কেমন পূজা গ্রহণে অস্বীকার করেন? কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যে তাঁহাকে পূজা করা হইয়াছিল, সে বিষয়ে স্বামীজী কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি বলিতেন, "বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, এক উচ্চ অবস্থা বিশেষ। এস, সকলেই ঐ অবস্থা লাভ কর। এই নাও তার চাবি!"

আজগুবী ব্যাপার সম্পর্কে সাধারণের যে ঔৎসুক্য, বুদ্ধ তাহার প্রতি এত বীতস্পৃহ ছিলেন যে, জনতার সমক্ষে একটা লম্বা খুঁটির উপর হইতে কেবল শব্দের দ্বারা

মণিমুক্তাখচিত একটি বাটি নামাইয়া আনার জন্য এক যুবককে সঙ্ঘ হইতে নির্মমভাবে বাহির করিয়া দেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ধর্মের সহিত বুজরুকির কোন সম্পর্ক নাই।

এই আনন্দময় পুরুষের কি অসাধারণ স্বাধীনতাবোধ ও নিরভিমানতা ছিল! বারনারী অম্বাপালীর নিমন্ত্রণে তিনি যোগ দেন। মৃত্যু ঘটিতে পারে জানিয়াও তিনি এক অন্ত্যজের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করেন, কারণ তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দীন-হীন ব্যক্তিগণের সহিত সংযোগস্থাপনই যেন তাঁহার জীবনের শেষকার্য হয়। অতঃপর যাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে মহাপরিনির্বাণলাভে সহায়তার জন্য সৌজন্যপূর্ণ বার্তা পাঠান। কি প্রশান্ত! কি পুরুষোচিত আচরণ! সত্যই তিনি ছিলেন পুরুষর্ষভ এবং অশেষ গুণাকর।

আবার তাঁহার মধ্যে যেমন বিচারশক্তির পূর্ণতা ঘটিয়াছিল, তেমনি তিনি ছিলেন আশ্চর্য দয়ার আধার। রাজগৃহে ছাগগুলির জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। একবার এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য নিজ শরীর দান করিতে চাহিয়াছিলেন। পাঁচশতবার পরার্থে জীবন বিসর্জনের ফলেই ধীরে ধীরে সেই অপার পবিত্র করুণার উদ্ভব হয়, এবং উহাই তাঁহাকে বুদ্ধত্বে উপনীত করে।

জনৈক যুবক সম্বন্ধে তিনি যে গল্পটি বলেন, তাহা হইতে বহুযুগের ব্যবধানেও আমরা তাঁহার রসজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস পাই। যাহাকে জীবনে দেখে নাই, এবং যাহার নাম পর্যন্ত শোনে নাই, এইরূপ এক নায়িকার প্রতি ঐ যুবক গদগদভাবে নিজের প্রেম ব্যক্ত করিতেছে—এই কষ্টকর অবস্থাকে তিনি মানবের ঈশ্বর সম্পর্কে নানা উক্তির সহিত তুলনা করেন। একমাত্র তিনিই ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গ-নরকাদি কল্পনা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হন। অথচ উহা দ্বারা তাঁহার শক্তি এবং মানবহৃদয়ে তাঁহার প্রাণস্পর্শী আবেদন কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। উহার কারণ তাঁহার নিজের মহান ব্যক্তিত্বপূর্ণ ক্ষমতা এবং সমসাময়িক ব্যক্তিগণের উপর উহার অসীম প্রভাব।

এক সন্ধ্যায় স্বামীজী, বুদ্ধের সহধর্মিণী যশোধরার নিকট বুদ্ধের জীবনকাহিনী যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার একটি কাল্পনিক চিত্র আমাদের কয়েকজনের নিকট বর্ণনা করেন। ইতিহাসের শুষ্ক অস্থি ঐরূপ পরিপূর্ণ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হইতে আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। স্বয়ং হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল যে, বুদ্ধের ন্যায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তির "পরিণয় সম্পর্কে ইউরোপীয়দের মতো ধারণা" থাকিবে, এবং তিনি

স্বয়ং দেখিয়া পাত্রী নির্বাচন করার ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিবেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও বাগ্‌দানের প্রত্যেকটি ঘটনা স্বামীজী বিশদভাবে ও দরদের সহিত বর্ণনা করিলেন। অতঃপর উভয়ের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন এবং অবশেষে সেই বিখ্যাত বিদায়রজনীর চিত্র বর্ণিত হইল। দেবগণ গাহিলেন,"জাগো, হে প্রবুদ্ধ! ওঠ এবং জগৎকে সাহায্য কর!" রাজপুত্রের মনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল, বার বার তিনি নিদ্রিত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে প্রত্যাগত হইলেন। "কি সেই সমস্যা—যা তাঁকে বিচলিত করিয়াছিল! তিনি যে তাঁর পত্নীকেই জগতের কল্যাণের জন্য বলি দিতে উদ্যত হয়েছেন! তার জন্যই এই সংগ্রাম! নিজের কথা তিনি একেবারেই ভাবছিলেন না।"

অতঃপর তাঁহার জয়লাভ এবং তাহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ বিদায় গ্রহণ, এবং অতি সন্তর্পণে রাজপুত্রীর চরণচুম্বন—এত সন্তর্পণে যে, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। স্বামীজী বলিলেন, "তোমরা কি কখনো বীরদের হৃদয়ের কথা চিন্তা করনি? তাঁহার হৃদয় মহৎ, অতি মহৎ। সে মহত্ত্বের তুলনা নেই, আবার তা ননীর মতোই কোমল!"

দীর্ঘ সাতবৎসর পরে রাজপুত্র—তখন তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত—কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যেদিন তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, সেইদিন হইতে যশোধরাও তাঁহার নারীজনোচিত উপায়ে স্বামীর ধর্মজীবনের অনুবর্তনকারিণী। তাঁহার পরিধানে কষায় বসন, আহার কেবল ফলমূল, অনাবৃত স্থানে ভূমিশয্যায় শয়ন। বুদ্ধ প্রবেশ করিলেন, যশোধরা প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় তাঁহার বস্ত্রের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিলেন। ভগবানও তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে সত্য উপদেশ দিলেন।

উপদেশ প্রদানের পর তিনি উদ্যানে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে যশোধরার চমক ভাঙিল। তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শীঘ্র যাও, তোমার পিতার নিকট গিয়ে পিতৃধন চেয়ে নাও।"

শিশু যখন প্রশ্ন করিল, "মা, এঁদের মধ্যে আমার পিতা কে?" যশোধরা গর্বের সহিত উত্তরে কেবল এইটুকু বলিলেন, "যিনি সিংহের ন্যায় রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন, তিনিই তোমার পিতা!"

শাক্যবংশের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার তখন পিতার নিকট গিয়া বলিল, "পিতা, আমাকে আমার পিতৃধন দিন!"

বালক তিনবার বুদ্ধের নিকট ঐরূপ ভিক্ষা করিলে বুদ্ধ আনন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওকে দাও!' তখন বালককে গৈরিক বস্ত্র প্রদান করা হইল।

তারপর যশোধরাকে দেখিয়া এবং স্বামীর নিকট থাকিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিয়া প্রধান শিষ্য ভগবানকে বলিলেন, "ভগবান, স্ত্রীলোকেরাও কি সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারেন ? আমরা কি এঁকেও গৈরিক বস্ত্র প্রদান করব ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "জ্ঞানে কি কখনো লিঙ্গভেদ থাকতে পারে ? আমি কি কখনো বলেছি যে, স্ত্রীলোকের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার নেই ? কিন্তু আনন্দ, এ প্রশ্ন তোমারই উপযুক্ত।"

এইরূপে যশোধরাও শিষ্যারূপে গৃহীত হইলেন। অতঃপর সেই দীর্ঘ সাত বৎসরের অবরুদ্ধ প্রেম ও করুণা জাতক-কাহিনীগুলিতে প্রবাহিত হইল ! কারণ, ঐগুলি সবই যশোধরার জন্য ! পাঁচ শতবার উভয়েই অহংভাবনা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা উভয়ে একত্রে চরম পূর্ণত্বলাভ করিবেন।

"হাঁ, হাঁ, এইরূপই হয়েছিল ! যশোধরা এবং সীতার পক্ষে তাঁদের প্রেমপরীক্ষার জন্য একশ বছর যথেষ্ট সময় নয়।"

ক্ষণকাল নীরবতার পর আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিতে গিয়া স্বামীজী আপন মনে বলিলেন, "না, না, এস, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, আমাদের মধ্যে এখনো কামক্রোধাদি বর্তমান ! এস, আমরা প্রত্যেকেই বলি, 'এখনো আমি আদর্শ অবস্থায় উপনীত হইনি।' কেউ যেন অপর কোন ব্যক্তিকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতে সাহস না করে !"

যৌবনের প্রারম্ভে আমাদের গুরুদেব যখন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করিতেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের আদেশে এই সময়ে বুদ্ধগয়ার বৃহৎ মন্দিরের পুনরুদ্ধার[১] কার্য চলিতেছিল, এবং বাঙালী পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত কার্যে যোগদান করায় সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে গভীর আগ্রহ দেখা যায়। অধিকন্তু ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে সার এড্‌উইন আর্ণল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজীভাষী দেশগুলিতে অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকের কল্পনাও বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়। ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ স্থল অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ বলিয়া কথিত। কিন্তু স্বামীজী কখনও অপরের মুখে কিছু শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন না, এবং এই বিষয়েও

১ উক্ত বৃহৎ মন্দিরের চারিদিকে খননকার্য ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় সরকার কর্তৃক প্রথম আরম্ভ হয়। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার উহার ভার গ্রহণ করেন, এবং ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে উহা শেষ হয়।

তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই ; অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত একত্র কেবল 'ললিত বিস্তর' নহে, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতার'[১] মূল সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করেন।[২] তাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিই পালিভাষা বুঝিতে সাহায্য করে, কারণ পালিভাষা সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলী এবং 'লাইট অব এশিয়া'র অধ্যয়ন স্বামীজীর জীবনের স্বল্পকাল স্থায়ী ঘটনামাত্র হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিষ্যরূপে অবস্থানকালে তাঁহার এই প্রধান শিষ্যের সূক্ষ্মভাবপ্রবণ চিত্তে এইরূপে যে বীজ উপ্ত হয়, তাহা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পভারে বিকশিত হইয়া উঠে। কারণ, ঐ সময়ে তাঁহার প্রথম কার্য হইল অবিলম্বে বুদ্ধগয়া গমন, এবং সেই মহাবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আপনমনে চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাওয়া, "এ কি সত্যই সম্ভব, তিনি যে বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, আমিও সেই বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করছি?—যে ভূমির উপর তিনি বিচরণ করেছিলেন, আমিও তার উপরেই বিচরণ করছি?"

তাঁহার জীবনের শেষভাগে—তাঁহার উনচল্লিশ বৎসরের জন্মদিনের প্রাতঃকালে তিনি অনুরূপভাবে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হন। কাশী দর্শনান্তে এই যাত্রার শেষ হয়, এবং ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ ভ্রমণ। তাঁহার ভারত পর্যটনের বৎসরগুলিতে কোন সময়ে তিনি বুদ্ধের ভস্মাবশেষ অস্থি স্পর্শ করিবার অনুমতি লাভ করেন—সম্ভবতঃ যে স্থানে ঐসকল অস্থি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহারই সন্নিকটে। ঐ সময় তিনি যে প্রবল ভক্তি ও নিঃসংশয়তার ভাবে বিশেষ অভিভূত হইয়াছিলেন, পরবর্তী কালে ঐ ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে তাহার কিছুটা প্রকাশ সর্বদাই দেখা যাইত। অবতারগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা সম্বন্ধে একবার তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক ; তিনি বলেন, 'সত্য বলতে কি মহাশয়া, ন্যাজারেথবাসী ঈশার সময়ে আমি যদি জুডিয়ায় বাস করতাম, তাহলে চোখের জল দিয়ে নয়, হৃদয়ের শোণিতে আমি তাঁর পা-দুখানি ধুয়ে দিতাম।"

তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ঠিক না জানিয়া, একজন ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে বৌদ্ধ বলায় তিনি বলিয়া উঠেন, "বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের দাসানুদাসের দাস!" বুদ্ধের প্রতি তাঁহার

---

১ যাহা বুদ্ধিবৃত্তির পারে অতীন্দ্রীয় রাজ্যে লইয়া যায়।

২ এই দুইখানি পুস্তক তখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষ সম্পাদকতায় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য গ্রন্থের মূল পালির পরিবর্তে সংস্কৃত অক্ষরে ছিল।—স্বামী সারদানন্দ

ভক্তি এরূপ প্রগাঢ় ছিল যে, বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী হওয়াও যেন তাঁহার নিকট এক উচ্চ অবস্থায় উপনীত হওয়া বোধ হইত—যেন তিনি উহাও দাবি করিতে পারেন না।

বুদ্ধের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যই কেবল তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই। আর একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট গুরুদেবের জীবনের সহিত আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার এই সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের বহু পরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবান বুদ্ধের জীবনে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ; শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি দেখিয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধকে।

একদিন বুদ্ধের দেহত্যাগের দৃশ্য বর্ণনা করিতে করিতে চকিতের ন্যায় তাঁহার মনে এই চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—কিরূপে এক বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য কম্বল বিছানো হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দময় পুরুষ "সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া" মৃত্যু-প্রতীক্ষায় রত, এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিল উপদেশ গ্রহণের জন্য। শিষ্যগণ তাঁহাদের প্রভুর মৃত্যুশয্যার নিকট যেরূপে হউক শান্তিরক্ষা করিবার জন্য ঐ ব্যক্তির সেই সময়ে আগমন অনুচিত ভাবিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছিলেন, কিন্তু ভগবান দূর হইতে তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরিয়ে দিও না! তথাগত[১] সর্বদাই প্রস্তুত।" তিনি কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন। চারবার এইরূপ ঘটিল ; তখনই কেবল বুদ্ধ ভাবিলেন, 'এখন আমি নিশ্চিন্তচিত্তে মরতে পারি।' তাহার পূর্বে নহে। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু প্রথমে তিনি ক্রন্দন করার জন্য আনন্দকে তিরস্কার করেন। বললেন, বুদ্ধ কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়, উহা এক উচ্চ অবস্থাবিশেষ এবং যে কেহ ঐ অবস্থা লাভ করতে পারে আর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি কারও পূজা করতে নিষেধ করেন।"

অমর কাহিনী ক্রমে সমাপ্ত হইল। কিন্তু বর্ণনাকালে স্বামীজী যখন "কনুয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে তাকে উপদেশ দিলেন" এইখানে আসিয়া একটু চুপ করিলেন, এবং কথার পিঠে বলিলেন, "দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি!"—তখন শ্রোতার নিকট ঐ অংশটি সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমার মনে সেই ব্যক্তির কথা উদিত হইল, সেই আচার্যশ্রেষ্ঠের নিকট শিক্ষালাভ যাঁহার ভাগ্যে ছিল। একশত মাইল দূর হইতে তিনি

১ তথাগত শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি লব্ধসত্য, অর্থাৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। স্বামীজী বুঝাইয়া বলিলেন, "এই শব্দ অনেকটা তোমাদের ত্রাণকর্তা(Messiah) শব্দের মতো।"

আসিতেছিলেন, এবং যখন তিনি কাশীপুরে উপনীত হইলেন, তখন পরমহংসদেবের অন্তিমকাল উপস্থিত।[১] এক্ষেত্রেও শিষ্যগণ তাঁহার আগমনে বাধা দিতেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আপনা হইতে বলিলেন, "ওকে আসতে দাও, আমি ওকে উপদেশ দেব।"

বৌদ্ধমতবাদের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তাৎপর্য সম্পর্কে স্বামীজী সর্বদা মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিতেন। হঠাৎ ঐ প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং আকস্মিক উক্তিসকল দ্বারা বোঝা যাইত যে, তাঁহার মনে ঐ সম্পর্কে চিন্তা সর্বদা বিদ্যমান। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ[২] হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই হলো পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চতত্ত্ব যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, এবং পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত। এরই নাম 'মায়া'। কোন একটি বিশেষ তরঙ্গ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কারণ যা ছিল, এখন আর তা নেই। এক সময়ে সেটা ছিল, কিন্তু এখন গত। হে মানব, জেনো যে, তুমি সাগরস্বরূপ!" তিনি আরও বলিলেন, "মহর্ষি কপিলও এই দর্শনই প্রচার করেন; কিন্তু তাঁর মহানুভব শিষ্যের (বুদ্ধের) অদ্ভুত হৃদয় সেই দর্শনকে জীবন্ত করে তোলে।"

তারপর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কথাগুলি অন্তরে ধ্বনিত হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্য নীরব রহিলেন। পরে ধম্মপদ হইতে মানবাত্মার প্রতি তাঁহার অমর আদেশবাণী আবৃত্তি করিলেন, "কোন নির্দিষ্ট পথের দিকে লক্ষ্য না রেখে ক্রমাগত এগিয়ে যাও! নির্ভীক অন্তরে, সমস্ত তুচ্ছ করে একাকী গণ্ডারবৎ বিচরণ কর।" "সিংহ যেমন কোন শব্দে ভীত হয় না, বায়ু যেমন জালে বদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তুমিও তেমনি একাকী গণ্ডারবৎ বিচরণ কর।"

একদিন স্বামীজী বৌদ্ধদের প্রথম সভা এবং তাহাদের সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে বিবাদ—এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন, "তাঁদের তেজ কিরূপ ছিল, তোমরা কি তা কল্পনা করতে পার? একজন বললেন, 'আনন্দই সভাপতি হবে, কারণ সেই তাঁকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসত।' কিন্তু আর একজন অগ্রসর হয়ে বললেন, 'তা হবে না! কারণ আনন্দ তাঁর মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন করার অপরাধে অপরাধী।' সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হলো।"

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ঘোষের কাশীপুরস্থ উদ্যানবাটীতে মহাসমাধিলাভ করেন।

২ বিনয় পিটক—প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু বুদ্ধ মারাত্মক ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে, সমগ্র জগৎকে উপনিষদের উচ্চ আদর্শে উন্নীত করা যেতে পারে। ফলে স্বার্থপরতা সমস্ত নষ্ট করে দিল। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের চেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, কারণ তিনি দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কাজ করবার কৌশল জানতেন কিন্তু বুদ্ধের কাছে কোন আপস ছিল না। জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্বেই দেখা গেছে যে, আপস করবার জন্য অবতারপুরুষও বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছেন, বুঝতে না পেরে তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বুদ্ধ যদি মুহূর্তের জন্যও আপস করতেন, তবে তাঁর জীবিতকালেই তিনি সমগ্র এশিয়ায় ঈশ্বররূপে পূজিত হতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল, 'বুদ্ধত্ব এক উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্তি, কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়।' সত্যই, জগতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন—জগতে যত লোক জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।"

খ্রীস্টান আমরা যে যন্ত্রণাভোগকে পূজা করিতে ভালবাসি, তাহার প্রতি স্বামীজীর ঘৃণা ছিল। উহা দ্বারা ভারতের স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে অনেকে তাঁহাকে বলেন যে, বুদ্ধ ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার মহত্ত্ব অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত! ইহাকে তিনি 'রোমক বর্বরতা' বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি দেখাইয়া দেন, "সর্বাপেক্ষা নীচ ও পাশবপ্রকৃতির লোকেরাই কোন একটা অসাধারণ ব্যাপারের পক্ষপাতী। অতএব জগৎ চিরকাল বীরত্বের কাহিনী বা মহাকাব্য ভালবাসবে। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্য যে, সে কখনো 'হেঁট মুণ্ডে গভীর অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন (Hurled headlong down the steep abyss)', এই রকম রচনার স্রষ্টা মিল্টনের মতো কবি প্রসব করেনি। ঐ কাব্যের সবটার বদলে ব্রাউনিঙ-এর দুই-এক ছত্র কবিতা পাওয়া গেলেও লাভ!" তাঁহার মতে খ্রীস্টজীবনের কাহিনীগুলির মধ্যে এই মহাকাব্যোচিত শক্তি বা তেজই রোমকদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ঐ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাই রোমীয় জগতের সর্বত্র খ্রীস্টধর্ম প্রসারিত হওয়ার কারণ। তিনি পুনরায় বলিলেন, "এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, পাশ্চাত্যবাসী তোমরা বড় বড় কাজ দেখতে চাও! জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে যে কবিত্ব নিহিত থাকে, তা তোমরা এখনো অনুভব করতে পার না। মৃতপুত্র ক্রোড়ে তরুণী মাতার বুদ্ধের নিকট আসা—এ কাহিনীর মতো আর কোন্ কাহিনীর মাধুর্য বেশি? অথবা, ছাগশিশুদের জীবনরক্ষার গল্পটি? তোমরা জান যে, মহাভিনিষ্ক্রমণ ব্যাপারটি

ভারতে কিছু নূতন নয়। গৌতম ছিলেন এক সামান্য রাজার পুত্র। তাঁর পূর্বে অনেকে ঐরূপ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চলে গেছে। কিন্তু নির্বাণের পর, আহা! দেখ কি কবিত্ব।

"এক বিরামহীন বর্ষণের রাত্রি। তিনি এক গোপের কুটিরে এসে ছাঁচের নিচে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন। ছাঁচ থেকে বৃষ্টির জল ঝরছে। প্রবল বৃষ্টি পড়ছে, এবং বাতাসের বেগ বাড়ছে।

"কুটিরের ভেতর গোপ জানালার মধ্য দিয়ে চকিতের ন্যায় একখানি মুখ দেখতে পেল। মনে মনে সে বললে, 'বেশ, বেশ! গেরুয়াধারী! থাকো ওখানে, তোমার পক্ষে ঐ যথেষ্ট।' তারপর সে গান আরম্ভ করে দিল, 'আমার গরুবাছুর নিরাপদে ঘরে উঠেছে, আগুনও খুব জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদ, ছেলেমেয়েরাও সুখে নিদ্রা যাচ্ছে! সুতরাং মেঘেরা, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করতে পার!'

"বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, 'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত; আমার হৃদয় দৃঢ়। অতএব মেঘেরা, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করতে পার!'

"তারপর গোপ আবার গাইল, 'ক্ষেতে ফসলকাটা শেষ, খড়গুলিও খামারে ভাল করে রাখা আছে; নদী পরিপূর্ণ, আলগুলি বেশ দৃঢ়। সুতরাং মেঘেরা, ইচ্ছা হলে তোমরা আজ রাত্রে বর্ষণ করতে পার!'

"এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর, অবশেষে বিস্মিত ও অনুতপ্ত হয়ে গোপ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।[১]

"অথবা নাপিত উপালির[২] আখ্যান অপেক্ষা সুন্দরতর আর কিছু হতে পারে কি?—

"ভগবান আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; আমি একজন সামান্য নাপিত আমারও বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন! আমি দৌড়ে গেলাম। কিন্তু তিনি নিজেই ফিরলেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"আমি এক নগণ্য নাপিত, আমার জন্য অপেক্ষা করলেন!

আমি বললাম, প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি কি?

১ স্বামীজী এখানে সুত্তনিপাতের অন্তর্গত ধনিয়া সুত্তের Rhys Davids-কৃত পদ্যের অনুবাদের ভাবার্থ তাঁহার স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন; Rhys Davids-এর আমেরিকার বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য।

২ 'উপালি পৃচ্ছা' নামক গল্পটি প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থে যে আকারে প্রকাশিত হয়, অধুনা তাহা লুপ্ত। কিন্তু ঐরূপ একটি রচনার অস্তিত্ব 'বিনয় পিটক' প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে উহার উল্লেখ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

তিনি বললেন, হাঁ।

আমি নাপিত, আমাকেও 'হাঁ' বললেন!

আমি বললাম, নির্বাণ কি আমাদের মতো লোকদের জন্যও?

তিনি বললেন, নিশ্চয়!

আমি নাপিত, আমার জন্যও!

তারপর আমি বললাম, 'প্রভু, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?'

উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয় পার।

আমি যে নাপিত, সেই আমাকেও অনুমতি দিলেন!

আমি আবার বললাম, প্রভু, আমি আপনার নিকট থাকতে পারি?

তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে থাকতে পার।

আমি এক দরিদ্র নাপিত, আমাকেও তিনি তাঁর কাছে থাকবার অনুমতি দিলেন!"

একদিন স্বামীজী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ বলেন যে, বৌদ্ধধর্মের তিনটি যুগের মধ্যে—পাঁচশত বৎসর বুদ্ধোক্ত বিধিসমূহের যুগ, পাঁচশত বৎসর প্রতিমা পূজার এবং পাঁচশত বৎসর তন্ত্রের যুগ। সহসা ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "কখনো ভেবো না যে, ভারতে কোনকালে বৌদ্ধধর্ম বলে কোন পৃথক ধর্ম ছিল, আর তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিত প্রভৃতি ছিল! একেবারেই নয়। বৌদ্ধধর্ম চিরকাল ছিল হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেবল একসময়ে বুদ্ধের প্রভাব অত্যধিক হয়ে উঠে, এবং তার ফলে সমগ্র জাতি সন্ন্যাসপথ অবলম্বন করে।" আমার বিশ্বাস, বহু সময় ও অধ্যয়নের দ্বারাই কেবল এই মতবাদের সত্যতা পণ্ডিতগণের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই মতানুসারে প্রচারক প্রেরণের দ্বারা বিজিত দেশগুলিতেই বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছিল। কাশ্মীর ঐসকল দেশের অন্যতম। স্বামীজী এই সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ঐ দেশে ভারতীয় মহাপুরুষগণ বৌদ্ধধর্মের অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইবার পর স্থানীয় নাগগণ (অর্থাৎ কুণ্ডের অভ্যন্তরস্থ যে-সকল অদ্ভুত ক্ষমতশালী সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করা হইত) স্বভাবতঃ দেবত্বপদবী হইতে বিচ্যুত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, তাহাদের ঐ ক্ষমতাচ্যুতির পরেই প্রচণ্ড শীত পড়ে, এবং ভীত জনসাধারণ কর্তৃক পুরাতন কুসংস্কার ও নূতন সত্য—এই উভয়ের মধ্যে দ্রুত একটা আপসবিধান হয়। ফলে নূতন ধর্মের মহাপুরুষ অথবা গৌণ দেবতারূপে নাগগণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটে—মানব স্বভাবের এই প্রকার কার্যের দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল নহে।

বৌদ্ধধর্ম ও তাহার জননীস্বরূপ হিন্দুধর্মের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, হিন্দুরা একই আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর পরিগ্রহের দ্বারা কর্মসঞ্চয়ে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হইল, এই আপাত-প্রতীয়মান একত্ব মায়ামাত্র এবং ক্ষণিক। বৌদ্ধমতে প্রকৃতপক্ষে আমরা এ-জীবনে যে কর্ম সঞ্চিত রাখিয়া যাই, অপর এক আত্মায় উহা বর্তায় এবং আমাদের ঐ অভিজ্ঞতাসহ সে নূতন কর্মবীজবপনে অগ্রসর হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বী মতদ্বয়ের অন্তর্নিহিত গুণাবলী সম্পর্কে স্বামীজী প্রায়ই চিন্তা করিতে বসিতেন। তাঁহার মতো যাঁহাদের নিকট অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাঁহাদের, এবং উহার ছায়ায় যাঁহারা বাস করিয়াছেন—কতক পরিমাণে তাঁহাদের নিকটেও আত্মার শরীরে অবস্থিতি এক চিরযন্ত্রণাকর বন্ধন। পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা শরীররূপ কারাগারের গারদে বিদ্রোহীর ন্যায় অবিরত আঘাত হানিতেছে ; কারণ, শরীররূপ কারাগারের বাহিরে সেই শুদ্ধ, চৈতন্যময়, ভাবঘন, সদানন্দ পরম জ্যোতির্ময় ধাম সে দেখিতে পায় ঃ উহাই তাহার আদর্শ ও লক্ষ্য। এই সকল ব্যক্তির নিকট শরীর পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সহায় হওয়ার পরিবর্তে একটা আবরণ, মহা প্রতিবন্ধক! সুখ-দুঃখ সেই আদি চৈতন্যই—কেবল ব্যষ্টিচৈতন্যের পরকলার মধ্য দিয়া প্রতিভাত। সকলেরই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত—এই উভয়ের পারে যাইয়া সেই শুদ্ধ, অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা।

প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে স্বামীজীর অসহিষ্ণু উক্তিগুলির মধ্যে প্রায়ই উপরিউক্ত চিন্তা-পরম্পরা প্রকাশ পাইত। যেমন, একদিন সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য! এক জন্ম শরীর ধারণই মনে হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসর কারাগারের তুল্য ; লোকে আবার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চায়! প্রতিদিনের ভাবনা-দুশ্চিন্তাই প্রতিদিনের পক্ষে যথেষ্ট, আর অন্য দিনের ভাবনায় কাজ নেই!” তথাপি অভিজ্ঞতার এক দীর্ঘ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটি তাঁহার নিকট সকল সময়ে চিত্তাকর্ষক বোধ হইত। পুনর্জন্মবাদকে তিনি কদাপি অবিসংবাদী সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট উহা এক বিজ্ঞানসম্মত অনুবাদ মাত্র, তবে উহাতে বিশেষভাবে সন্দেহের নিরসন ঘটে। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হইতে সকল জ্ঞানের উৎপত্তি, আমাদের পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে এই মতের প্রতিকূলে স্বামীজী সর্বদাই জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দেখাইয়া দিতেন যে, পাশ্চাত্য-কথিত এই জ্ঞানোন্মেষ প্রায়ই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সুদূর অতীত জীবনে ঘটিয়া থাকে বলিয়া উহাকে আর লক্ষ্য করা যায় না।

তথাপি উভয় পক্ষের সব বক্তব্য শেষ হইবার পরেও বৌদ্ধধর্ম অবশেষে দার্শনিক তথ্য হিসাবে যথার্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে কি-না এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহের মধ্যে একই আত্মার অনুবর্তন ও অপরিবর্তনীয়তা—এই সম্পর্কে আমাদের সমগ্র ধারণা কি ভ্রান্তিমূলক নহে, যেহেতু পরিশেষে 'একই সৎ, বহু অসৎ'—এই অনুভূতির নিকট উহার পরাভব ঘটে? দীর্ঘকাল নীরবে চিন্তার পর একদিন স্বামীজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ঠিক, বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয় যথার্থ বলছে! পুনর্জন্ম মরীচিকামাত্র! কিন্তু এই অনুভূতিলাভ কেবল অদ্বৈতমার্গেই সম্ভব।"

সম্ভবতঃ বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্মের অপূর্ণতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়া স্বামীজী কৌতুক অনুভব করিতেন। হয়তো ইহা দ্বারা ইতিহাসের দুই বিভিন্ন যুগের সম্মিলন সাধিত হয় বলিয়াই তিনি এত আনন্দিত হইতেন, যেহেতু ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরটির সাহায্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি সর্বদাই বলিতেন, "বুদ্ধের হৃদয় এবং শঙ্করাচার্যের মনীষা।" বৌদ্ধ কর্মবাদের বিরুদ্ধে জনৈকা পাশ্চাত্য মহিলার যুক্তিসমূহ তিনি ঐভাবেই শ্রবণ করেন। ঐ মত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা অসাধারণ সামাজিক দায়িত্ববোধ জড়িত থাকে[১] সে কথা মহিলা ধরিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "যেখানে আমার সৎকর্মের ফল আমি ভোগ করতে পারব না, অপরে করবে, সেখানে আমি আদৌ সৎকর্ম করতে যাব কেন, তার কারণ আমি খুঁজে পাই না!"

স্বামীজী নিজে ঐ ভাবে চিন্তা করিতে একান্ত অশক্ত হইলেও উক্ত মন্তব্যে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট বোধ করেন; এবং দুই-একদিন পরে নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে বলেন, "সেদিন যে কথাটি উঠেছিল, তা বড় চমৎকার—অর্থাৎ পরের উপকার করবার কোন কারণই থাকে না, যদি যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়, তারা তার ফলভোগ না করে অপরে করে।"

স্বামীজী যাঁহাকে কথাগুলি বলেন, তিনি অশিষ্টের মতো উত্তর দেন,"কিন্তু তা নিয়ে তো তর্ক হয়নি! কথা ছিল এই যে, আমি ছাড়া অপর কেহ আমার কর্মের ফল ভোগ করবে।"

১ যদি আমরা ভাবি যে আমাদের দুষ্কৃতিসমূহের ফলভোগ আমাদের পরিবর্তে অপরে করিবে, তাহা হইলে আমাদের সৎকর্ম করিবার প্রবৃত্তি আরও দৃঢ় হয়! অপরের সম্পত্তি বা সন্তান-সন্ততি রক্ষার জন্য আমাদের যে দায়িত্ববোধ, তাহাও এই জাতীয়।

ধীরভাবে স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তা জানি, কিন্তু আমাদের পরিচিতা মহিলা যদি কথাটি ঐভাবে বলতেন, তবে তাঁর নিজের মতটি আরও যুক্তিযুক্ত হতো। ধর, তিনি ঐভাবেই প্রশ্নটি করেছেন—অর্থাৎ অপরের উদ্দেশ্যে উপকার করে আমরা বঞ্চিত হয়ে থাকি, কারণ ঐ উপকার তাদের কাছে পৌঁছায় না। দেখছ না, ওর একটিমাত্র উত্তর আছে, তা হলো অদ্বৈতবাদ! কারণ, আমরা সকলেই এক!"

তিনি কি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের হিন্দুমনের মধ্যে ঠিক এই পার্থক্যই বিদ্যমান যে, ভারতের আধুনিক ধারণায় বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধের স্থান সর্বদাই থাকিবে? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন যে, গুপ্তযুগ হইতে যে রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, অতঃপর সাধারণ লোক তাহার সহিত অশোক ও তাঁহার পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসও সংযুক্ত করিয়া দিবে? এশিয়ার পক্ষে এরূপ একটি সমন্বয়সাধনের তাৎপর্য কত ব্যাপক, বৌদ্ধদেশসমূহের ধমনীতে হিন্দুধর্ম হইতে কি নূতন প্রাণ সঞ্চার হইবে, আবার জননীস্বরূপ হিন্দুধর্মও আত্মস্থ হইয়া কন্যাস্থানীয় বৌদ্ধজাতিগুলিকে জ্ঞানামৃত পান করাইলে স্বয়ং ভারতও কত শক্তি-বীর্য লাভ করিবে—এ-সকল কথা কি স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, হিন্দুধর্মের মধ্যেই তিনি এই দুই ধর্মের দৃঢ় সম্মিলনভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জননী হিন্দুধর্মই সকল ধর্মমতকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ, কন্যা বৌদ্ধধর্ম নয়। যেহেতু তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী জননী, তাই তাঁহার ক্রোড়ে অবতারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা বিশাল-হৃদয় সেই মহামহিম বুদ্ধাবতারের স্থান চিরকালের জন্য আছে। বুদ্ধ প্রবর্তিত সম্প্রদায়গুলিকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তৎ-প্রচারিত শিক্ষার মর্ম তিনি অনুধাবন করিয়া শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণের প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহশীলা, এবং তাঁহার নিকট আনীত সকল নবজাতক সন্তানের (বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের) জন্য সহানুভূতি বা সাদর সম্ভাষণও রহিয়াছে। কিন্তু সত্যকে বুদ্ধ যে আকারে প্রচার করিয়াছেন, সত্য তাহাতেই বদ্ধ, তাহার বাহিরে নাই, কেবল সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বনেই মুক্তিলাভ সম্ভব, অথবা চরম পূর্ণতালাভের একটিই পথ বিদ্যমান—এ-সব কথা হিন্দুধর্ম কখনও বলিবে না। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সম্ভবতঃ স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ উক্তি হইল ঃ

"বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধধর্ম বলেন, 'যা কিছু দেখছ, তা সবই মায়া বলে জেনো!' আর হিন্দুধর্ম বলেন, 'জেনো যে, মায়ার

অন্তরালে রয়েছেন সেই সত্যবস্তু।' এই অনুভূতি কি উপায়ে লাভ হবে, সে সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম কোন বাঁধাধরা নিয়ম করে দেননি। বৌদ্ধধর্মের আদেশ কেবল সন্ন্যাসের দ্বারাই পালন করা চলে; হিন্দুধর্মের আদেশ জীবনের সকল অবস্থায় পালন করা যায়। হিন্দুধর্মমতে সকল মতই সেই অদ্বিতীয় সত্যে উপনীত হবার এক একটি পথ। হিন্দুধর্মের অন্যতম উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ এক ব্যাধের মুখ দিয়ে বিবৃত হয়েছে—এক পতিব্রতা নারীর নির্দেশে কোন সন্ন্যাসীর নিকট তিনি ঐ উপদেশ প্রদান করেন (ব্যাধগীতা)। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম এক সন্ন্যাসিসঙ্ঘের ধর্মে পরিণত হয়, হিন্দুধর্ম কিন্তু সন্ন্যাস-আশ্রমকে উচ্চ স্থান প্রদান করলেও চিরকাল নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিনের কর্তব্য-পালনকে—তা যেমনই হোক, ঈশ্বরলাভের পথ বলে নির্দেশ দিয়ে আসছে।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী

আমাদের জীবনে কতকগুলি গভীর বিশ্বাসের মূলে এমন সব ঘটনা থাকে, যাহা স্বভাবতই আমাদের ছাড়া অপর কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন উদ্দেশ্য অথবা ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে মুহূর্তকাল মধ্যে আমাদের যে ধারণা জন্মে, তাহা ঠিক ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে অপরকে বুঝানো যায় না। আমাদের মনে কিন্তু উহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। ঘটনা সত্য অথবা মিথ্যাও হইতে পারে—অর্থাৎ হয়তো উহা এমন এক সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা অল্প সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। অথবা উহা আবেগপ্রসূত মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র। ঘটনা যাহাই হউক, যাঁহার একবার ঐরূপ অনুভূতি হইয়াছে, তাঁহার পরবর্তী জীবনের চিন্তাধারা ঐ ব্যক্তিগত প্রবল অনুভূতিদ্বারা অনুরঞ্জিত হইবেই। সৌভাগ্যক্রমে বাহ্য ঘটনার সহিত মিলিয়া গেলে অপরের নিকট উহা জ্ঞান বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, আর দুরদৃষ্টিবশতঃ মিল না হইলে মাথার খেয়াল বলিয়া গণ্য হইবে। সেইরূপ, তর্কের খাতিরে আমরা যদি পুনর্জন্মবাদ সত্য বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমরা বুঝিতে পারি যে, কয়েকজন ব্যক্তির নিজ নিজ অন্তরে সঞ্চিত সুপ্ত স্মৃতিভাণ্ডারে অবগাহন করিবার

ক্ষমতা আছে, যাহা অপরের নিকট দুঃসাধ্য। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অবগাহনের ফলে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের আভাস পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, যদিও বিশুদ্ধ কল্পনা ও ইহার মধ্যে যে পার্থক্য অবস্থিত, তাহা সেই ব্যক্তির পক্ষেই কেবল উপলব্ধি করা সম্ভব, যিনি ঐ আন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন।

আমার গুরুদেবের মন ও চিন্তার উপর যে তিনটি অদ্ভুত স্বসংবেদ্য অনুভূতি সন্দেহাতীতরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেগুলি সম্পর্কে বিশেষরূপে অবহিত হইবার জন্য কতকটা ঐ ধরনের চিন্তার প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রধান হইল—ধ্যানযোগে সিন্ধুনদতীরে বৈদিক ঋক্-মন্ত্র আবৃত্তিরত এক বৃদ্ধের দর্শনলাভ। উহা হইতেই তিনি তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তির নিজস্ব অদ্ভুত রীতি শিক্ষা করেন। ঐ শিক্ষারীতি সাধারণ বেদোচ্চারণপ্রণালী অপেক্ষা অনেকাংশে গ্রেগরি-প্রবর্তিত সাদাসিধা সুরের[১] সদৃশ। তিনি সর্বদা বিশ্বাস করিতেন যে, এইভাবেই তিনি আর্য পূর্বপুরুষগণের সঙ্গীতসুরের পুনরুদ্ধার করেন। শঙ্করাচার্যের কবিতার মধ্যে তিনি এমন কিছু দেখিতে পান, যাহার সহিত এই আবৃত্তিকরণ-প্রণালীর আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আচার্য শঙ্করও তাঁহারই মতো কোন প্রকার দিব্য-দর্শন হইতেই বেদমন্ত্র-উচ্চারণ রীতির ইঙ্গিত লাভ করিয়া থাকিবেন।[২]

তাঁহার কিশোর বয়সে আর একটি অনুরূপ অভিজ্ঞতা উপস্থিত হয়। তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেছেন। একদিন বাড়িতে নিজের ক্ষুদ্র পাঠকক্ষে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার সামনে এক দীর্ঘাকৃতি বিশালবপু পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার মুখমণ্ডলে এরূপ স্থির, গভীর শান্তি বিরাজমান ছিল যে, তাঁহার দিকে চাহিয়া তরুণবয়স্ক স্বামীজীর মনে হইল, অনন্তকাল ধরিয়া তিনি যেন সুখ এবং দুঃখ উভয়ই বিস্মৃত হইয়াছেন। সাধক আসন

---

১ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ প্রথম গ্রেগরি রোমান-ক্যাথলিক উপাসনার অঙ্গস্বরূপ উক্ত-সুরের প্রবর্তনা করেন। ঐ সুর সাদাসিধা অথচ গম্ভীর, এবং উহাতে আরোহ-অবরোহ অধিক নাই।—অনুঃ

২ স্বামী সারদানন্দ বলেন, স্বামীজীর ঐ দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের প্রায় দুই বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঘটে। যে মন্ত্রটি তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহা গায়ত্রী দেবীর আবাহন ঃ

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।।

ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং আগত পুরুষের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া তিনি নিশ্চলভাবে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখস্থ মূর্তি যেন কিছু বলিতে উদ্যত। কিন্তু উহাতে বালক-হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়ায় তিনি কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে গেলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। ঐ দর্শন সম্বন্ধে স্বামীজী পরে বলিতেন, বাল্যকালে তাঁহার কক্ষে ভগবান বুদ্ধই প্রবেশ করিয়াছিলেন। "আমি তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেছিলাম, কারণ আমি জানতাম তিনি স্বয়ং ভগবান।" শ্রীবুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর যে জীবন্ত, জ্বলন্ত আবেগ, তাঁহার অসাধারণ স্থির বুদ্ধি সম্পর্কে যে প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাঁহার অসীম ত্যাগ ও করুণা সম্বন্ধে যে দৃঢ় ধারণা, তাহার কতখানি সেই কৈশোরে তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের অনুভূতির মুহূর্ত হইতে উদ্ভূত, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের যতদূর জানা আছে, এই প্রকার দিব্য দর্শন তৃতীয় এবং শেষবারের মতো ঘটে স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। বুঝিতে পাবা যায় যে, ইউরোপের ক্যাথলিক দেশগুলিতে ভ্রমণকালে তাঁহার পূর্ববর্তী অপর ভারতীয়গণের ন্যায় তিনিও পরিচিত সহস্র প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে হিন্দুধর্মের সহিত খ্রীস্টধর্মের সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। খ্রীস্টানদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রুটী ও পানীয় (Blessed Sacrament তাঁহার নিকট হিন্দুদের ভোগনিবেদনের বিশদ রূপান্তর বলিয়া বোধ হইত। যাজকদিগের মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডন (tonsure) তাঁহাকে ভারতীয় সন্ন্যাসিগণের মস্তক মুণ্ডনের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। আর যখন তিনি একখানি চিত্রে দেখিতে পাইলেন যে, জাস্টিনিয়ন[১] দুইজন মুণ্ডিতমস্তক সাধুর নিকট হইতে মুসা-প্রচারিত ধর্মবিধি গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে হইল, যাজকদের মুণ্ডনপ্রথার উৎপত্তিস্থল তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিশ্চয়ই মনে ছিল, বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও ভারতে সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনী ছিল, এবং ইউরোপ থিবাইড[২] হইতে

---

১ ফ্লেভিয়াস্ এনিসিয়াস্ জাস্টিনিয়ানাস্ (৪৮২-৫৬৫) ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি। তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত নীতিসমূহ "Corpus Juris Civilis" নামে সংহত করেন এবং সেজন্যই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।—অনুঃ

২ স্টেশিয়াস-প্রণীত থীব্‌সের ইতিবৃত্তিমূলক ল্যাটিন কাব্য—খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্‌স প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসন-প্রার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধই উহার আখ্যানবস্তু।—অনুঃ

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করে; হিন্দু ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান ও গীতবাদ্য আছে। ক্যাথলিকদের মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলিদ্বারা অঙ্গে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করিতে দেখিয়া তাঁহার হিন্দুদের পূজাদিতে ন্যাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। অতঃপর যখন তিনি এক গীর্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মাত্র কয়েকখানি চেয়ার রহিয়াছে, এবং ঘেরা নির্দিষ্ট আসন (pews) একেবারেই নাই, তখন তিনি এই বিষয়ের চরম নিদর্শন লাভ করেন। অবশেষে তিনি অনুভব করেন, তিনি যেন স্বদেশেই অবস্থান করিতেছেন। এখন হইতে খ্রীস্টধর্মকে আর বিদেশী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইত না।

স্বামীজীর যে স্বপ্নবৃত্তান্ত আমি বলিতে যাইতেছি, হয়তো কতকগুলি চিন্তাধারা তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে উহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। ঘটনাটি এইঃ আমেরিকায় স্বামীজীর এক ইহুদী শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীকে তিনি নিষ্ঠাবান ইহুদী সমাজের সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং অল্পবিস্তর মনোযোগসহকারে ইহুদী-ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ' অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করেন। এইরূপে, যে চিন্তার পটভূমিতে সেন্টপলের উদ্ভব, সে সম্পর্কে সাধারণ লোক অপেক্ষা স্বামীজীর ধারণা অধিকতর স্পষ্ট ছিল।

তাঁহার খ্রীস্টধর্ম আলোচনা সম্পর্কে আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমেরিকায় তিনি 'কৃশ্চান সায়েন্স' নামক আন্দোলনের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি একবার বলেন যে, সকল ধর্মেরই উৎপত্তি আলোচনা করিতে গেলে তিনটি উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—মতবাদ, কর্মকাণ্ড এবং ইন্দ্রজাল বা অলৌকিক কিছু, যাহা সাধারণতঃ ব্যাধি আরোগ্য করারূপেই প্রচারিত। লক্ষণত্রয়ের মধ্যে শেষোক্তটিকে অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ, আমার ধারণা, কতকটা তাঁহার 'কৃশ্চান সায়েন্স' এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য আন্দোলন পর্যবেক্ষণের ফল—সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা বর্তমানে ধর্মের এক নূতন মহাসমন্বয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, এবং কতকটা তাঁহার নিজের দিব্যদর্শন—যেহেতু ঐ অনুভূতি বা দর্শন বাস্তব ও জীবন্ত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলির অন্যতমরূপে চিরকাল তাঁহার স্মৃতিতে বিদ্যমান ছিল।

তখন রাত্রিকাল; নেপল্‌সে যে জাহাজে তিনি ওঠেন, তাহা তখনও পোর্টসৈয়দ অভিমুখে চলিতেছে, এমন সময়ে তিনি এই স্বপ্নটি দেখেন—এক বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "যে স্থানটি তোমাকে দেখাচ্ছি, তা ভাল করে লক্ষ্য কর। তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে। এখানেই খ্রীস্টধর্মের আরম্ভ।" খ্রীস্টধর্মের এই উৎপত্তির সমর্থন হেতু তিনি দুইটি শব্দের উল্লেখ করেন—উহার মধ্যে একটি

শব্দ 'থেরাপিউটি'—এবং উভয় শব্দই যে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহাও বলিলেন। পরবর্তী কালে স্বামীজী বার বার এই স্বপ্নের উল্লেখ ও সর্বদা শব্দদ্বয়ের ধাতুপ্রত্যয় নির্দেশ করিতেন। কিন্তু অপর শব্দটি[১] মনে হয়, আর কখনো পাওয়া যাইবে না। চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ 'থেরাপিউটি' (থেরপুত্র) শব্দের অর্থ বলিয়াছিলেন—'থের' অর্থাৎ উচ্চপদস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পুত্রগণ—পুত্র শব্দ সংস্কৃত। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বৃদ্ধ আরও বলেন, "প্রমাণ সব এখানে আছে, খুঁড়লেই দেখতে পাবে।"

স্বামীজী জাগিয়া উঠিলেন; তাঁহার বোধ হইল, উহা সাধারণ স্বপ্ন নহে। খোলা বাতাসে বেড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি কোনরকমে ডেকের উপর আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জাহাজের একজন কর্মচারী তাঁহার নির্দিষ্ট কর্ম সমাপনান্তে নিজ কামরায় ফিরিয়া যাইতেছেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কটা বেজেছে?'

উত্তর হইল, 'মধ্যরাত্রি।'

"আমরা এখন কোথায়?"

"ক্রীটের ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে।"

এই অপ্রত্যাশিত ঐক্যদর্শনে স্বামীজী বিস্মিত বোধ করিলেন, এবং স্বপ্নটির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যয় দৃঢ় হইল। এখন তাঁহার বোধ হইল, ঐ অভিজ্ঞতা এমন কতকগুলি ইঙ্গিত বহন করিতেছে, যাহা উহার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার নিকট চিরদিন অসম্বদ্ধ ও অর্থহীন বলিয়া প্রতীত হইত। পরে তিনি স্বীকার করেন, ইতিপূর্বে খ্রীস্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই; এবং এই ঘটনার পরে ঐ বিষয়ে তিনি আর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন যে, কেবল সেন্ট পল সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। 'খ্রীস্টের দ্বাদশ শিষ্যের কার্যাবলী' (Act of the Apostles) নামক গ্রন্থ 'গসপেল' চতুষ্টয় অপেক্ষা প্রাচীনতর কেন, তাহার অর্থও তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি আরও অনুমান করেন, সম্ভবতঃ খ্রীস্টের উপদেশাবলী র‍্যাবাই হিলেল(Rabbi Hillel)[২] হইতে উদ্ভূত, এবং ন্যাজারীন নামক প্রাচীন সম্প্রদায় ও সুদূর অতীতের

---

১ আমার নিজের বিশ্বাস, দ্বিতীয় শব্দটি 'Essene', কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় আমার স্মরণ নাই।

২ ইহুদী ধর্মশাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিতবর্গের অন্যতম। খ্রীস্টপূর্ব ৬০ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।—অনুঃ

গর্ভ হইতে প্রতিধ্বনিত তাহাদের সুন্দর উক্তিসমূহই খ্রীস্টের নাম ও জীবন প্রদান করিয়াছে।[১]

কিন্তু এই দর্শন তাঁহার নিজের মনের উপর অনস্বীকার্য প্রভাব বিস্তার করিলেও, অপরের নিকট উহা প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিতে যাওয়া তাঁহার বাতুলতা বলিয়া মনে হইত! তিনি মনে করিতেন, এইরূপ অনুভূতির কোন ফলাফল আছে স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত—অর্থাৎ যিনি ঐ প্রকার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারই কাজে উহা লাগিবে। ঐ স্বপ্নদর্শন প্রভাবে ন্যাজারেথবাসী ঈশার ঐতিহাসিক চরিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বামীজীর অবিশ্বাসের সম্ভাবনা থাকিলেও, ক্রীট দ্বীপ সম্ভবতঃ খ্রীস্টধর্মের জন্মভূমি একথা তিনি কখনও উল্লেখ করেন নাই। লৌকিক পণ্ডিতগণের নিকট উহা অনুমানমাত্র, যাহার সত্যাসত্য তাঁহারাই নির্ধারণ করিতে পারিবেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের সম্মিলনের সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা যাহা কেবল ভৌগোলিক ব্যাপার মাত্র, তিনি তাহারই উল্লেখ করিতেন। আর যৌক্তিকতার দিক দিয়া ঐ সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও মেরীতনয়ের প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। হিন্দুদের মতে আদর্শ হিসাবে কোন আদর্শের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, দেশকালের সহিত উহার সম্বন্ধ কতদূর সত্য, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং ভক্তিবশতঃ পুত্রক্রোড়ে খ্রীস্টমাতার (সিষ্টিন ম্যাডোনা) কোন ছবিকে আশীর্বাদ করিতে অস্বীকারপূর্বক উহার পরিবর্তে ঐ দিব্যশিশুর পাদস্পর্শ করা স্বামীজীর পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। সেইরূপ জনৈকা মহিলার প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল—"যদি আমি ন্যাজারেথবাসী ঈশার সময়ে প্যালেস্টাইনে বাস করতাম, তাহলে চোখের জলে নয়, হৃদয়ের শোণিত দিয়ে আমি তাঁর পা-দুখানি ধুয়ে দিতাম।" অধিকন্তু, এ বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্ট সম্মতিও লাভ করেন। বাল্যকালে তিনি ব্যগ্রভাবে অনুরূপ একটি প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তোমার কি একথা মনে হয় না যে, যাঁরা এই প্রকার সব জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁরা অপরের উপাসনার জন্য যে-সব আদর্শ প্রচার করতেন, নিজেরাই তাদের জীবন্ত মূর্তি ছিলেন?"

---

১ অথবা হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঈশার 'সুন্দর উক্তিগুলি' প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধেরই বাণী এব 'গসপেল'গুলিতে যে কাহিনীর উল্লেখ আছে, তাহা শুধু ঈশ্বর দর্শনের আর একটি পথ প্রদর্শন করে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নারীজাতি ও জনসাধারণ

দক্ষিণেশ্বর মন্দির জাতিতে কৈবর্ত ধনাঢ্য রানী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হয়, এবং ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের অন্যতম পূজারীরূপে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে; সম্ভবতঃ স্বামীজী নিজে সে প্রভাবের সম্যক পরিচয় পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের শিষ্যগণ যে ধর্ম-আন্দোলন সংগঠন করেন, এক হিসাবে নিম্নশ্রেণীর এক নারীই তাহার মূল কারণস্বরূপ। মানবিক দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও আসিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচারকার্যও হইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঠিক পূর্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাড়ি-নির্মাণের উপরই সমগ্র ব্যাপারটি নির্ভর করিয়াছে। তাহাও আবার নিম্নজাতির এক ধনবতী নারীর ভক্তির ফল। স্বামীজী স্বয়ং আমাদের মনে করাইয়া দিতে ভোলেন নাই যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে দৃঢ়বদ্ধ হিন্দুরাজগণ কর্তৃক এদেশ সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইলে ঐরূপ ঘটা কদাপি সম্ভব হইত না। এই ঘটনা হইতে তিনি ভারতে সার্বভৌম শাসকবৃন্দের জাতিভেদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ অর্পণ না করার গুরুত্ব অনুমান করেন।

রানী রাসমণি তাঁহার সময়ের একজন বীরপ্রকৃতির নারী ছিলেন। কিরূপে তিনি কলিকাতার জেলেদের অন্যায় করভার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখনও লোকমুখে সে গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সরকার যে বিপুল অর্থ দাবি করেন, তাহা দিবার জন্য তিনি প্রথমে স্বামীকে সম্মত করান। অতঃপর নদীর উপর দিয়া বিদেশীয় জাহাজ গমনাগমন একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেন।

সুসমৃদ্ধ গড়ের মাঠ বা ময়দানে তাঁহার অধিকৃত রাস্তা দিয়া তাঁহার পরিজনবর্গ কেন দেবপ্রতিমা লইয়া যাইতে পারিবেন না, তাহা লইয়া তিনি বেশ ভালমতো যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল, ইংরেজরা যদি ভারতবাসীর ধর্ম পছন্দ না করেন, তাহা হইলে যে পথে প্রতিমাসহ শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহার আপত্তিকর অংশের দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর তুলিয়া দিলেই হয়—উহাতে বিশেষ হাঙ্গামা কি? সেইরূপই করা হইল। ফল হইল এই যে, কলিকাতার 'রতন রো' নামক চমৎকার রাজপথটি মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। বৈধব্যদশা ঘটিবার কিছুদিন পরেই ব্যাঙ্কাবদের নিকট সঞ্চিত বিপুল অর্থ স্বহস্তে উঠাইয়া লইবার জন্য তাঁহাকে সমগ্র বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ অর্থ তিনি নিজে খাটাইবার সঙ্কল্প করেন। কার্যটি কঠিন হইলেও অসীম বুদ্ধি ও দক্ষতাসহকারে তিনি উহা সম্পাদন করেন এবং তখন হইতে সমস্ত কার্য নিজেই পরিচালনা করিতেন। বহুদিন পরে এক বড় মকদ্দমার কৌসুলীর মাধ্যমে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান ও প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করার কাহিনী আজ পর্যন্ত কলিকাতার প্রতি হিন্দুপরিবারে চলিয়া আসিতেছে।

রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন আশেপাশের সকল লোক সেই মহাসাধককে ধর্মোন্মাদ বলিয়া স্থির করে, তখন তিনিই তাঁহাকে রক্ষা করেন। কোনরূপ কাজকর্ম না করা সত্ত্বেও বরাবর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তি ও বাসস্থানের সুবিধা পাইবেন—এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দেন। এই সকল বিষয়ে মথুরবাবু তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরানীর প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতেন। প্রথমাবধি রানী রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিষয়ে অদ্ভুত প্রতিভা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেই প্রথম ধারণা অব্যাহত রাখেন।

তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুরের ব্রাহ্মণযুবকরূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, এক নিম্নশ্রেণীর নারীকর্তৃক মন্দির নির্মাণ এবং ঐ উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠভ্রাতা এবং সেজন্য প্রতিষ্ঠাদিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহাকে পূজানুষ্ঠান কার্যে সহায়তা করিতে হয়। কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রসাদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। শুনা যায়, সব শেষ হইয়া গেলে এবং সমাগত লোকজন চলিয়া গেলে গভীর রাত্রে তিনি বাজার হইতে একমুঠা ছোলাভাজা কিনিয়া আনেন এবং উহা খাইয়া সারাদিন উপবাসের পর ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন।

পরবর্তী কালে কালীবাড়িতে তিনি যে পদ অধিকার করেন, এই ঘটনাটি নিশ্চিত তাহার তাৎপর্য গভীরতর করিয়া তোলে। ভ্রমবশতঃ তিনি কদাপি কৈবর্তবংশীয়া রানীর সম্মানিত অতিথি বা তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হন নাই। আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি জানিতে পারেন, জগতে তাঁহাকে কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে, তখন ইহাও হৃদয়ঙ্গম করেন যে, বাল্যকালে পল্লীগ্রামের কঠোর আচারনিষ্ঠ অভ্যস্ত জীবন ঐ কার্যে সহায়ক না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইবে। আমরা ইহাও বলিতে পারি, তাঁহার সমগ্র জীবন এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, সামাজিক জীবনে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক, ধর্মজীবনে সকলের সমান অধিকারে তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

আমাদের গুরুদেব অন্ততঃ মনে করিতেন, তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত, তাহার ব্রত হইল নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধন। খেতড়ির রাজাকে তাঁহার বার্তা পাঠাইবার জন্য আমেরিকায় যখন তিনি ফনোগ্রাফের সামনে কয়েকটি কথা বলেন, তখন সহজ প্রেরণাবশতঃ ঐ বিষয়টি তাঁহার মনে ওঠে। বিদেশে একাকী যখনই তিনি নিজেকে মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্তী জ্ঞান করিতেন, ঐ চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত এবং নিকটে উপবিষ্ট শিষ্যকে বলিতেন, "কখনো ভুলো না, নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের উন্নতিসাধনই আমাদের মূলমন্ত্র।"

অবশ্য, বিভিন্ন দলের সংগঠনকালেই সমাজের শক্তির সর্বাধিক বিকাশ ঘটে, এবং স্বামীজী এই বিষয়টির উপর বিশেষ চিন্তা করিতেন যে. একবার কোন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইবার পর উহার মধ্যে আর প্রাণসঞ্চার অথবা অনুপ্রেরণা দান করিবার ক্ষমতা থাকে না। তাঁহার নিকট 'নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত' ও 'মৃত' সমানার্থক শব্দ। কোন সমাজ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট আকারে সংগঠিত হইয়া গেলে উহার অবস্থা সেই বৃক্ষের ন্যায় হইয়া যায়, যাহার আর বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। উহার নিকট আর কিছু প্রত্যাশা করার অর্থ মিথ্যা ভাবুকতা, এবং স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভাবুকতা হইল স্বার্থপরতা, 'ইন্দ্রিয়ের অসংযত উচ্ছ্বাসমাত্র'।

জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কে স্বামীজী সর্বদাই আলোচনা করিতেন। কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেন, বরং সর্বদাই উহার পশ্চাতে অবস্থিত কারণ অনুসন্ধান করিতেন। জাতিভেদ মানবজীবনের এক অনিবার্য ব্যাপার বলিয়া মনে করায়, উহা কেবল হিন্দুধর্মেরই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বলিয়া তিনি ভাবিতে পারিতেন না। জনৈক ইংরেজ যে একদা মহীশূরে গোবধ করিয়াছিলেন, সমবেত ভদ্রলোকদের সামনে

তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী বলিয়া ওঠেন, "স্বজাতির মতামতই কোন ব্যক্তিকে ধর্মপথে রাখবার শেষ ও শ্রেষ্ঠতম উপায়।" অতঃপর দুই-চারি কথায় তিনি দুই প্রকার আদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহার বর্ণনা দেন—একটি আদর্শ শিষ্ট ও দুষ্টের মধ্যে অথবা ধার্মিক ও নাস্তিকের মধ্যে প্রভেদ নির্দেশ করে, অপরটি এক সূক্ষ্মতর, সংগঠনমূলক নৈতিক আদর্শ, যাহা আমাদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করি, এরূপ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টা জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু এই প্রকার মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নয়। সন্ন্যাসী শুধু সাক্ষীর ন্যায় জীবনকে দেখিয়া যাইবেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। তাঁহার নিকট এমন বহু প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাহা গ্রহণ করিলে তিনি যে কোন একটি সম্প্রদায়ের নেতারূপে পরিগণিত হইতেন, কিন্তু ঐ সকল তিনি অগ্রাহ্য করেন। নারীজাতি ও জনগণকে কেবল শিক্ষা দেওয়া হউক; তাহাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে তাহারা নিজেরাই সমর্থ হইবে। স্বাধীনতা সম্পর্কে ইহাই ছিল তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইহাই তিনি আজীবন প্রচার করিয়াছেন। শিক্ষা কি ধরনের হইবে সে সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ পর্যন্ত ঐ সম্পর্কে কিছুই নির্দিষ্ট হয় নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অসতী বিধবার পাপ-আচরণ বলিয়া যাহা অভিহিত, তাহার প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিতেন ও বলিতেন, "আর যা হয় হোক, কিন্তু এটি যেন কখনো না হয়।" তাঁহার নিকট বৈধব্যের শ্বেতবাস ছিল যাহা কিছু পবিত্র ও সত্য, তাহারই প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং এই সকল ভাবের সহিত সম্পর্কশূন্য কোন শিক্ষাপ্রণালীর কথা স্বভাবতই তিনি চিন্তা করিতে পারিতেন না। চঞ্চল, বিলাসপরায়ণ ও জাতীয়তাভ্রষ্ট কোন ব্যক্তি, বাহিরের শত পারিপাট্য সত্ত্বেও, তাঁহার মতে শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত। পক্ষান্তরে, কোন আধুনিকভাবাপন্ন নারীর মধ্যে যদি সেই প্রাচীনকালের ন্যায় একান্ত নির্ভরতা ও পরম ভক্তির সহিত স্বামীর প্রতি আনুগত্য এবং শ্বশুরগৃহের পরিজনদের প্রতি পুরাকালের নিষ্ঠা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিতে তিনিই হইতেন 'আদর্শ হিন্দুপত্নী'। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক-দেখানো ব্যাপার নয়। আর প্রকৃত নারীজনোচিত গুণগুলির প্রচার ও বিকাশে সহায়তা ব্যতীত কোন স্ত্রীশিক্ষাই যথার্থ স্ত্রীশিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ভাবী আদর্শ নারীর লক্ষণগুলি যদি দৈবাৎ মিলিয়া যায়, তিনি সর্বদা তাহার সন্ধানে থাকিতেন। কিছু পরিমাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী, সেই সঙ্গে

অধিকতর বয়সে বিবাহ এবং স্বামী নির্বাচনে কতকটা ব্যক্তিগত মতামত—এসবও আসিবেই। সম্ভবতঃ অন্য উপায় অপেক্ষা ইহা দ্বারাই বাল্যবৈধব্যজনিত সমস্যাসমূহের প্রকৃষ্ট সমাধান হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, সেই যুগে অধিক বয়সে বিবাহের পরিণামস্বরূপ কতকগুলি দোষ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যেই সমাজ কর্তৃক বিশেষ বিবেচনাপূর্বক বাল্যবিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়।

ভবিষ্যতের হিন্দুনারীকে তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রাচীনকালের ধ্যানশক্তিবর্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণের আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম বিসর্জন দিয়া নহে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, যে শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্র সমাজে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা কম প্রভাব প্রয়োগ করিবে, তাহাই আদর্শ শিক্ষা। যে শিক্ষা কালে প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত যুগের নারীজাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বা মহত্ত্ব বিকাশে সহায়তা করিতে সমর্থ, তাহাই আদর্শ শিক্ষা।

অতীতকালের প্রত্যেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ পৃথকভাবে নিজ কার্য সাধন করিয়াছে। রাজপুত ইতিহাস জাতীয় আদর্শ নারীজীবনের বীরত্ব ও সাহসে পরিপূর্ণ। কিন্তু ঐ জ্বলন্ত ও দ্রবীভূত ধাতুকে এখন নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। অতীত ভারতে যত মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রানী অহল্যাবাঈ তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। দেশের সর্বত্র তাঁহার জনহিতকর কীর্তি-দর্শনে একজন ভারতীয় সাধুর পক্ষে ঐরূপ চিন্তাই স্বাভাবিক। তথাপি ভাবী নারীগণের মহত্ত্ব তাঁহার প্রতিরূপ মাত্র হইবে না; উহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। আগামী যুগের নারীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ ঘটিবে। যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক সাবিত্রীর আবির্ভাব, উহাই আদর্শ অবস্থা, কিন্তু ভবিষ্যৎ নারীর মধ্যে মলয়-সমীরের কোমলতা এবং মাধুর্যেরও বিকাশ ঘটিবে।

নারীগণকে যোগ্যতার সহিত সমাজে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অবনত হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম বা বালিকা-বিদ্যালয় ও কলেজসংক্রান্ত তাঁহার সকল পরিকল্পনায় বড় বড় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমির ব্যবস্থা থাকিত। যাহারা এই সকল স্থানে বাস করিবে, শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যানসংরক্ষণ এবং পশুপালন প্রভৃতি তাহাদের নিত্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া প্রয়োজন। এই নূতন যাত্রাপথের পটভূমি ও প্রাণস্বরূপ হইবে ধর্ম ও উচ্চলক্ষ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ—সংসার অপেক্ষা এই ধরনের বাসস্থান বা আশ্রমের মধ্যেই যাহার সমধিক বিকাশ ঘটে। এই সকল

বিদ্যালয়ের অধিবাসিনীগণ শীতঋতুর অবসানে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয়মাস হিমালয়ে অবস্থান করিয়া অধ্যয়নে রত থাকিবে। এইরূপে, এমন এক শ্রেণীর নারী সৃষ্টি হইবে, যাহারা ধর্মরাজ্যে হইবে 'বাশিবাজুকদিগের' সদৃশ[১]; এবং তাহারাই নারীজাতির সকল সমস্যার সমাধান করিবে। কর্মক্ষেত্র ব্যতীত তাহাদের কোন গৃহ থাকিবে না, ধর্মই হইবে তাহাদের একমাত্র বন্ধন, এবং ভালবাসা থাকিবে কেবল গুরু, স্বদেশ ও জনগণের প্রতি। কতকটা এইরূপই ছিল তাঁহার কল্পনা। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, বিশেষ প্রয়োজন একদল শিক্ষয়িত্রীর—এবং এইভাবেই তাহাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। শক্তি—শক্তিই একমাত্র গুণ, যাহার বিকাশ তিনি পুরুষ এবং নারী সকলের মধ্যে দেখিতে চাহিতেন। কিন্তু এই শক্তির বিন্যাস সম্পর্কে তাহার বিচার কত কঠোর ছিল ! আত্মপ্রচার অথবা ভাবোচ্ছ্বাস, কোনটাই তাঁহার নিকট প্রশংসা লাভ করিত না। প্রাচীনকালের মৌন, মাধুর্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ আদর্শ চরিত্রে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ ছিল যে, বাহিরের কোন আড়ম্বর তাঁহাকে আকৃষ্ট কবিতে পারিত না। সেই সঙ্গে বর্তমান যুগের যে চিন্তা ও জ্ঞান ভারতে বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহাতে পুরুষের ন্যায় নারীরও সম অধিকার। সত্যে কোন লিঙ্গভেদ নাই। আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহে, এরূপ কোন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। যে নারী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্র ও মনের নারীসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারিবেন ; এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বহুসংখ্যক নারী এইরূপে উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসা অর্জন করিবেন।

স্বভাবতই তাঁহার আশা ছিল, বিধবাগণের মধ্য হইতেই প্রথম শিক্ষয়িত্রীদল সংগৃহীত হইবে এবং তাঁহারা পাশ্চাত্যদেশের মঠাধিকারিণীদের অনুরূপ হইবেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এক্ষেত্রে তাঁহার নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে তিনি শুধু বলিতেন, "জাগো! জাগো! সঙ্কল্পগুলি

---

১ Bashi-Bazouks—ইহারা খলিফাদের শরীর-রক্ষক ছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া তুর্কী রক্ষীদলে যে-সকল সৈনিককে নিযুক্ত করা হইত, তাহাদের শৈশবে সকল দেশ ও জাতির মধ্য হইতে অপহরণ করিয়া আনা হইত ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিয়া লালন-পালন করা হইত। এইরূপে তাহাদের ধর্মে অতিশয় অনুরাগ এবং দেশের ও রাজার সেবাই পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনস্বরূপ ছিল। সমগ্র ইউরোপে তাহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মিশরে নেপোলিয়ান তাহাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন।

আপনা থেকেই বর্ধিত এবং কার্যে পরিণত হয়!" তথাপি কোন উপকরণ উপস্থিত হইলে—যেখান হইতেই উহা আসুক, তাঁহার সমাদর লাভ করিত। প্রত্যেক নারীর পক্ষে দৃঢ়, সবল চরিত্র, বুদ্ধিমতী এবং সত্যপথে পরিচালিত হইয়া নিজেকে উচ্চতম আদর্শের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তোলা কেন সম্ভব হইবে না, এ বিষয়ে তিনি কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। এমন কি, অসৎকার্য হেতু বিবেকের গ্লানিও অকপটতার দ্বারা দূর করিতে পারা যায়! নারীগণের উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, "সকল উচ্চ উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা চাই।" স্বামীজী স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, এবং ভারতীয় নারীজাতির প্রতি তাঁহার কোন অবিশ্বাস ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার বিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার যে কল্পনা ছিল, তাহা কোনপ্রকার আন্দোলন, হইচই বা প্রাচীন অনুষ্ঠানসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলা—এই সকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে। তাঁহার মতে যথার্থ স্বাধীনতা হইল পরোক্ষ, নীরব ও সাংগঠনিক। প্রথমে সমাজের প্রচলিত আদর্শগুলি নারীদের যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হইবে; তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণের অধিকারিণী হইবেন, জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদেশ ও সুযোগগুলি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ-সকল নির্দেশ পালন ও পূর্ণমাত্রায় সুযোগ গ্রহণের দ্বারা তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয়ভাবাপন্ন হইয়া উঠিবেন এবং অবশেষে উন্নতির এরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিবেন, অতীত ভারত যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বোধ হয়, আমাদের জাতীয় জীবনধারার অবিচ্ছিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যে স্বামীজীর স্বাধীন চিন্তার যেরূপ স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়, তেমন আর কিছুতেই নহে। কোন প্রথায় নূতন আকার তাঁহার নিকট সর্বদা প্রাচীন পবিত্র সংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ হইত। দেবী সরস্বতীর চিত্র অঙ্কন করাই তাঁহার 'দেবীর পূজা' বলিয়া মনে হইত; ভেষজ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের অর্থ "রোগ ও অপরিচ্ছন্নতারূপ দানবদ্বয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবানের নিকট নতজানু হইয়া প্রার্থনা করা।" হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতির সরবরাহ, পশুগণের জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা ও তাহাদের পরিচর্যাবিধান ইত্যাদি ভাব যে পূর্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল, প্রাচীনকালে ভক্তিভরে গোসেবা তাহারই পরিচয় প্রদান করে। তাঁহার মতে, বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষসাধনের অনুশীলন আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাদির শক্তিলাভের পক্ষে অপরিহার্য; অধ্যয়নই তপস্যা, এবং হিন্দুদের ধ্যানপরায়ণতা বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিলাভের উপায়। সকল কার্যই একপ্রকার

ত্যাগ। গৃহ ও পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসাও সর্বদা মহত্তর ও বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত হইতে পারে।

তিনি সানন্দে দেখাইয়া দিতেন যে, হিন্দুগণের চক্ষে লিখিত সকল শব্দই সমভাবে পবিত্র ; সংস্কৃত যেরূপ, ইংরেজি ও পারসিক শব্দও সেইরূপ পবিত্র। কিন্তু বিদেশী আদবকায়দা ও বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার বাহ্য চাকচিক্যের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল। কেবল বাহ্যবস্তুগুলির পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে যে-সব সমালোচনা, তাহার প্রতি তিনি আদৌ কর্ণপাত করিতে পারিতেন না। দুইটি সমাজের তুলনাকালে তিনি সর্বদা দেখাইয়া দিতেন যে, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আদর্শ বিকাশের প্রচেষ্টায় রত, এবং আধুনিককালে অথবা মধ্যযুগে হউক, এই লক্ষ্যসাধন অথবা আদর্শপ্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি তাহাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করিতেন।

সর্বোপরি, ভালবাসা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা এরূপ ছিল যে, বক্তা ও যাঁহার সম্পর্কে বলিতেন, এই উভয়ের মধ্যে তিনি কোন ভেদ স্বীকার করিতেন না। অপরের সম্বন্ধে 'তাহারা' বলিয়া উল্লেখ তাঁহার নিকট প্রায় ঘৃণাতুল্য বোধ হইত। যাহারা সমালোচনা বা নিন্দার পাত্র, তিনি সর্বদা তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন, তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি সত্যই জগৎকে ঈশ্বর ও শয়তান নামক দুই পৃথক ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া মীমাংসা করা যাইত, তাহা হইলে তিনি নিজে ঈশ্বরের সেনাপতি আর্কেঞ্জেল মাইকেলের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, যাহার উপর ঈশ্বর জয়ী হইয়াছেন, সেই চিরকালের জন্য পরাজিত শয়তানেরই পক্ষ গ্রহণ করিতেন। তিনি শিক্ষা বা সাহায্যদানে সমর্থ, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস হইতে তাঁহার এই ভাব উৎপন্ন নহে, পরন্তু কেহ যে চিরদিনের মতো দুঃসহ ক্লেশভোগে বাধ্য হইতেছে, তাহারই দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আন্তরিক দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত। চিরকালের মতো কেহ নিদারুণ দুঃখে পতিত হইয়াছে দেখিলে, তাহার সকল কষ্ট নিজে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন হইলে বিশ্বের সমগ্র শক্তি অগ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকিতেন।

তাঁহার প্রকাশিত কয়েকখানি পত্রে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দয়ারূপ ভিত্তির উপরেও মানবসেবাব্রতকে যাথার্থ্যরূপে স্থাপন করা যায় না। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বলা নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ ঐ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার তিনি আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন, অপরকে জীবজ্ঞানে সাহায্য করাকেই 'দয়া' বলিয়া অভিহিত করা হয় ; কিন্তু 'প্রেম' আত্মা জ্ঞান করিয়া সকলের সেবায় রত হয়। অতএব প্রেমই

পূজাস্বরূপ, এবং এই পূজাই ঈশ্বরদর্শনে পরিণত হয়। "সুতরাং অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রেমই একমাত্র কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার হেতু।" কোন উচ্চ সেবার ভার প্রাপ্তির সহিত অপর কোন প্রকার উচ্চ অধিকারের তুলনা হইতে পারে না। এক পত্রে তিনি বলিয়াছেন, "যিনি কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই আনন্দিত হইবার কথা, যাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে, তিনি নহেন।" মন্দিরে পূজা করিবার সময় পুরোহিতগণকে যেরূপ বাহ্যান্তরশুদ্ধি করিয়া উৎসুকভাবে অথচ সম্ভ্রমের সহিত সকলপ্রকার বাধাবিপত্তির মধ্যে অবিচলিত থাকিবার দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, স্ত্রীশিক্ষারূপ পবিত্র কার্যসাধনে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ মনোভাব লইয়া কার্যে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মহারাষ্ট্র মহিলা মাতাজী মহারানীর কথাগুলি স্বামীজী মনে রাখিয়াছিলেন এবং প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। যে ছোট ছোট মেয়েগুলিকে তিনি পড়াইতেন, তাহাদের দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, আমার কোন সহায় নেই। কিন্তু আমি এই পবিত্র কুমারীদের পূজা করি ; তারাই আমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে।"

জনসাধারণ বা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া যাহারা অভিহিত, তাহাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐ প্রকার প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সেবার ভাব প্রকাশ পাইত। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ভ্রাতাদের ন্যায় এই নিম্নশ্রেণীদেরও বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভে সম অধিকার আছে। এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলেই তাহারা স্বাধীনভাবে নিজেরাই তাহাদের ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারিবে। এই কার্যসাধন সম্পর্কে চিন্তাপূর্বক স্বামীজী কেবল বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের মহান লোকশিক্ষকগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করিতেছিলেন। যে যুগে উপনিষদের দর্শন একমাত্র আর্যদিগের বিশেষ অধিকার বলিয়া গণ্য হইত, সেই যুগে ভগবান তথাগত আবির্ভূত হইয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে ত্যাগের দ্বারা নির্বাণলাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করেন। যে দেশে এবং যে যুগে সিদ্ধ আচার্যগণ প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অতি অল্প সংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইত, সেখানে আচার্য রামানুজ কাঞ্চীনগরীর গোপুরম্ হইতে সেই সকল মহামন্ত্র পারিয়া বা চণ্ডালদের নিকট ঘোষণা করেন। ভারতে এখন আধুনিক যুগের অভ্যুদয় ; ঐহিক জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যত্বলাভের উদ্বোধন কাল। সুতরাং স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, কিরূপে জনসাধারণের মধ্যে ঐহিক জ্ঞান বিস্তার করা যায়।

অবশ্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, ভারতে ঐহিক উন্নতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রয়োজন সমগ্র জাতির শক্তি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আর তিনি বেশ জানিতেন যে, ঐহিক সম্পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সর্বাগ্রে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ঈশ্বর আমাকে ইহ জীবনে একটুকরা রুটি দিতে পারেন না, পরজীবনে তিনি আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।" সম্ভবতঃ তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র জ্ঞানবিস্তার দ্বারাই সমগ্র দেশ তাহার বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকারের প্রতি নিজ শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। যে ভাবে হউক, একমাত্র গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের জন্য বিরাট আন্দোলনের দ্বারাই সমাজের উচ্চশ্রেণীর ধমনীতে নবজীবনের সঞ্চার সম্ভব। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই নেতৃত্বের সনদ লাভ হইবে এই প্রকারের কোন ধারণা সর্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। সম্যক অনুশীলন দ্বারা পরিমার্জিত যে সাধারণ বুদ্ধিকে লোকে প্রতিভা আখ্যা দিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের ন্যায় সামান্য দোকানদার অথবা কৃষকের মধ্যেও অনুরূপভাবে সম্ভবপর। সাহস কেবল ক্ষত্রিয়ের একচেটিয়া সম্পত্তি হইলে তাস্তিয়া ভীল কোথায় থাকিত? তিনি বিশ্বাস করিতেন, বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাইবার পাত্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও মহত্ত্বের সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব হইতে বলা মানবের ক্ষমতাতীত।

তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন, ভারতের শ্রমজীবিগণকে শিক্ষা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য, অপর কাহারও নহে। বিদেশী কর্তৃক বিদেশজাত জ্ঞানের প্রবর্তনে যে অশেষ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার নিকট গোপন ছিল না। অধুনা প্রকাশিত তাঁহার পত্রগুলিতে তিনি যে ক্রমাগত ছাত্রগণকে ম্যাজিক লণ্ঠন, ক্যামেরা এবং রাসায়নিক পরীক্ষার উপযোগী কিছু কিছু উপকরণ লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শিক্ষা প্রদানের যুক্তি দেখাইতেছেন—ইহাই তাহার অর্থ। আবার, সাধুরা যখন মাধুকরী করিতে গিয়া নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের সহিত মেলামেশা করেন, তখন তাঁহারা যেন কিছু কিছু ঐহিক শিক্ষাও তাহাদের প্রদান করেন, এজন্যও তিনি অনুরোধ জানান। অবশ্য এ সমস্তই হইবে নবশিক্ষার সহায়ক ও প্ররোচনামাত্র। সেই প্রকৃত শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে একাকী অথবা সম্মিলিতভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এক বৃহৎ জাতিকে, তাহার বোধসীমার বাহিরে অবস্থিত এক

চিন্তা ও জ্ঞানের রাজ্য সম্পর্কে অবহিত করাই নূতন শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রথম সোপান। সুতরাং এই ধরনের নানা পরিকল্পনা স্বামীজীর পক্ষে খুবই সঙ্গত হইয়াছিল।

কিন্তু ধর্মাচার্যের উপযুক্ত যে কার্যের সূত্রপাত এবং মাহাত্ম্য তিনি স্বয়ং প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাহা ছিল ক্ষুধার্ত অথবা পীড়িতের বিশেষ সেবা। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্লেগনিবারণকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রথম যে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ কার্য আরম্ভ হয়, তাহার জন্য অর্থ স্বামীজীই সংগ্রহ করিয়া দেন। ঐ কার্য আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে কয়েক বৎসর অবস্থান কালে তিনি সর্বদা এমন কর্মিগণের সন্ধানে থাকিতেন, যাহারা ভারতের অন্ত্যজদের সেবাকার্যে নিজেদের উৎসর্গ করিবে, এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে নীচজাতীয় কলেরারোগীর সেবায় নিরত দেখিয়া তিনি যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, এমন আর কিছুতেই নহে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "পূর্বে বুদ্ধের সময় যা ঘটেছিল, তা আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি।" তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার প্রেম ও করুণাপ্রসূত সর্বশেষ সন্তানপ্রতিম কাশীর ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটির প্রতি এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

বিশেষভাবে কেবল শিক্ষারই সহিত সংশ্লিষ্ট—এইরূপ কার্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয় কম আকৃষ্ট হইত না। যে-সকল মাসিকপত্রের সহিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অল্পবিস্তর সম্পর্ক ছিল, তাহাদের হিতাহিত এবং মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম হইতে প্রদত্ত শিল্পশিক্ষা তাঁহার দৃষ্টিতে বরাবর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। ভারতের বর্তমান অবস্থায় মাসিকপত্রগুলি বহুস্থলে একাধারে ভ্রাম্যমাণ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা একদিকে যেমন ভাব বিস্তার করে, অপরদিকে তেমন লোকের মনোভাব ব্যক্ত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। সহজাত সংস্কারপ্রভাবে স্বামীজী ইহাদের শিক্ষাসংক্রান্ত উপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং সেজন্যই তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিচালিত মাসিকপত্রিকাগুলির ভাগ্য সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয়তো একপৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ এবং অপর পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা স্থান পাইত, এবং ইহা দ্বারা ভারতের যুগ সন্ধিক্ষণে সাধারণ লোকের মনের গতি কোন্ দিকে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আপাত-বিসংবাদের

উল্লেখপূর্বক স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছেন, "হিন্দুদের ধারণা, ধ্যানের দ্বারা জ্ঞানলাভ হবে; বিষয়টি গণিতশাস্ত্র হলে ধারণাটি খাটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূগোলের বেলায়ও তাদের স্বাভাবিক সংস্কার ঐ উপায় গ্রহণে প্রবৃত্ত করে; এবং একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ঐ উপায়ে ভূগোলের জ্ঞান বিশেষ হয় না।"

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের করুণার উচ্ছ্বাস কেবল ভারতের জনসাধারণের প্রতিই প্রবাহিত হইত না। ব্যবসাতে অধিক মূলধন নিয়োগে অধিক লাভের সম্ভাবনা, এইরূপ মতাবলম্বীদের বিপক্ষে তিনি যাহারা অল্প জমিতে চাষ করে, অথবা স্বল্প পুঁজি লইয়া কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্বদা তাহাদের সমর্থন করিতেন। উহা তাঁহার প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের উপযুক্ত কার্যই হইত। তিনি বলিতেন, বর্তমানে যে মানবিকতার যুগের অভ্যুদয় ঘটিতেছে, তাহার প্রধান কার্য হইবে—শ্রমজীবিদের সমস্যার সমাধান, অথবা তিনি যেমন বলিতেন, শূদ্র-সমস্যার সমাধান। তাঁহার পত্র হইতে জানা যায়, যখন পাশ্চাত্যে তিনি প্রথম পদার্পণ করেন, তখন সেখানকার আপাত-প্রতীয়মান অধিকার-সাম্যের দ্বারা তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে উহার অন্তরালে যে ধনতান্ত্রিক স্বার্থপরতা ও বিশেষ অধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার পরিষ্কার ধারণা হয়, এবং চুপি চুপি একজনকে বলেন, পাশ্চাত্য জীবন এখন তাঁহার নিকট 'নরক' বলিয়া বোধ হইতেছে। পরিণত বয়সের বহু অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যেন কতকটা বিশ্বাস করিতে চাহিতেন যে, অপেক্ষাকৃত কোন কোন আধুনিক দেশ অপেক্ষা চীন দেশই সর্বাপেক্ষা মানবিক-নীতিজ্ঞান সম্পর্কে যে আদর্শ ধারণা—তাহার সমীপবর্তী হইতে পারিয়াছে। তথাপি, সমগ্র জগতে আগামী যুগ যে জনসাধারণের অথবা শূদ্রজাতির কল্যাণের কারণ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্রমিক সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে, কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, কী ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা সংঘটিত হবে!" তিনি যেন ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়া কথা বলিতেছিলেন; তাঁহার কণ্ঠে যেন ভবিষ্যদ্‌বাণী ঘোষিত হইতেছিল। শ্রোতা যদিও উৎসুকভাবে আরও কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি কিন্তু নীরব হইয়া গেলেন, এবং ক্রমে গভীরতর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

আমার বরাবর বিশ্বাস, এইরূপ এক বিপর্যয় ও ভীতির যুগে জনসাধারণকে পরিচালনা করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের জীবনে শক্তিপূজার এক মহান উদ্বোধন ঘোষিত হইয়াছে। জগন্মাতাই একাধারে এই বিপরীত চরমভাবের সমন্বয়স্থল। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ ঘটে। সকল পথের গন্তব্যস্থল তিনিই। যখনই স্বামীজী সুর সংযোগে মাতৃপ্রণামের মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন, আমরা যেন একটি মাত্র কোমল কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহু যন্ত্রসহযোগে উত্থিত মৃদু সঙ্গীতের ন্যায় ঐতিহাসিক নাটকের এই মহান সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম। তিনি আবৃত্তি করিতেন ঃ

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ।
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ॥
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥"[১]

অতঃপর যেন এক সাধারণ আশা ও ভয়ে উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের একত্র সম্মিলন. সেনাসমূহের সগর্ব পদসঞ্চার এবং বিভিন্ন জাতির সংক্ষোভ মানসকর্ণে উচ্চতর ও স্পষ্টতরভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল, অমনি ঐ সকলের ঊর্ধ্বে সেই মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল ঃ

"প্রকৃতিস্ত্বংহি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।"[২]
"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥[৩]

---

১ যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্মলচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, যিনি সাধুদিগের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। হে দেবি. বিশ্বকে প্রতিপালন কর।—চণ্ডী, ৪/৫

২ তুমি সকলের গুণত্রয়প্রকাশকারিণী প্রকৃতি, তুমি গভীর প্রলয় রাত্রি, মরণরূপ রাত্রি এবং দারুণ মোহরাত্রি।—ঐ, ১/৭৮

৩ সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে শিবে, হে সর্বাভীষ্টসিদ্ধিকারিণি, হে শরণাগত রক্ষয়িত্রি, হে ত্রিনয়নি, গৌরি, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।—ঐ, ১১/১০

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান-প্রণালী

স্বামীজী একবার গাজীপুরের পওহারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কাজে সফলতার রহস্য কি?" এবং তিনি এই উত্তর লাভ করেন, "জৌন সাধন তৌন সিদ্ধি"—যাহা সাধন, তাহাই সিদ্ধি, অর্থাৎ সাধন বা উপায়গুলিকে সাধ্য বা উদ্দেশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে।

এই উক্তির প্রকৃত অর্থ লোকে কালেভদ্রে ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ঙ্গম করে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, সাধকের সমগ্র শক্তি উপায়গুলির উপরেই কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই—যেন উহারাই উদ্দেশ্য এবং সেই সময়ের জন্য প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইতে হইবে, অথবা উপেক্ষা করিতে হইবে—তাহা হইলে গীতার সেই মহতী শিক্ষারই উহা প্রকারান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।

আমাদের আচার্যদেব তাঁহার শিষ্যগণকে এই আদর্শের অভ্যাসপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করিবার রহস্য অদ্ভুত রকমে জানিতেন। তিনি মনে করিতেন, যদি কোন ইউরোপীয় তাঁহার মতানুযায়ী ভারতের জন্য কার্য করেন, তবে তাঁহাকে উহা ভারতীয় প্রণালীতেই করিতে হইবে। স্বামীজীর এই ধারণার পশ্চাতে তাঁহার নিজস্ব যুক্তি ছিল, এবং হয়তো প্রত্যেক ভারতবাসী উহা বুঝিতে পারিবেন। এই দাবির মধ্যে একদিকে যেমন তিনি মুখ্য ও গৌণ বিষয়গুলিকে কদাপি মিশাইয়া এক করিয়া ফেলেন নাই, তেমনি অপরদিকে সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারও তিনি কম গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন না। যেসব খাদ্য শাস্ত্রসম্মত, কেবল তাহাই আহার এবং উহা আবার হাত দিয়া খাওয়া, মেঝের উপর উপবেশন ও শয়ন, হিন্দুর সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন, এবং হিন্দুর দৃষ্টিতে যাহা শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য, তাহার যথাযথ পালন ও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ—এই সকলের প্রত্যেকটি তাঁহার মতে ভারতীয় চেতনা আয়ত্ত করিবার উপায়স্বরূপ, যাহার ফলে অতঃপর কোন বিদেশী জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলির সমাধান ভারতীয়ভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত হইবেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপার, যেমন সাবানের পরিবর্তে বেসন ও লেবুর রস ব্যবহার—তাঁহার নিকট প্রণিধানযোগ্য ও করণীয় বলিয়া বোধ

হইত। এমনকি, জাতিভেদ সম্পর্কে যে চিরপোষিত ধারণা অত্যন্ত অমার্জিত বলিয়া বোধ হইত, তাহাও সমর্থন ও আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইবে। স্বামীজী যেন অন্তর হইতে বুঝিয়াছিলেন, হয়তো এমন দিন আসিবে, যখন লোকে তাঁহারই মতো ঐ সকল ধারণার পারে চলিয়া যাইবে; কিন্তু কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ঐ প্রকার ধারণা হইতে মুক্তিলাভ এবং অন্ধতাবশতঃ উহার প্রতি উপেক্ষা অথবা অজ্ঞতা প্রদর্শন—এই উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ।

কোন একটি প্রথা শিক্ষা দিবার সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শ দেখাইয়া দিবার অসাধারণ ক্ষমতা স্বামীজীর ছিল। আজ পর্যন্ত ফুঁ দিয়া আলো নেবানো মহা অপবিত্র ও অসভ্যজনোচিত কার্য ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি, আবার শাড়ি পরা ও অবগুণ্ঠন দ্বারা মস্তক আবৃত করার অর্থ অভিমান ও হামবড়া ভাবের পরিবর্তে সর্বদা নম্র-মধুরভাবে সকলকে মানিয়া চলা—এ-সকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক একটি আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের সর্বসাধারণের পরিচিত, পাশ্চাত্যবাসী আমরা হয়তো যথার্থভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অবগুণ্ঠন সম্পর্কে স্বামী সদানন্দ একবার আমাকে বলেন, "কখনো ওটা টেনে দিতে ভুলো না। মনে রেখো, আদর্শ পবিত্র জীবনের অর্ধেক ঐ শ্বেত অবগুণ্ঠনের মধ্যেই নিহিত।"

এই-সকল বিষয়ে স্বামীজী শিষ্যকে সেই পথেই পরিচালিত করিতেন, যে পথ শিষ্য ইতোমধ্যেই সঠিক বলিয়া জানিয়াছেন। যদি তাঁহাকে ভারতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে নিম্নস্তরের শিক্ষাদান-প্রণালীর অভিজ্ঞতালাভ তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য; এবং এই কার্যের জন্য সর্বোচ্চ ও অত্যাবশ্যক গুণ হইল, ছাত্রের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখা—যদি একমুহূর্তের জন্য হয়, তাহাও স্বীকার। শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি নিয়ম এই কথাই ঘোষণা করে। যাঁহারা ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জগৎকেদেখিতে জানেন না, অথবা কোন্ অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিতে হইবে, তাহা জ্ঞাত নহেন, তাঁহার নিকট 'জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে', 'সরল হইতে জটিল তত্ত্বে', 'স্থূল হইতে সূক্ষ্মে' কথাগুলি, এমনকি 'শিক্ষা' শব্দটি পর্যন্ত কেবল মুখের কথায় পর্যবসিত হয়। ছাত্রের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিকূলে শিক্ষাদান হিতসাধনের পরিবর্তে অনিষ্টকরই হয়।

স্বামীজীর শিক্ষাদানের মধ্যে তাঁহার এই সহজাত ধারণাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে, ভারতীয় চেতনা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটু ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,

শ্রীরামকৃষ্ণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখনই তাঁহার কোন নূতন ভাব উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা হইত, তিনি উক্ত মতাবলম্বীদের আহার, পরিচ্ছদ, ভাষা এবং সাধারণ চালচলন গ্রহণ করিতেন। কয়েকটি ধর্মমতের ব্যাপারেই শুধু তাহাদের সদৃশ হইবার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হইতেন না।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন মহান শিক্ষক এই সকল ব্যাপারেও শিষ্যের স্বাধীনতা অবহেলা করিতে পারিতেন না। উদ্দেশ্যটি একটু একটু করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইত, এবং সর্বদাই শিষ্য ইতোমধ্যে যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারই সহায়তায় তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতেন। ইহা সত্য যে, তিনি সর্বদা তাঁহার নিজের ও অপর সকলের কর্মে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যটি বিশুদ্ধ কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতেন, এবং সর্বদা সতর্ক থাকিতেন যাহাতে বিন্দুমাত্র স্বার্থ উহাতে প্রবেশ না করে। তিনি বলিতেন, "আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, কারণ, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না। কে জানে কাল আমি কি হব?" কিন্তু তিনি নিজে একবার যেমন বলিয়াছিলেন, তাহাও সত্য যে, অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল—এমনকি, ভুলের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যও নহে। ভুল ঘটিয়া যাইবার পরই কেবল তিনি উহার কারণ প্রদর্শন করিতেন তাহার পূর্বে নহে।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ছয়মাস আমি মধ্যে মধ্যে কলিকাতার নানা শ্রেণীর দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের গৃহে আহারাদি করিতাম। স্বামীজী ইহাতে অস্বস্তিবোধ করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আশঙ্কা ছিল, ইহা দ্বারা নিষ্ঠাবান হিন্দুজীবনের অত্যধিক সরলতার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে। একথাও তিনি নিঃসন্দেহে ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাতে আজন্মসঞ্চিত সংস্কারসমূহের দ্বারা আমার পুনরায় আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। পাশ্চাত্যে তিনি এক বিরাট ধর্মান্দোলনকে জনৈক অতিরিক্ত রুচিসম্পন্না মহিলার তুচ্ছ সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাহেতু ধূলিসাৎ হইতে দেখেন। তথাপি তিনি এ-বিষয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র বাধা দেন নাই, যদিও তাঁহার মুখনিঃসৃত একটি আদেশবাক্যই যে কোন সময়ে উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ইহা যে তাঁহার মনঃপূত নয়, এ-কথাও কখনও প্রকাশ করেন নাই। উপরন্তু কেহ নিজের কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর করিলে তিনি আগ্রহসহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন। রাজসিক আহার সম্পর্কে তাঁহার আশঙ্কা সাধারণভাবে প্রকাশ করিতেন, অথবা উহা দ্বারা অনিষ্ট হইবে বলিয়া গম্ভীর সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেন—যাহার অর্থ ঐ সময় আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইত না। কিন্তু বর্তমান ভারতে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ রহিয়াছে, তাহাদের সমন্বয় দৃষ্টিতে ধারণা করা আমার

পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সম্ভবতঃ ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের মত সমর্থন করিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে তত্ত্ব অন্বেষণে অনুমতি দেন।

ইংলণ্ড-যাত্রারম্ভের পর জাহাজেই তিনি নিজ সঙ্কল্পিত আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেন। স্ত্রী-শিক্ষা-কার্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন, "তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে ছাড়তে হবে, এবং রীতিমত নির্জন-বাস করতে হবে। তোমার চিন্তা, প্রয়োজন, ধারণা, অভ্যাস—এসব হিন্দুভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। তোমার জীবন হবে ভেতরে বাইরে যথার্থ নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর মতো। এর সাধনের উপায় তুমি নিজে থেকেই জানতে পারবে, যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু অতীত জীবন তোমাকে একেবারে ভুলতে হবে, এবং অপরেও যাতে ভুলে যায়, দেখতে হবে। তার স্মৃতি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।"

আপাত-প্রতীয়মান বহু স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরঙ্কুশ জীবন সত্ত্বেও কোন সন্ন্যাসীই স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মনে প্রাণে সন্ন্যাসী ছিলেন না। তথাপি এই সেবাব্রতীর ক্ষেত্রে তিনি তাহাকে কোন মঠের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার পরিবর্তে ভারতবাসিগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার নিকট সময়ে সময়ে ইহাই তাঁহার প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। একবার তিনি বলেন, "আমাদের সকল লোকের সঙ্গে তাদের নিজের ভাব বজায় রেখে কথা বলতে হবে।" এই বলিয়া তিনি কল্পনা-সহায়ে বর্ণনা দিতে লাগিলেন, হয়তো ভবিষ্যতে 'ইংলিশ চার্চে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া গৈরিকধারী, নগ্নপদ ও অতি কঠোর-তপস্যা-রত ভারতীয় সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সম্প্রদায় সর্বদা এই চরম সত্য ঘোষণা করিবে যে, সকল ধর্মই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ।

যাহা হউক, এই ভারতীয় চেতনা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শ কায়মনোবাক্যে ঐরূপ কামনা করার মধ্যেই কেবল নিহিত ছিল না। ইউরোপে সাধারণতঃ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের নব শিক্ষার্থীকে যে-ভাবে শিক্ষাদান করা হয়, সেইভাবে তিনি ধাপে ধাপে তন্ন তন্ন করিয়া হিন্দু আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বিশদভাবে উপদেশ দিতেন। এই উপায়ে তিনি প্রাচ্যবাসীর নিকট অতিশয় অমার্জিত বলিয়া প্রতিভাত পাশ্চাত্যের আদবকায়দার সদা অস্থিরভাব ও সকল বিষয়ে জোর দিয়া বলার অভ্যাস দূর করিতে প্রয়াস পান। কষ্ট, প্রশংসা অথবা বিস্ময়—যে কোন মনোভাব সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিয়া ফেলা তাঁহার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া

বোধ হইত। ইহাকে অধর্মরূপে চিহ্নিত করা নিষ্প্রয়োজন কারণ উহা কুশিক্ষার ফল। প্রাচ্যবাসী এই প্রত্যাশা করেন যে, প্রত্যেকের অন্তরে অনুভূতি থাকা উচিত, কিন্তু ঐ ভাব অন্তরেই চাপিয়া রাখিতে হইবে। দিবারাত্র কোন কৌতূহলোদ্দীপক অথবা সুন্দর বস্তু দৃষ্টিতে পড়িলেই তাহা তৎক্ষণাৎ দেখাইয়া দেওয়া, তিনি চিন্তার নিভৃতভাব ও স্বচ্ছন্দগতির অনধিকার বাধাস্বরূপ মনে করিতেন। তথাপি তাঁহার মনোমত আচরণ বা আদবকায়দার সেই শান্তভাব যে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থামাত্র নহে, তাহার নিদর্শন জনৈক সাধুর প্রত্যুত্তরে পাওয়া যায়। "ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?"—রাজার বারংবার এই প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলেন, "রাজা, এতক্ষণ ধরে তাঁর স্বরূপ কি—তাই তো আমি তোমাকে বলছিলাম। কারণ, মৌনই তাঁর স্বরূপ !"

এই বিষয়ে তিনি ছিলেন নাছোড়বান্দা। ইউরোপীয় শিষ্যের প্রতি তিনি দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সংযমের আদেশ দিতেন। একবার কোন ঘটনা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাবোচ্ছ্বাসের নামগন্ধ না রেখে আত্মানুভূতির চেষ্টা কর।"

একবার শরৎকালের এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৃক্ষ হইতে জীর্ণপত্রসমূহ পড়িতে দেখিয়া তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, দৃশ্যটির মধ্যে কবিত্ব আছে, কিন্তু বলেন, বাহ্য ইন্দ্রিয়জগতের সামান্য একটি ঘটনা হইতে উদ্ভূত মানসিক উত্তেজনা নিতান্তই ছেলেমানুষি এবং অশোভন। তিনি আরও বলেন, পাশ্চাত্যবাসীকে অনুভূতি ও ভাবোচ্ছ্বাস এই দুইটি বস্তুকে পৃথক রাখিবার মহাশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। "গাছের পাতাগুলো ঝরছে দেখে যাও, কিন্তু এই দৃশ্য দেখে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তা পরে কোন সময়ে নিজের অন্তর থেকে সংগ্রহ কর।"

ইহা অবিকল সেই ইউরোপের মঠসমূহে প্রচলিত নীতি—যাহা শান্ত ও সংযতভাব বলিয়া পরিচিত। ইহাকে কি আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের এক সূক্ষ্ম উপায় বলা যায়? অথবা উহা এমন এক কবিত্বের সূচনা নির্দেশ করে—যাহা জগৎকে এক বিরাট প্রতীক বলিয়া মনে করিলেও বিচার বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়রাজ্যের বহু ঊর্ধ্বে আসন প্রদান করে?

প্রশ্নটিকে শুধু সৎশিক্ষা ও সংযম অভ্যাসের রাজ্যের বাহিরে লইয়া গিয়া স্বামীজী কেবল ধর্মজীবনে ঐ সত্যের প্রয়োগ করিয়াও দেখিয়াছিলেন। সেইজন্য সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিচার-প্রসূত সুখলিপ্সাকেও তিনি ভয়ঙ্কর বন্ধন বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং ঐভাবে বর্ণনা করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, সকল আদর্শের ক্ষেত্রেই একটি বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা হইল, আমরা যতটুকু নিজে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাকেই আদর্শ বলিয়া মনে করা। উহা কেবল শবের উপর একরাশ ফুল চাপা

দেওয়া, এবং কার্যে পরিণত হইলে উহার অর্থ দাঁড়ায়—শীঘ্র অথবা বিলম্বে হউক, জনসাধারণের পক্ষ পরিত্যাগ এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে আরব্ধ কার্যের বিনাশ। তাহারাই কেবল বিশ্বস্ত, যাহারা প্রলোভনের অতীত এবং সম্পূর্ণরূপে অহং-বর্জিত হইয়া কেবল শুদ্ধ ভাবের অনুগামী।

ভাবী কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "সাবধান! উত্তম আহার, পরিচ্ছদ—এ সকলের প্রতি মনোযোগ দিও না। সংসারে বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হলে চলবে না। ওসব একেবারে পরিত্যাগ করা চাই। মূলসমেত উপড়ে ফেলতে হবে। এ কেবল ভাবুকতা—ইন্দ্রিয়ের অসংযম থেকেই এর উৎপত্তি। বিচিত্র বর্ণ, সুন্দর দৃশ্য ও শব্দ এবং অন্যান্য সংস্কার অনুযায়ী এইসব উচ্ছ্বাস মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। এসব দূর কর। ঘৃণা করতে শেখ। এটা একেবারে বিষ!"

এইরূপে হিন্দু গৃহস্থালীর সাধারণ দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি স্বামীজীর বর্ণনায় রাশি রাশি গভীরতর তথ্যের উদ্বোধক হইয়া দাঁড়াইত—যাহা কেবল হিন্দু মনেরই সহজবোধ্য। তিনি নিজে আশৈশব সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ-পরিচালনা সম্পর্কে জানিতে উৎসুক ছিলেন। এক সময়ে একখানি ঈশা-অনুসরণ (Imitation of Christ) পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়; উহার মুখবন্ধে উক্ত গ্রন্থের আনুমানিক রচয়িতা জাঁ-দ্য-জের্স (Jean de Gerson) যে মঠভুক্ত ছিলেন ঐ মঠ এবং যে নিয়মগুলি তিনি অনুসরণ করিতেন, তাহার বর্ণনা ছিল। স্বামীজীর কল্পনায় উক্ত মুখবন্ধ ছিল পুস্তকটির রত্নস্বরূপ। বার বার পাঠ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই; ক্রমে উহা তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং বাল্যকালের স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া যায়। অবশেষে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীসঙ্ঘ স্থাপন করিতেছেন, এবং হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, তাঁহার শৈশবের ঐকান্তিক অনুরাগ ভাবী জীবনের পূর্ব ছায়াপাত মাত্র।

তথাপি কোন পাশ্চাত্য শিষ্যের নিকট আদর্শরূপে তিনি যে নিয়মানুবর্তিতা উপস্থিত করিতেন, তাহা কর্তৃপক্ষের বা বিদ্যালয়ের কঠোর আনুগত্য নহে; উহা যেন কোন হিন্দু বিধবার পরিবারের মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিয়মগুলি পালন করিয়া যাওয়া। চরিত্রবতী নারীর আদর্শ বলিতে তিনি বুঝিতেন 'নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণী।' যে আনন্দের সহিত তিনি ঐ কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিতেন তাহা বর্ণনা করা যায় না!

এই বিষয়টির আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেন, "তোমার ছাত্রীদের জন্য কতকগুলো নিয়ম কর, এবং ঐ নিয়ম সম্বন্ধে তোমার মতামতও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও। সুবিধা হলে একটু উদার ভাবের প্রশ্রয় দিও। কিন্তু মনে রেখো যে, সমগ্র জগতে পাঁচ-ছ জনের বেশি লোক কখনো একসঙ্গে ঐ ভাব গ্রহণ করবার উপযুক্ত নয়! সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা থাকবে, আবার সেই সঙ্গে সম্প্রদায়ের গণ্ডির বাইরে চলে যাবার ব্যবস্থাও থাকবে। তোমার সহকারিণীদের তোমাকেই প্রস্তুত করে নিতে হবে। নিয়ম কর, কিন্তু এমনভাবে কর যে, যারা নিয়ম ব্যতীত কাজ করবার উপযুক্ত হয়েছে, তারা যেন সহজে ওগুলি ভেঙে ফেলতে পারে। আমাদের মৌলিকত্ব হলো, পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণ শৃঙ্খলা। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘেও তা করা যেতে পারে। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি সব সময় অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাই এবং তার ফলে বুঝতে পারি, ওটা সম্ভবপর।"

সহসা তিনি এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন এবং যে প্রসঙ্গ সর্বদা তাঁহার নিকট প্রীতিকর ছিল ও যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা যাহা ফলপ্রদ হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাহার অবতারণা করিলেন। বলিলেন, "দুটো বিভিন্ন জাতের মেলামেশার ফলে তাদের মধ্য থেকে এক নতুন ধরনের শক্তিশালী জাতের উদ্ভব হয়। এই নতুন জাতটা নিজেকে অপরের সঙ্গে মিশে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, আর এখানেই জাতিভেদের আরম্ভ। দেখ না, যেমন আপেল। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালজাতের আপেলগুলি বিভিন্ন জাতের সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু একবার ঐভাবে উৎপন্ন হবার পর আমরা ঐ বিশেষ জাতের আপেল বার বার পৃথক রাখবার চেষ্টা করে থাকি।"

কয়েকদিন পরে আবার ঐ চিন্তাই স্বামীজীর মনে প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমি ভবিষ্যতের যতটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটি বলশালী ও পৃথক নতুন জাত সর্বদাই শরীর-ভিত্তিক। সর্বজনীনতা, উদারভাব প্রভৃতি মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু এখনো লক্ষ লক্ষ বছর জগৎ এর জন্য তৈরি হতে পারবে না।"

তিনি আবার বলিলেন, "মনে রেখো, যদি তুমি জানতে চাও, একখানা জাহাজ দেখতে কি রকম,তাহলে জাহাজটি ঠিক যেমন, তেমন তার বর্ণনা দিতে হবে—তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার, এবং কোন্ কোন্ উপাদানে তৈরি ; কোন জাতকে বুঝতে হলেও আমাদের অনুরূপভাবে বুঝতে হবে। ভারত মূর্তিপূজক দেশ, স্বীকার করি। সে

যেমন, তাকে ঠিক তেমনভাবে সাহায্য করতে হবে—কিছু বাদ দিলে চলবে না। যারা তাকে ত্যাগ করেছে, তারা তার কোন উপকারই করতে পারবে না।"

স্বামীজী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন, ভারতে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ন্যায় আর কিছুই তত প্রয়োজন নহে। তাঁহার নিজের জীবনে দুটি সঙ্কল্প ছিল—একটি রামকৃষ্ণ- সঙ্ঘের জন্য মঠ স্থাপন, এবং অপরটি নারীজাতির শিক্ষাকল্পে কোন উদ্যমের সূত্রপাত করিয়া যাওয়া। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "পাঁচশত পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশত নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।"

শিক্ষা দিয়া তৈয়ারি করিয়া লইবার জন্য বিধবা ও অনাথাদের সংগ্রহ করা সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল, জন্মগত উচ্চ-নীচ ভেদ দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে গেলে, যাহাদের নির্বাচন করা হইবে, তাহারা যাহাতে অল্পবয়স্ক ও পূর্বেই কোন নির্দিষ্টরূপে গঠিত না হইয়া থাকে, তাহা দেখা একান্ত আবশ্যক। প্রায়ই তিনি বলিতেন, "জন্ম কিছুই নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সব।" কিন্তু সর্বোপরি তিনি উপলব্ধি করিতেন যে, এ বিষয়ে কোনরূপ অসহিষ্ণুতা অমার্জনীয়। যদি বার বৎসরে কোন ভাল ফল দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বিশেষ সাফল্য হইয়াছে। কাজটি এতই গুরুতর যে, উহার সম্পাদনে সত্তর বৎসর লাগিলেও তাহা অধিক নহে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিতেন, একটি আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে আকাশকুসুম রচনা করিতেন, এবং ঐ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সাদরে বর্ণনা করিতেন। হয়তো উহার কোন অংশই যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হইবে না, তথাপি উহার সবটাই নিশ্চয় মূল্যবান। কারণ, উহা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি কতটা স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিরূপ ফললাভ বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইত।

ইহা খুব স্বাভাবিক ছিল যে, পরিকল্পিত কার্যপ্রণালী একটা ধর্মভাবে অনুরঞ্জিত হইবে। কারণ, আমার নিজের দিক দিয়া আমি সেই সময় হিন্দুধর্মের চিন্তা ও আদর্শের আলোচনায় বিশেষ ব্যাপৃত ছিলাম। ঐ কার্যপ্রণালী আবার পাণ্ডিত্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সাধুজীবনযাপনের অনুকূল করিবার দিকে বিশেষ চেষ্টা ছিল। কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার অপেক্ষা শিক্ষার প্রকৃতি ছিল তাঁহার সমধিক

চিন্তার বিষয়। "আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়ে পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে"—একবার মাত্র হঠাৎ এই কথা বলা ব্যতীত আমার মনে পড়ে না যে, স্ত্রীশিক্ষা-পরিকল্পনার ঐহিক দিকটির বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কখনও কিছু বলিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, কোন শিক্ষা বাস্তবিক শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত কিনা, তাহা উহার গভীরতা ও কঠোরতা দ্বারাই নিরূপিত হইবে। যে মিথ্যা আদর্শ-কল্পনা নারীজাতির জন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধন অথবা নিম্নতর সত্যলাভই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিশ্বাস ছিল না।

গৃহ পরিবেশ কিরূপ হইলে স্ত্রীশিক্ষা-কার্যটি সর্বতোভাবে প্রগতিশীল ও সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, এই সমস্যা তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। অধিকন্তু, পুরাতন পদ্ধতির নিয়মগুলির এরূপ আকার দান করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বরাবর আধুনিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হয়। সামাজিক স্থায়িত্ব ও সুসঙ্গতির উপর বিদেশী ভাবাদর্শের ফলাফল বিচার না করিয়া অতি সহজেই তাহাদের গ্রহণ করিয়া লওয়ার ফলে চরিত্রের দিক দিয়া এবং নীতিগত যে ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সর্বদাই তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িত। স্বাভাবিক সংস্কারবশে তিনি জানিতেন, প্রাচীন সমাজ যেসকল বন্ধন দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল, আধুনিক শিক্ষার আলোকে তাহাদের নূতন করিয়া অনুমোদন লাভ এবং পবিত্রতররূপে পরিগ্রহণ একান্ত আবশ্যক, নতুবা ঐ শিক্ষা শুধু ভারতের অধঃপতনের সূচনামাত্র বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তিনি কদাপি চিন্তা করেন নাই যে, এই প্রাচীন ও নূতনের সমন্বয়সাধন সহজসাধ্য। কিরূপে আধুনিক ভাবকে জাতীয়তাসম্পন্ন এবং প্রাচীন ভাবকে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া তোলা যায়—যাহাতে উভয়ের মধ্যে ঐক্য সাধিত হইতে পারে—এই কঠিন সমস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় ও চিন্তা অধিকার করিয়া থাকিত। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, যখন এই উভয়কে সংযোগ করিয়া একত্র করা যাইবে, তখনই জাতীয় শিক্ষার সূচনা ঘটিবে, তাহার পূর্বে নহে।

কি উপায়ে হিন্দুজীবনের প্রচলিত ঋণগুলিকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যাহাতে দেশ ও ইতিহাসের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আধুনিক চেতনা উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যায়, তাহা সহসা একদিন তাঁহার মনে উদিত হয়, এবং তিনি

বলিয়া ওঠেন, "এই পঞ্চযজ্ঞের[১] ব্যাপার নিয়েই কত কী করা যায়! কত বড় বড় কাজেই এগুলিকে লাগানো যেতে পারে!"

বিষয়টি সম্পর্কে তাঁহার মনে সহসা এক নূতন আলোকপাত হইয়াছিল, কিন্তু মন হইতে চলিয়া যায় নাই। ঐ ভাবটির সূত্র ধরিয়া তিনি ক্রমশঃ উহার বিস্তৃত অবতারণা করিলেন।

"[পিতৃযজ্ঞ] প্রাচীনযুগের ঐ পিতৃউপাসনা থেকে তোমরা বীরপূজার সৃষ্টি করতে পার।

"[দেবযজ্ঞ] দেবপূজায় অবশ্য প্রতিমাদির ব্যবহার চাই। কিন্তু তোমরা তাদের পরিবর্তন সাধন করতে পার। মা-কালীকে সব সময় এক অবস্থায় দণ্ডায়মান রাখবার প্রয়োজন নেই। তোমার ছাত্রীদের নূতন নূতন ভাবে মা-কালীকে কল্পনা করতে উৎসাহ দাও। দেবী সরস্বতীকে একশতভাবে ধারণা কর। মেয়েরা নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী মূর্তি গঠন করুক এবং চিত্র অঙ্কন করুক।

"পূজার ঘরে বেদীর সবচেয়ে নিম্নধাপে সব সময় একটি জলপূর্ণ কলস থাকবে, এবং তামিলদেশের মতো সর্বদাই বড় বড় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলবে। আর যদি ঐসঙ্গে দিবারাত্র ভজন-পূজনের ব্যবস্থা করতে পারা যায়, তাহলে তার চেয়ে হিন্দুভাবের পোষক আর কিছুই হতে পারে না।

"কিন্তু পূজার অনুষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা যেন অবশ্যই বৈদিক হয়। বৈদিক যুগের মতো একটি বেদী থাকবে, এবং পূজাকালে তাতে বৈদিক অগ্নি প্রজ্বলিত হবে। ছোট ছোট মেয়েরাও তাতে অবশ্যই যোগ দিয়ে আহুতি দেবে। এই অনুষ্ঠান সমগ্র ভারতে শ্রদ্ধা অধিকার কববে।

"[ভূতযজ্ঞ] নানারকম জন্তু রাখবে। গরু থেকে আরম্ভ করলে ভালই হবে। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, পাখি প্রভৃতি অন্যান্য জীবজন্তুও রাখবে। ছোট ছোট মেয়েদের তাদের খাওয়াবার ও যত্ন করবার একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

"[ব্রহ্মযজ্ঞ] তারপর বিদ্যাযজ্ঞ। এটি সবচেয়ে সুন্দর। ভারতে প্রত্যেক বই-ই পবিত্র; একথা জান কি? শুধু বেদ নয়, ইংরেজী, মুসলমানী সব বই। সব পবিত্র।

১। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো, বলির্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।"—মনু, ৩।৭০—অনুঃ

"পুরানো কলাবিদ্যাগুলি আবার উদ্ধার কর। তোমার মেয়েদের খোয়াক্ষীর দিয়ে নানারকম ফলের আকার তৈরি করতে শেখাও। তাদের সুন্দর, শিল্পসম্মত রন্ধন ও সেলাই শেখাও। তারা ছবি আঁকা, ফটো তোলা, কাগজের নানারকম নক্সা কাটা এবং সোনা-রূপার তার দিয়ে লতাপাতা তৈরি করা ও ছুঁচের কাজ শিখুক। লক্ষ্য রাখবে, প্রত্যেকে যেন এমন কিছু বিদ্যা শেখে, যার দ্বারা প্রয়োজন হলে জীবিকা অর্জন করতে পারে।

"[নৃযজ্ঞ] মানুষের সেবার কথা কদাপি ভুলে যেও না। সেবার ভাব থেকে মানুষকে পূজা করার ভাব ভারতে বীজাকারে বর্তমান আছে, কিন্তু তার প্রতি কখনও বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। তোমার মেয়েরা এর বিকাশসাধন করুক। একে কাব্য ও চারুকলার অঙ্গ করে নিও। হাঁ, প্রত্যহ স্নানের পর এবং আহারের পূর্বে ভিক্ষুকদের পা পূজা করলে একসঙ্গে হৃদয় ও হাতের আশ্চর্যরকম যথার্থ শিক্ষা হবে। কোন কোন দিন আবার ছোট ছোট মেয়েদের—তোমার নিজের ছাত্রীদেরই পূজা করতে পার। অথবা তুমি অপরের শিশু সন্তানদের চেয়ে এনে তাদের সেবাশুশ্রূষা করতে ও আহার করাতে পার। মাতাজী[১] আমাকে বলেছিলেন, 'স্বামীজী! আমার কোন সহায় নেই। কিন্তু আমি এই পবিত্র কুমারীদের পূজা করে থাকি, এরাই আমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে।' দেখলে, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, এইসব কুমারীদের মধ্যে তিনি উমারই সেবা করছেন। বিদ্যালয় আরম্ভ করবার পক্ষে এ ভাবটি অতি চমৎকার।"

কিন্তু এইরূপে প্রাচীন ও নূতনের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের জন্য তিনি বিশদ চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেও ইহা সর্বদাই সত্য ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই ছিল আদর্শটিকে গ্রহণ করিবার উপায়স্বরূপ—প্রত্যেক আন্তরিক প্রচেষ্টাকেই উহা আদর্শের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করিয়া দিত। অতি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটেও প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন করিয়া দিত। তাঁহার প্রভাবেই আধুনিকভাবাপন্ন হিন্দুগণ কর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ঐ সকল অনুষ্ঠান পুনরায় আচরিত হইয়া সহসা উহাদের প্রাণপ্রদ ও মূল্যবান করিয়া তুলিত। এইরূপে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে সকল বীরহৃদয় মনীষী জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি জনৈক ভারতীয় মহান্ বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা দেখিয়া মনে হইল, উহা প্রাচীনযুগের আচার্যকুল-বন্দনারই আধুনিক রূপান্তরমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানই যে-জাতির জীবনের চরম

---

১ মহকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী

লক্ষ্য, তাহার পক্ষে জ্ঞানের বাহ্যপ্রয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কেবল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চা অবশ্যম্ভাবী মহত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয়। নাম, যশ ও ঐশ্বর্যের প্রতি প্রশান্ত নিরাসক্তি ইহাই প্রমাণ করে যে, কর্মী নাগরিক ও গার্হস্থ্য জীবনযাপন করিলেও ধর্মের দিক হইতে তিনি সন্ন্যাসীই।

তাঁহার নিজ জীবনের এই উপাদান বা গুণ—যাহা তাঁহার মহত্ত্ব ও বীরোচিত সবকিছুর স্বীকৃতিজ্ঞাপক, ইতিপূর্বেই প্রকাশিত আদর্শবিশেষের পরিচায়ক অথবা উদাহরণরূপে পরিগণিত—সে সম্পর্কে স্বামীজী স্বয়ং অবশ্য অবহিত ছিলেন না। তথাপি মনে হয়, ইহার মধ্যেই তাঁহার সকল জিনিস ধরিবার ও বুঝিবার যে ক্ষমতা তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত। শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁহার বিশদ ইঙ্গিতগুলি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শিক্ষাব্যাপারে উহাদের যৌক্তিকতা আমার নিকট সর্বদাই বিস্ময়কর। যদিও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহাকে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় এবং সেই সময় তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের 'শিক্ষা' (Education) নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার ভার লন; এবং ক্রমশঃ ঐ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পেস্তালৎসি[১] রচিত যে পুস্তকগুলি পাইয়াছিলেন, তাহাও অধ্যয়ন করেন, যদিও উহা তাঁহার পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি এই ঘটনাটি শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের যথেষ্ট কারণ বলিয়া আমার কখনও মনে হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ মনের ক্রিয়াকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে এত নিপুণ, এবং ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশসাধনের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত সর্বদা তাঁহাদের সামনে অবস্থান করে যে, শিক্ষাসংক্রান্ত মতামতের আলোচনা-জগতে তাঁহারা অন্য জাতি অপেক্ষা প্রচুর সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন। একথা ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ঐ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা করার রহস্য তাঁহারা একদিন আয়ত্ত করিয়া ফেলিবেন। ইতিমধ্যে ঐ আদর্শের পরিপূর্ণতালাভের প্রথম সোপান হইল প্রচলিত প্রথাগুলির মধ্যে কি বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা ধারণা করা। স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনার বিস্তার ও পূর্ণতা সম্পাদনের ভার ভারতীয় শিক্ষাবিদ্গণের উপর নিহিত। যখন উহা সম্পূর্ণ হইবে,

---

১ পেস্তালৎসি (Pestalozzi) জীবনের কতক অংশ শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা লইয়া অতিবাহিত করেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। তিনি ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে সুইজাবল্যাণ্ডের জুরিক (Zurich) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।—অনুঃ

যখন তাঁহার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ভাবী-বংশধরগণ সম্বন্ধে তাঁহার সাহস ও আশা এবং জ্ঞানমাত্রেই পবিত্রবোধে তাঁহার আনুগত্য—এই সকল একত্র যুক্ত করিতে আমরা সমর্থ হইব, তখনই বুঝিতে হইবে, জগতের নারীজাতির মধ্যে ভারতীয় নারীর যথার্থ স্থান অধিকারের দিন সমাগতপ্রায়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি ছিল অতিশয় মূল্যবান। যে-কোন অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষে বিবাহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। ঐ-বিষয়ক প্রবৃত্তির স্মৃতি পর্যন্ত মনে স্থান পাইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ এবং কায়মনোবাক্যে নিজেকে এবং নিজের শিষ্যগণকে উহার লেশমাত্র সম্ভাবনা হইতেও তিনি দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। অবিবাহিত থাকাটাই তাঁহার নিকট এক আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইত। এইসকল পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি যে শুধু সন্ন্যাস-জীবনে চরম উৎকর্ষলাভের জন্যই সর্বদা উৎসুক থাকিতেন তা নয়, ব্রতভঙ্গের আশঙ্কাতেও সর্বদা ভীত থাকিতেন। এই ভয় তাঁহার নিজের আদর্শ-উপলব্ধির পক্ষে যতই সহায়ক ও আবশ্যক বলিয়া বোধ হউক, নিঃসন্দেহে উহা বহু বৎসর ধরিয়া এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় নাই।

কিন্তু একথা যেন সকলে উপলব্ধি করেন যে, তিনি স্ত্রীলোক হইতে ভয় পাইতেন না, তাঁহার ভয় ছিল প্রলোভনকে। পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহাকে মেয়েদের সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাঁহারা ছিলেন তাঁহার শিষ্য, কার্যের সহায়ক, এমনকি, বন্ধু এবং খেলার সাথীও। তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের এই সকল বন্ধুর সহিত ব্যবহারে তিনি প্রায় সর্বদাই ভারতের পল্লীগ্রামের প্রথা অবলম্বন করিতেন, এবং তাঁহাদের সহিত কোন একটা পারিবারিক সম্পর্ক পাতাইয়া লইতেন। কোন স্থানের মেয়েরা তাঁহার ভগিনী হইল, কোথাও বা মাতা, কোথাও কন্যা, এইরূপ সর্বত্র। ইঁহাদের মহত্ত্ব এবং

মিথ্যা বা তুচ্ছ ভাবরাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কখন কখনও গর্ব প্রকাশ করিতেন ; কারণ, তাঁহার নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মার্জিত ব্যক্তিগণের যে বৈশিষ্ট্য তাহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ছিল, সেজন্য নারীগণের মধ্যে তিনি ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতার পরিবর্তে মহত্ত্ব ও চারিত্রিক শক্তিরই অন্বেষণ করিতেন। আমেরিকায় তিনি মেয়েদের নৌকা চালানো, সন্তরণ ও নানাপ্রকার ক্রীড়া দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করেন। তাঁহার নিজের ভাষায় "এইসব মেয়েদের একবারও মনে হয় না যে, তারা ছেলে নয়।" ঐরূপে তাহারা যে পবিত্রতার আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল, সেই আদর্শ তিনি পূজা করিতেন।

সন্ন্যাসীদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সর্বদা বিশেষ জোর দিয়া বলিতেন যে, সন্ন্যাসী নিজেকে পুরুষ বা নারী কিছুই ভাবিবেন না, কারণ তিনি ঐ উভয়ের পারে গিয়াছেন। যাহা কিছু—এমনকি শিষ্টাচারও —লিঙ্গভেদের কথা মনে পড়াইয়া দেয়, তাহাই তাঁহার নিকট ঘৃণার্হ বলিয়া মনে হইত। পাশ্চাত্যে যাহা 'শিভালরি' (অর্থাৎ নারীর প্রতি অতি মাত্রায় সৌজন্য প্রকাশ) বলিয়া অভিহিত, তাঁহার নিকট উহা নারীজাতির প্রতি অপমানসূচক বলিয়া বোধ হইত। মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট, এবং পুরুষদের জ্ঞানে যেন সহানুভূতির আধিক্য না থাকে—কোন কোন লেখকের এই মত স্বামীজীর নিকট অতি নীচ এবং উপেক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। মানবের অন্তরাত্মা চায় স্বাধীনতা ; আমাদের দৈহিক গঠন তাহার উপরে জোর করিয়া যে-সব বন্ধন আনিয়া দিয়াছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই উহা অতিক্রম করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

নির্জনবাস, সংযম এবং চিত্তের গভীর একাগ্রতা—এই সকলের সংযোগে গঠিত ছাত্রজীবনের আদর্শই ভারতবর্ষে 'ব্রহ্মচর্য' নামে অভিহিত। স্বামীজী বলিতেন, "ব্রহ্মচর্য শিরায় শিরায় জ্বলন্ত আগুনের মতো প্রবাহিত থাকা চাই।" ছাত্রজীবনের আনুষঙ্গিক পাঠ্যবিষয়ে মনঃসংযোগ তাঁহার নিকট অনন্তের মধ্যে সান্তকে বিলীন করিয়া দিবার অন্যতম পন্থামাত্র ; এবং এই অনন্তের মধ্যে সান্তের বিলোপসাধন তাঁহার নিকট সকল মহৎ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য যে রোবস্‌পীয়র গোঁড়ামি দ্বারা বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পর্যন্ত তিনি প্রশংসা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, যে-কোন কার্য—যাহাতে হৃদয়, মন ও শরীরের সর্বোত্তম বিকাশসাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রস্তুতির জন্য সরস্বতীপূজা একান্ত আবশ্যক ; অবশ্য সরস্বতীপূজা বলিতে তিনি বুঝিতেন ভাবরাজ্যে গভীর তন্ময়তা এবং পূর্ণ সংযম।

কুস্তিগিরদের উপযুক্ত শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এরূপ পূজা ভারতবর্ষে যুগযুগান্তর হইতে সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে ; ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি কেহ মধ্যে মধ্যে সেই অতিচেতনার অন্তর্দৃষ্টির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে চান, যাহা অপরের নিকট দিব্যজ্ঞান, ঐশীপ্রেরণা অথবা অনন্যসাধারণ দক্ষতা বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ধর্মের ন্যায় সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্যও ঐরূপ দিব্যজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ঐরূপ দিব্যজ্ঞানলাভের পরিবর্তে স্বার্থপর অথবা হীন উপায়ে নিজের শক্তিক্ষয় করিতেছে, সে কদাপি রাফেলের ন্যায় অপূর্ব মাতৃমূর্তি অঙ্কনে অথবা মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কারে সমর্থ হয় না। আধ্যাত্মিক আদর্শের ন্যায় নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় আদর্শসিদ্ধির জন্যও একান্ত প্রয়োজন সন্ন্যাসিসুলভ নিষ্ঠাভক্তি। কৌমারব্রত গ্রহণের অর্থই দশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিসুখ বিসর্জন দেওয়া। এইরূপে স্বামীজী উপলব্ধি করেন যে, সংযম ব্যতীত প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না ; হৃদয়ঙ্গম করেন, যে পথ দিয়া হউক, প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজন দেহের প্রবৃত্তির উপর আত্মার জয়লাভ এবং পরিশেষে ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, একজন শ্রেষ্ঠ সাধুর মধ্যে মহৎ কর্মী অথবা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইবার সামর্থ্যও প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে। ইহার বিপরীত পক্ষ—অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনীগণের উদ্ভব হওয়া সম্ভব সেখানেই কেবল যথার্থ উন্নতচরিত্রা পত্নী অথবা শ্রেষ্ঠ নাগরিক জন্মিতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহার ঐরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল কিনা বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি নিজে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসপ্রার্থীদের গুরু ছিলেন বলিয়া, কিঞ্চিৎ আভাস ব্যতীত এই মহাসত্যটি তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছিল ; অবশেষে মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি ঐ বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। একবার তিনি বলেন, "এ-কথা সত্য যে, এমন সব নারী আছেন, যাঁদের উপস্থিতিই মানুষকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ; আবার এমন নারীও আছে, যারা তাকে নরকের দিকে ঠেলে দেয়।"

তাঁহার নিকট অবস্থানকালে, যে-ভালবাসা প্রেমাস্পদের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতে চায়, তাহাকে সর্বতোভাবে আপনার বশীভূত করিয়া রাখিতে চায়, অথবা নিজের সুখ বা কল্যাণসাধনের উপায় করিয়া তোলে, সে-ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা কাহারও পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহার পরিবর্তে প্রেমপদবাচ্য হইবার জন্য প্রেমকে চিরন্তন কল্যাণের প্রস্রবণস্বরূপ হইতে হইবে। প্রেম নিজেকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দেয় ; প্রেম অহেতুক, এবং প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষারহিত। তিনি যে সর্বদা

'অনাসক্তভাবে ভালবাসা'র কথা বলিতেন ইহাই তাহার অর্থ। বস্তুতঃ একবার কোন ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আমাদের বলেন, এইবার তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোন বিষয় হইতে মন উঠাইয়া লইবার শক্তির ন্যায় কোন বিষয়ে মন লাগাইবার শক্তিও অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয়। উভয়ই তৎক্ষণাৎ পূর্ণমাত্রায় এবং সর্বান্তঃকরণে নিষ্পন্ন হওয়া চাই ; এবং এই উভয়েব একটি আর একটির পরিপূরক। ইংলণ্ডে তিনি বলেন, "প্রেম সব সময়ে আনন্দেরই বিকাশমাত্র ; তার উপর লেশমাত্র দুঃখের ছায়া পড়ার অর্থ দেহসুখ কামনা ও স্বার্থপরতা।"

যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য ও আদর্শবিচ্যুত ললিতকলা মানবকে মুখ্যতঃ শরীর বলিয়া মনে করিয়া নিজ অধিকারে রাখিতে চায়, এবং সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি মন ও আত্মাকে গৌণস্থান প্রদান করে তাহাদের স্বামীজী ভুলিয়াও প্রশংসা করিতেন না। সবটা না হইলেও আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আদর্শবাদের (Idealism) অনেকটাই তাঁহার নিকট এই ভাব দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত বলিয়া বোধ হইত, এবং উহার সম্পর্কে তিনি সর্বদা "ফুল দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে রাখা" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। প্রাচ্য ভাবানুযায়ী তিনি মনে করিতেন. আদর্শ পত্নীত্ব বলিতে বোঝায় এক স্বামীর প্রতি অবিচল জ্বলন্ত নিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের প্রথাগুলিকে তিনি সম্ভবতঃ বহুপতিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকিবেন, নতুবা বহুপতিক জাতির ভিতরও তাঁহার স্বদেশের ন্যায় মহানুভবা এবং পবিত্রস্বভাবা বহু নারী দেখিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তির কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মালাবারে ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তিব্বতে নহে ; এবং অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, মালাবারে তথাকথিত বহুপতিক প্রথা প্রকৃতপক্ষে মাতৃশাসিত সমাজের বিবাহমাত্র। স্বামী পত্নীর পিত্রালয়ে গিয়া তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বিবাহ আজীবন স্থায়ী হইবেই, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই ; কিন্তু দুইজন পুরুষ এককালে স্বামী-রূপে গৃহীত হয় না। যাহা হউক, তিনি বলেন যে. তাঁহার এই শিক্ষা হইয়াছে যে, 'দেশাচার কিছুই নহে'—আচার-ব্যবহার কখনও মানবের বিকাশসাধনে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না। তিনি জানিতেন, যে-কোন দেশে, যে-কোন জাতির মধ্যে আদর্শটি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়াই পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে পারে।

কোন সামাজিক আদর্শকে তিনি কখনও আক্রমণ করিতেন না। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড প্রত্যাগমনকালে, সেখানে নামিবার দুই-একদিন পূর্বে তিনি আমাকে বলেন,

পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে আমি যেন এমনভাবে ইউরোপের সামাজিক আদর্শগুলি পুনরায় গ্রহণ করি---যেন উহাদের কখনই পরিত্যাগ করি নাই। ইউরোপ বা আমেরিকায়, বিবাহিত নারীগণ তাঁহার নিকট অবিবাহিতা নারী অপেক্ষা কম সম্মান লাভ করিতেন না। ঐ সমুদ্রযাত্রাকালে জাহাজে কয়জন পাদরী কয়েকগাছা বিবাহকালীন রূপার বালা সকলকে দেখাইতেছিল; ঐগুলি দুর্ভিক্ষের দারুণ সঙ্কটকালে তামিল রমণীগণের নিকট তাহারা ক্রয় করে। কথাপ্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের স্ত্রীলোকেই কুসংস্কারবশতঃ অঙ্গুলি বা মণিবন্ধ হইতে বিবাহ-অঙ্গুরীয় বা বলয় খুলিয়া দিতে আপত্তি করিয়া থাকে, এই কথা উঠিল। শুনিয়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে বেদনাপূর্ণ অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা একে কুসংস্কার বলছ? এর পেছনে যে উঁচুদরের সতীত্বের আদর্শ রয়েছে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?"[১]

কিন্তু বিবাহ দ্বারা আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভের যতটা সহায়তা হয় তাহা দেখিয়াই তিনি উক্ত প্রথার গুণাগুণ বিচার করিতেন। এখানে 'স্বাধীনতা' শব্দটি প্রাচ্যদেশীয় অর্থে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্বাধীনতা বলিতে কোন কিছু করিবার অধিকার বুঝায় না, পরন্তু কোন কিছু করিবার ইচ্ছাকে দমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার অধিকার বুঝায়—উহার লক্ষ্য হইল নৈষ্কর্ম্য সকল কর্মের পারের অবস্থা। একদিন তর্কস্থলে তিনি স্বীকার করেন, "বিবাহের পারে যাবার জন্যই বিবাহ করা, এর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নাই।" তাঁহার গুরুদেবের, তাঁহার গুরুভ্রাতা যোগানন্দের এবং তাঁহার শিষ্য স্বরূপানন্দের যে প্রকার বিবাহ হয়, তাঁহার বিবেচনায় উহাই আদর্শ বিবাহ। এইরূপ বিবাহ অন্যদেশে নামমাত্র বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একবার বলেন, "দেখছ, এ বিষয়ে ভারত ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে! পাশ্চাত্যের বিবাহ বলতে বোঝায়, আইন-বন্ধনের বাইরে যাকিছু, কিন্তু ভারতবর্ষে বিবাহ বলতে বোঝায় যে, সমাজ দুটি প্রাণীকে অনন্তকালের জন্য একটা বন্ধনে আবদ্ধ করে দিল। এই দুটি প্রাণীকে তাদের ইচ্ছা থাকুক, বা না থাকুক, জন্মে জন্মে পরস্পরকে বিবাহ করতেই হবে। এই উভয়ের প্রত্যেকেই অপরের কৃত ভালমন্দের অর্ধেকের ভাগী হয়। আর যদি একজন এ

---

১ সতীত্ব বলিতে হিন্দুগণের ধারণা এই যে, স্বামীর প্রতি পত্নীর কেবল অবিচলিত নিষ্ঠা নহে, ঐ নিষ্ঠার কদাপি লেশমাত্র ইতরবিশেষ ঘটিবে না। 'এই আদর্শ আমার ভাল লাগে না' বলিয়া ঐ নিষ্ঠার কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটিবার উপায় নাই।

জীবনে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে বলে বোধ হয় তাহলে অপরকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না সে আবার তার নাগাল পায়।"

শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহকে মাত্র কয়েকজনের সেবা এবং সন্ন্যাসকে জগতের সেবা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এরূপস্থলে মনে হয়, তিনি সর্বোচ্চস্তরের বিবাহের কথাই বলিতেন। স্বামীজীর নিজের মনেও যে ইহাই ব্রহ্মচর্যের মূল ধারণা ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। যেন সর্বশ্রেষ্ঠ যশলাভের জন্য যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছেন, এইভাবে তিনি লোকদের ঐ ব্রতগ্রহণে আহ্বান করিতেন। সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে তিনি যেন আচার্যের পশ্চাতে অবস্থিত 'একদল সৈন্য' বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং তাঁহার মতে যে আচার্যের শিষ্যগণ সকলেই নাগরিক ও গৃহস্থ, তাঁহার কোন সৈন্যই নাই। যাঁহার এই সহায় বর্তমান এবং যাঁহার এই সহায়ের অভাব এই উভয়পক্ষের শক্তি সম্বন্ধে কোন তুলনাই করা চলে না, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা।

তথাপি কাহারও পক্ষে বিবাহ যে একটি পথ, ইহা তিনি একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে। এক বৃদ্ধদম্পতির যে গল্প তিনি বলিয়াছেন, তাহা আমি কখনও ভুলিব না। পঞ্চাশ বৎসর একত্র বাসের পর তাঁহারা দরিদ্র-নিবাসের (Work house) দরজায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রথম দিনের অবসানে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কি ! মেরী, ঘুমোতে যাবার আগে আমি তাকে একবার দেখতে পাব না, চুমু খেতে পাব না ? আমি যে পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি রাত্রে ঐরকম করে এসেছি।" ঐ মহৎ কার্যের কথা ভাবিয়া আগ্রহের সহিত স্বামীজী বলিলেন, "একবার ভেবে দেখ ! এরূপ সংযম ও নিষ্ঠার নামই মুক্তি ! ঐ দু-জনের পক্ষে বিবাহই ছিল প্রশস্ত পথ।"

তিনি অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা প্রত্যেক নারীর স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এক বালিকার দ্বাদশবর্ষ বয়সের পূর্বেই ধর্মজীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বাড়ির লোকদের বিবাহ-প্রস্তাবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বালিকাটি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনিও বালিকার পিতার উপর নিজের প্রভাব থাকায় এবং ঐরূপ করিলে কনিষ্ঠ কন্যাদের জন্য অধিক যৌতুকের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন একথা বুঝাইয়া বালিকাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হন। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু বালিকা যে জীবন গ্রহণ করিয়াছিল তাহার প্রতি এখনও তেমন নিষ্ঠা রহিয়াছে—প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্জনে ধ্যান-চিন্তা তাহার ঐ জীবনের অঙ্গস্বরূপ। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ সকলেই বর্তমানে বিবাহিতা। এইরূপ উচ্চভাবসম্পন্ন কোন বালিকার জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া তাঁহার দৃষ্টিতে অত্যন্ত

গর্হিত আচরণ বলিয়া বোধ হইত। বালবিধবা, কুলীন ব্রাহ্মণ-পত্নী, যাঁহাদের বিবাহকালে পিতামাতা কোনরূপ যৌতুক প্রদানে সমর্থ হন নাই, এমন দুই-চারিজনকে স্বামীজী গর্বের সহিত হিন্দুসমাজের অবিবাহিতা নারী অথবা কুমারীস্থানীয় বলিয়া গণনা করিতেন।

তিনি এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, বিধবাদের সতীত্বরূপ স্তম্ভের উপরেই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি দণ্ডায়মান। কেবল তিনি ঘোষণা করিতে চাহিতেন যে, এই বিষয়ে নারীর ন্যায় পুরুষের জন্যও সমান উচ্চাদর্শ থাকা উচিত। বিবাহ সম্পর্কে প্রাচীন আর্যপ্রথায় দেখা যায় যে, বিবাহকালে প্রজ্বলিত অগ্নি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একত্র প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও দায়িত্ব সমান। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে সীতার যেমন রামের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার বর্ণনা আছে, রামেরও সীতার প্রতি তদ্রূপ।

পৃথিবীর সর্বত্র বিবাহ-সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যাগুলি স্বামীজীর অজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাত্যে এক বক্তৃতায় তিনি বিস্ময়ের সহিত বলেন, "এই সব মহিলা দুর্দমনীয়, যাদের মন থেকে 'সহ্য কর, ক্ষমা কর' প্রভৃতি শব্দ চিরদিনের মতো চলে গেছে।" তিনি ইহাও স্বীকার করিতেন, যেখানে বিবাহসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার অর্থ মানবজাতির ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, সেক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা স্বামী, স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা মহত্ত্ব ও সাহসের কার্য। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শসমূহের মধ্যে আদান-প্রদান দ্বারা উভয়কেই সতেজ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া তিনি কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর দোষারোপ করিতেন না, এবং সর্বদা বলিতেন, ঐসকল অনুষ্ঠান এমন কোন অনাচার দূর করিবার প্রচেষ্টা হইতেই ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা সমালোচক মহাশয় খুব সম্ভবতঃ নিজের একগুঁয়েমিবশতঃ বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু ঘড়ির দোলক কোন একদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়িলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষে একদিন, পাত্রপাত্রীর নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহের পরিবর্তে অভিভাবকগণের ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া থাকে—এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওঃ! এদেশে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণাই রয়েছে! তার কতকটা অবশ্য সব সময়ে ছিল। কিন্তু এখন ইউরোপীয় ও তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি দেখে যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেছে। সমাজ জানতে পেরেছে যে, অন্য পথও একটা আছে।"

জনৈক ইউরোপবাসীকে তিনি আবার বলেন, "আমরা মাতৃভাবকে বাড়িয়ে তুলেছি, তোমরা জায়া ভাবকে ; এবং আমার মনে হয়, একটু আদানপ্রদান উভয় পক্ষেই লাভকর।"

তারপর সেই স্বপ্নের কথা, যাহা তিনি জাহাজে আমাদের নিকট এইরূপে বর্ণনা করেন—'স্বপ্নে আমি দুজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম : তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবাহের আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করছে, এবং শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু অংশ আছে, যা এখনও জগতের পক্ষে হিতকর, অতএব বর্জন করা উচিত নয়।' এই দৃঢ় বিশ্বাসহেতু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিবার জন্য তিনি অত সময় অতিবাহিত করিতেন।

তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে পত্নী স্বামীকে যেরূপ ভালবাসে, পুত্রকে পর্যন্ত স্বপ্নেও সেরূপ ভালবাসতে পারে না। তাকে সতী হতে হবে। কিন্তু স্বামী মাতাকে যত ভালবাসে, স্ত্রীকে তত ভালবাসতে পারবে না। সুতরাং ভারতবর্ষে পরস্পর আদান-প্রদানরূপ ভালবাসা প্রতিদানশূন্য ভালবাসার মতো উচ্চস্তরের বলে গণ্য হয় না। ওটা যেন 'দোকানদারি'। স্বামী-স্ত্রীর সব সময় পরস্পরের সান্নিধ্যলাভের আনন্দ ভারতবর্ষে উচিত বলে গ্রাহ্য হয় না। পাশ্চাত্যের কাছে এটা আমাদের নিতে হবে। আমাদের আদর্শকে তোমাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করে নিতে হবে। আর তোমাদের আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা নেওয়া প্রয়োজন।" কিন্তু তাঁহার উপস্থিতিমাত্রেই লোকের মনে অপর সকল চিন্তা অভিভূত করিয়া এই ধারণা বলবতী হইত যে—যাহাব উদ্দেশ্য কেবল আত্মার মুক্তি ও জগতের সেবা, গৃহসুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যপ্রয়াসী গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা সেই সন্ন্যাসজীবন অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহান শ্রেষ্ঠ কর্মিগণ মধ্যে মধ্যে পোষ্যবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। একবার জনৈক শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অতি সস্নেহে ও সহৃদয়তার সহিত বলেন, "যদি এই সব গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা কখনো তোমার মনে ছায়া ফেলে, তার জন্য বিচলিত হয়ো না। আমার মনেও কখনো কখনো ঐ ধরনের চিন্তা আসে।" আর একবার জনৈক বন্ধুর মুখে, তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করিতেছেন শুনিয়া বলিয়া ওঠেন, "প্রত্যেক কর্মী সময়ে সময়ে ঐরূপ বোধ করে থাকে।"

কিন্তু তাঁহার মতে কোন সামাজিক আদর্শকে অনর্থক বাড়াইয়া তোলার মধ্যে সমাজের গণ্ডির বাহিরে অবস্থিত যে মহান আদর্শ, তাহার চিরন্তন মাহাত্ম্যকে লাঘব

করারূপ অশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। জনৈক শিষ্যকে একবার তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, "তুমি যাদের শিক্ষা দেবে, তাদের প্রত্যেককে একথা বলতে কখনো ভুলো না—

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥'

—মেরু ও সর্ষপে, সূর্য ও খদ্যোতে, সমুদ্র ও গোষ্পদে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীর মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ।"

তিনি জানিতেন যে, ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক গর্বরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। তাঁহার নিজের পক্ষে এই বিপদ অতিক্রম করার উপায় ছিল এই যে, তিনি স্বয়ং তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তমাত্রের নিকটেই—তিনি গৃহী বা সন্ন্যাসী হউন—মস্তক নত করিতেন। কিন্তু উক্ত অনুশাসনবাক্যের মর্যাদা হ্রাস করার অর্থ তাঁহার দৃষ্টিতে আদর্শ খর্ব করা ; উহা তিনি কোনমতেই করিতে পারিতেন না। বরং তিনি অনুভব করিতেন, বর্তমান যুগে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের উপর ন্যস্ত অন্যতম মহান গুরুতর দায়িত্ব হইল, বিবাহিত জীবনেও সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করা ; উদ্দেশ্য, যাহাতে কঠিনতর পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ পথের উপর সর্বদা স্বীয় সংযমশক্তির প্রভাব প্রয়োগ করিতে পারে ; এবং প্রণয়ের আপাতমধুর যে মোহজাল যাহা হৃদয়-মনের একান্ত প্রীতিকর জীবনসঙ্গী অথবা সঙ্গিনীলাভের দোহাই দিয়া মানবজীবনের চরম লক্ষ্য আত্মার অদ্বিতীয় মহিমা ও স্বাধীনতা ঢাকিয়া ফেলিতে চায়—তাহা একেবারে ছিন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যই বিশ্বাস করেন যে, বিবাহের চরম পরিণতি নিজ পত্নীতে মাতৃবুদ্ধি ; ইহার অর্থ স্বামী-স্ত্রী উভয় কর্তৃক ব্রহ্মচর্য জীবন গ্রহণ। সেই মুহূর্ত হইতে মানব দেবত্বে লীন হয়, যাহার ফলে সমগ্র জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। পণ্ডিতেরা বলেন, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই আদর্শের যথার্থতা এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ চরম অবস্থায় উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিবাহসম্বন্ধের মধ্যে ভালবাসার বৃদ্ধি এবং হ্রাস—ক্রমাগত প্রবৃত্তির জোয়ার-ভাঁটা চলিতে থাকে। বাহ্যসম্বন্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রকৃতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এবং তখন আর প্রেমের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। এখন হইতে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত মন প্রেমাস্পদকে পূজা করিয়া থাকে।

তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করিতে গিয়া হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে কাশ্মীরে একদিন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে না করিয়া পারিতেছি না। সেদিন রবিবার, প্রাতঃকাল ; উভয় পার্শ্বে সারি সারি পপ্‌লার বৃক্ষের মধ্য দিয়া চওড়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে ; বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি নারীজাতি ও জাতিভেদ সম্পর্কে কথা বলিতে লাগিলেন, আমরাও মন দিয়া শুনিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, "হিন্দুধর্মের মহিমা এই যে, এর মধ্যে বিভিন্ন আদর্শের নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম কখনই একথা বলতে সাহস করেনি যে, ঐসব আদর্শের কোন একটিই একমাত্র সত্য পথ। এখানেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার প্রভেদ। বৌদ্ধধর্ম অন্য সকল আদর্শের ওপর স্থান দিয়েছে সন্ন্যাসকে, এবং তাঁর মতে সন্ন্যাস হলো সকল মুমুক্ষুর সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। মহাভারতে এক যুবক সাধুর গল্প আছে ; জ্ঞানলাভের জন্য তিনি প্রথমে এক বিবাহিতা নারী এবং পরে এক মাংসবিক্রেতার কাছে যেতে উপদেশ পান। এই গল্পটিই পূর্বের কথার সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ। জিজ্ঞাসার উত্তরে পতিব্রতা এবং ব্যাধ দুজনেই বলেছিলেন, বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেই আমরা এই জ্ঞানলাভ করেছি।" উপসংহারে স্বামীজী বলেন, "দেখছ, এমন কোন জীবিকা নেই, যার দ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া না যায়, তাঁকে লাভ করা শেষ পর্যন্ত কেবল প্রাণের ব্যাকুলতার উপর নির্ভর করে।"

জীবনে আদর্শ পবিত্রতার প্রকাশ অনুযায়ী সকল জীবনের মহত্ত্ব নির্ধারণ করিতে হয়, এই বিষয়টি মতবাদ হিসাবে স্বামীজী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু উহার কদর্থ করিয়া যে মিথ্যা দাবি করা হইয়া থাকে যে, বিবাহ শুধু ধর্মলাভের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সাধু হিসাবে স্বামীজী এই সকল উক্তি বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি বেশ জানিতেন, আত্মগরিমাবশতঃ আমরা সর্বদাই নিজ নিজ কার্য ও উদ্দেশ্য ঐরূপ অজ্ঞাতসারে বাড়াইয়া তুলি। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যদেশে প্রায়ই এমন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, যাহারা বিলাসের মধ্যে অলসভাবে জীবনযাপন করিলেও বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা নাই, কেবল কর্তব্যের খাতিরেই তাহারা সংসারে রহিয়াছে ; এবং নানাপ্রকার ভালবাসার মধ্য দিয়া বিনা প্রচেষ্টায় আপনা হইতে ত্যাগ অভ্যাসে সমর্থ হইয়াছে। অত্যন্ত ঘৃণার সহিত তিনি এই সকল অলীক কল্পনার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলেন, "আমার কেবল এই উত্তর ছিল যে, এই ধরনের মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মান না! মহাত্মা জনক রাজাই ছিলেন এরকম আদর্শ পুরুষ, এবং সমগ্র ইতিহাসে জনক রাজা মাত্র একবারই জন্মেছেন!" এই বিশেষ ভ্রম সম্পর্কে তিনি দেখাইয়া

দিতেন যে, দুই প্রকার আদর্শবাদ (Idealism) আছে, একটি— যথার্থ আদর্শকেই পূজা ও উচ্চাসন প্রদান করা ; অপরটি—আমরা নিজে যে অবস্থা লাভ করিয়াছি, তাহাকেই বাড়াইয়া স্বর্গে তোলা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদর্শকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের 'অহং'-জ্ঞানেরই নিম্নে আসন দেওয়া হয়।

কিন্তু তাঁহার এই কঠোর সমালোচনা কোন শুষ্ক দোষদর্শীর মতো ছিল না। যাঁহারা আমাদের গুরুদেবের 'ভক্তিযোগ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশেষ উক্তিটি মনে পড়িবে, "প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে আদর্শকেই দেখে।" এক বালিকার একজনের প্রতি অনুরাগের কথা তখন সবেমাত্র জানা গিয়াছে। স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "যতদিন তোমরা দুজনে পরস্পরের মধ্যে আদর্শকেই দেখতে পাবে, ততদিন তোমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সুখ না কমে বেড়েই যাবে।"

আমাদের গুরুদেবের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক প্রৌঢ়া মহিলার কিন্তু এই বিশ্বাস ছিল যে, সন্ন্যাসধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাবশতঃ বিবাহিতজীবনের পবিত্রতা ও উপকারিতা স্বামীজী যথার্থ বিচার করিতে পারেন নাই। উক্ত মহিলা বিবাহিত জীবনে অসাধারণ সুখভোগের পর দীর্ঘকাল বৈধব্যজীবন যাপন করিতেছিলেন। সুতরাং ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক যে, দেহাবসানের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে স্বামীজী এই বিষয়ে যে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হন, তাহা এই মহিলাকে জ্ঞাপন করিতে চাহিবেন। যে পত্রবাহক তাঁহার পত্রখানি মহিলার বহুদূরে অবস্থিত গৃহে পৌঁছাইয়া দিল, সে-ই স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদসহ প্রেরিত তারও ঐসঙ্গে তাঁহার হাতে দেয়। কে জানিত, পত্রখানি এরূপ দারুণ শোকের সময় যাইয়া উপস্থিত হইবে ? ঐ পত্রে, স্বামীজী লেখেন, "আমার মতে কোন জাতিকে ব্রহ্মচর্যের আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া তাহার মাধ্যমে মাতৃভাবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাবের অনুশীলন করিতে হইবে। রোমান-ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া প্রভূত শক্তিশালী মহাশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছে। আরবদিগের নিকট বিবাহ একটা চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার মাত্র, অথবা বলপূর্বক অধিকার, যাহা ইচ্ছামাত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। ফলে আমরা সেখানে চিরকুমারী অথবা ব্রহ্মচারীর আদর্শের বিকাশ দেখিতে পাই না। যে-সকল জাতি এখনও বিবাহবন্ধনের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তাদের হাতে পড়িয়া আধুনিক বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসকে অতি বিকৃত কদাচারপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং জাপানে যতদিন বিবাহ-সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও প্রণয় ব্যতীত একটা মহান ও পবিত্র আদর্শের বিকাশ না ঘটে, ততদিন কিরূপে উচ্চস্তরের সন্ন্যাসী ও

সন্ন্যাসিনীর সৃষ্টি হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যেমন ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটি পবিত্র ও অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের গৌরব, সেইরূপ আমিও ক্রমশঃ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই মহাপবিত্র বন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন; তাহা হইলেই কয়েকজন শক্তিশালী, আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতী পুরুষ ও নারীর উদ্ভব হইতে পারে।"

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, এই পত্রখানিতে স্বামীজী স্বয়ং যতটা অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেন, তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থ নিহিত আছে। ইহাই সেই মহান দর্শনের শেষ কথা, "বহু এবং একের মধ্যে সেই একই সত্য বিরাজমান।" যদি দাম্পত্য-বন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই বস্তুতঃ সমাজকে এরূপভাবে গঠিত করার সোপানস্বরূপ হয়, যাহাতে নির্জনবাস ও সংযমপূর্ণ সন্ন্যাসজীবনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত সাংসারিক কর্তব্যগুলির অনুষ্ঠান, পূজা এবং প্রার্থনাদির ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম উপায়স্বরূপ বলিয়াই গৃহীত হইবে। সুতরাং এখানে আমরা একটি সাধারণ নিয়মের পরিচয় পাই যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, কেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ভাবসমাধি প্রভৃতি ধর্মজীবনের উচ্ছ্বাসকে প্রশংসা না করিয়া বরং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা বিকাশের সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও যে কেন সর্বদা সকলকে বীর্যবান হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থও আমরা বুঝিতে পারি। উহার কারণ নির্ণয় অতি সহজ। যদি "বহু ও এক, একই মন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট একমাত্র সত্তা" হয়, তাহা হইলে এক কথায় বলা যায়, চরিত্রই ধর্ম। জনৈক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে জগতের সাধারণ জিনিসগুলি গ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের মধ্যে চলাফেরা করাই মহত্ত্ব, এবং গভীর প্রেম ও প্রভূত সেবাই সাধুতা।" এই সহজ কথাগুলিই হয়তো অবশেষে এযুগের নব ধর্মবাণীর প্রাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা যে সম্ভবপর, আমাদের গুরুদেবের নিজ কথাগুলিই তাহার নিদর্শন, "সর্বোচ্চ সত্য সকল সময়েই অতি সহজ।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্যদেবের সম্বন্ধ

ভারতবর্ষই নিঃসন্দেহে মনস্তত্ত্ব-চর্চার প্রকৃষ্ট স্থান। একথা বলা চলে যে, জগতের অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা হিন্দুদিগের নিকটই মানুষ অধিক পরিমাণে মন-রূপে প্রতিভাত হয়। চিত্তের একাগ্রতা তাদের নিকট জীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। ধীশক্তি ও প্রতিভা, সাধারণ সততা ও সর্বোচ্চ সাধুজীবন, নৈতিক দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা—এই সকলের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা একাগ্রতার সামান্য তারতম্য হইতেই উদ্ভূত বলিয়া তাহারা মনে করে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে মনস্তত্ত্ব-চর্চা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মতো যথোচিতভাবে অধীত হইয়া আসিয়াছে; বস্তুতঃ উহাই কতকাংশে হিন্দুজাতির এই তন্ময়তার কারণ, আবার কতকাংশে তাহার ফলও বটে। জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য লিখন-প্রণালীর উপকারিতা কিছুমাত্র অনুমান করিবার বহুপূর্বে, হিন্দুসমাজে সমষ্টি মানবমনের যাবতীয় ব্যাপার পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের আদান-প্রদান দ্বারা নিঃশব্দে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত সাধারণভাবে যন্ত্রপাতি ও রসায়নাগারের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে, এই চিন্তা উদিত হইবার বহু যুগ পূর্বে, ভারতবাসীর মধ্যে তাহাদের প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা অনুকূল এই বিজ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষার যুগ পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

ভারতবর্ষে এইরূপে সঞ্চিত ও অদ্ভুতভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে যে জ্ঞানরাজ্য, তাহার মধ্যে মনোরাজ্যের এমন অনেক ঘটনার যথোচিত সমাবেশ ও শ্রেণী-বিন্যাস যে থাকিবে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প-অভিজ্ঞ পাশ্চাত্যবাসীর নিকট অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়—ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং সম্মোহনী বিদ্যা এবং দুর্বোধ্য বহুপ্রকারের অসাধারণ অনুভব বা শক্তি—যেমন রোগ আরোগ্য করা, মনের কথা বলিয়া দেওয়া, দূরদর্শন এবং দূরশ্রবণ ইত্যাদি যাহা সাধারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

পরিচিত—যাঁহারা ভারতের প্রাচীন মনস্তত্ত্ব বা রাজযোগের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট একটা মস্ত কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রধান মূল্য এই যে, উহা আমাদের নানা ঘটনা বুঝিতে ও লিপিবদ্ধ করিতে সাহায্য করে। কোন একটি ব্যাধি বিরল হইলে কিছু ক্ষতি নাই—যদি সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে কোথাও একবার মাত্র উহার উল্লেখ থাকে। তাহা হইলেই মানবমনে উহার স্থান রহিয়া গেল। উহা আর অলৌকিক ব্যাপার নহে, কারণ শীঘ্র অথবা বিলম্বে উহার শ্রেণীনির্দেশ হইবেই। উহার একটি নাম আছে; রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা এখন শুধু সময়সাপেক্ষ।

সচরাচর যাহাকে 'অলৌকিক' দর্শনাদি বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই সকল ঘটনার যে অংশ বিশ্বাসযোগ্য, তাহার সম্পর্কে পূর্বোক্ত কথা কিছুটা প্রয়োগ করা চলে। এই পর্যায়ভুক্ত ঘটনাবলী সত্য হইলে স্পষ্টতই উহা বায়ুর তরলীকরণ বা রেডিয়ম পৃথককরণ অপেক্ষা বেশি অলৌকিক থাকে না। বাস্তবিক, 'অলৌকিক' বা 'অতিপ্রাকৃত' কথাটি আদৌ সঙ্গত কিনা তাহা বিতর্কমূলক। কারণ, যদি কোন জিনিসের অস্তিত্ব একবার প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা প্রকৃতির অন্তর্গত, এবং সেজন্য উহাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলা নিতান্ত অযৌক্তিক। ভারতবর্ষে আলোচ্য ঘটনাসমূহ মনোবৃত্তির সমধিক বিকাশের ফল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; এবং ঘটনার মধ্যে উহাদের ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া, যে ব্যক্তি ঐ-সকল উপলব্ধি করিয়াছে তাহার মনের অবস্থার অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে; কারণ, ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ঐ মন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাধারণ অনুভব হইতে পৃথক এক এক রূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে।

চিত্তের চরম একাগ্রতার যে-সকল লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মধ্যে ঐ সকল মানসিক বিকাশের বহু ঘটনার পরিচয় পান। বাহ্যজগতের ঘটনাসমূহ তিনি এমন জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এবং বালকেরা যে-সব লিখিত-প্রশ্ন পকেটে করিয়া আনিতেন, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার অনুভূতি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি স্পর্শমাত্র বলিয়া দিতে পারিতেন, কিরূপ চরিত্রের লোক তাঁহার খাদ্যসামগ্রী, কাপড়-জামা অথবা বিছানা স্পর্শ করিয়াছে। একবার ঐরূপ স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গ যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত

হইয়া সরিয়া আসে এবং তিনি বলিয়া ওঠেন যে, তিনি দাহ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। আর এক ঘটনায় হয়তো বলিলেন, "এই দেখ! এটা আমি খেতে পারি; যে পাঠিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ভাল লোক।" আবার তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবের এরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, নিদ্রিত অবস্থাতেও তিনি ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না, এবং কোন পুস্তক বা ফল উহার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিয়া গেলে তাঁহার হাত যেন আপনা হইতেই উহা যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া আসিত।

কোন ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্ জগতের ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষগণের কাহারও সম্বন্ধে একথা বলিবেন না যে, উক্ত মহাপুরুষ দেবতাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন; তাঁহারা শুধু বলিবেন যে, তিনি এমন একটি মানসিক ভাবাবস্থায় উপনীত হইতে পারেন, যেখানে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে, তিনি দেবতাদের সহিত কথা কহিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকের মতে উহা 'স্বসংবেদ্য' ব্যাপার। এই অবস্থার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ দেখিয়াছেন। তাঁহারা এখনও গল্প করিয়া থাকেন, কিরূপ বিস্ময়ের সহিত তাঁহারা কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দুইজন অথবা বহুজনের মধ্যে কথাবার্তা হইতেছে শুনিতেন—তাহার মধ্যে এক পক্ষের কথাগুলিই শুধু তাঁহাদের কানে আসিতেছে; এদিকে তাঁহাদের গুরুদেব শান্তভাবে বিশ্রাম করিতে করিতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেন যে, শিষ্যগণের অদৃশ্য দেবদেবীর সহিত ধ্যানযোগে তিনি কথাবার্তা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সকল অজস্র দর্শনের পশ্চাতে সর্বদাই ছিল মানবসেবার দৃঢ় সঙ্কল্প। উহাই এই সকলকে এক মহাজীবনরূপে গ্রথিত করিয়াছিল। বহুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে বলিতেন, রাত্রির অন্ধকারে মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তিনি প্রার্থনা করিতেন, আবার যেন তিনি পৃথিবীতে—এমন কি, কুকুরযোনিতেও— জন্মগ্রহণ করেন, যদি তাহা দ্বারা একটি জীবেরও সহায়তা হয়। অন্যান্য সময়ে যখন মনের কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তখন তিনি বলিতেন, উচ্চতর দর্শন তাঁহাকে সেবার ভাব হইতে টানিয়া লইবার জন্য প্রলোভিত করিতেছে। গভীর সমাধিভঙ্গের পর তিনি যে দুই-চারিটি কথা, আপন মনে বলিতেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাহা ঐ বিষয়ক বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি যেন শিশুর ন্যায় মাতার নিকট হইতে দৌড়িয়া গিয়া খেলিবার জন্য জগন্মাতার নিকট আব্দার করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামিয়া আসিবার জন্য তিনি, 'আর একটি মাত্র সেবাকাজ', অথবা 'আর একটি ছোটখাট

জিনিস' ভোগ করিব, এই বলিয়া বায়না ধরিতেন। কিন্তু সমাধি হইতে ঐ ব্যুত্থানকালে ঈশ্বরে একান্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাতে সর্বদা অনন্ত প্রেম ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি পরিলক্ষিত হইত। হার্ভার্ড বক্তৃতা উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঐ দুইটিকেই সমাধিজনিত বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ও মৃগীরোগহেতু বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা, এই উভয়ের মধ্যে লক্ষণের পার্থক্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার গুরুদেবের জীবনে সমাধি অবস্থা লাভ ও পুনরায় ঐ অবস্থা হইতে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন—এই উভয় অবস্থা তিনি সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রত্যেক কথার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় বিরাজ করিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার উপর তাঁহার কিরূপ সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, শেষ অসুখের সময় তিনি গলদেশ হইতে মনকে একেবারে তুলিয়া লইতে পারিতেন, ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা ক্ষতস্থান অসাড় করিয়া ফেলিলে অস্ত্রোপচারের পর যেরূপ হয়, সেইরূপ কোন বেদনা অনুভূত হইত না। সকল জিনিস তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য করিবার শক্তিও ছিল তাঁহার অসাধারণ। শারীরিক গঠনের খুঁটিনাটিও তাঁহার নিকট অর্থপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত, এবং উহার মধ্যে তিনি ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না কিছু পরিচয় পাইতেন। নবাগত শিষ্যকে তিনি একরূপ যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাহার মগ্নচৈতন্য হইতে, কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু অতীতের যে-সকল সংস্কার নিহিত আছে, তাহা জানিয়া লইতেন, অপরের নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয় এরূপ প্রত্যেক সামান্য কথা ও কার্য তাঁহার নিকট চরিত্ররূপ মহাপ্রবাহে নীত তৃণখণ্ডের ন্যায় ঐ স্রোতের গতি নির্দেশ করিয়া দিত। তিনি বলিতেন, "কখন কখনও এমন একটা অবস্থা হয়, যখন নরনারীকে কাচের জিনিসের মতো বোধ হয়, এবং তাদের ভেতর-বার সব দেখতে পাই।"

সর্বোপরি, স্পর্শমাত্র তিনি লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতে পারিতেন, এবং তাহাদের সমগ্র জীবন এক নূতন শক্তিপ্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইত ; সমাধিবিষয়ে একথা সকলেই জ্ঞাত আছেন, বিশেষতঃ যে-সকল স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের সম্পর্কে। কিন্তু ইহা ব্যতীত একজন অতি সাদাসিধা প্রকৃতির লোক আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়মাসের একদিনের এক ঘটনার কথা বলেন। ঐদিন কাশীপুর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি সমবেত ভক্তদের মাথায় হাত দিয়া কাহাকেও বলেন, 'চৈতন্য হোক,' আবার কাহাকেও বলেন, 'আজ থাক' ; এইভাবে সকলকে কিছু না কিছু বলেন। ইহার পরেই কৃপাপ্রাপ্ত

ভক্তদের প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি হয়। একজনের মনে অত্যন্ত বেদনা জাগিয়া ওঠে; অপর একজনের নিকট চারিপাশের সকল জিনিস ছায়ার ন্যায় অবাস্তব ও কোন একটি ভাবের ব্যঞ্জকমাত্র হইয়া ওঠে। তৃতীয় ব্যক্তি ঐ কৃপা অপার আনন্দরূপে অনুভব করেন। আর একজনের মহান জ্যোতি দর্শন হয়, যাহা তাঁহাকে কদাপি পরিত্যাগ করে নাই; কোন মন্দিরে অথবা পথিপার্শ্বস্থ দেবালয়ের নিকট দিয়া যাইবার সময় তিনি সর্বদা ঐ জ্যোতি দেখিতে পাইতেন, এবং বোধ হইত ঐ জ্যোতির মধ্যে তিনি একটি মূর্তি দেখিতে পাইতেছেন; সেই মুহূর্তে তিনি যেরূপ দর্শনের উপযুক্ত হইতেন সেই অনুসারে, ঐ মূর্তি কখনও হাস্যময়, কখনও বিষণ্ণ। 'বিগ্রহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য' বলিয়াই তিনি ঐ মূর্তিকে জানিতেন এবং সেইরূপভাবে তাহার সম্বন্ধে বলিতেন।

এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তাহার অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ ও সার বস্তুর উদ্বোধন করিয়া দিয়া, অথবা যিনি যে পরিমাণে গ্রহণের উপযুক্ত হইতেন, সেই অনুসারে নিজের অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কঠোর সত্যপরায়ণতা এবং প্রবল বিচারবুদ্ধির সূত্রপাত ও সংরক্ষণ করিয়া যান, যাহা তাঁহার হাতে গড়া সকল শিষ্যের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে একজন বলেন, "কোন কিছু পরীক্ষা না করে আমরা বিশ্বাস করি না, ঠাকুর আমাদের ঐরকমভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।" আর একজনের নিকট ঐ শিক্ষা কিরূপ বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করায় গভীর চিন্তার পর তিনি উত্তর দেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই চরম সত্তার কিছু না কিছু অনুভূতি করাইয়া দিতেন; তাহা হইতে প্রত্যেকে এমন একটি জ্ঞান লাভ করিতেন, যাহা কখনও প্রতারণা করিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম বয়সের বক্তৃতাগুলির একটিতে বলিয়াছেন, "আমাদের নিজের চেষ্টায় অথবা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় আমরা সেই চরম বস্তু লাভ করি।"

গুরুর জীবনই শিষ্যের করতলগত সম্পদ, এবং এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহের কতদূর সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে, সে সম্পর্কে স্বামীজী নিজ দৃষ্ট ও অনুভূত সকল ঘটনা তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, পাশ্চাত্যদেশের মনোরাজ্যবিষয়ক গবেষণার সংস্পর্শে আসিবামাত্র তিনি সমগ্র জ্ঞানকে অবচেতন (sub-conscious), সাধারণ বা চেতন (conscious) এবং অতিচেতন বা অতীন্দ্রিয় (superconscious)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে

পারেন। প্রথম শব্দ দুইটি ইউরোপ এবং আমেরিকায় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তৃতীয়টি তিনি নিপুণ সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং নিজ জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতির বলে মনস্তত্ত্ববিষয়ক শব্দসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। একবার তিনি বলেন, "সাধারণ জ্ঞান অবচেতন ও অতিচেতন (অথবা অতীন্দ্রিয়) জ্ঞানরূপ দুই মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত একটা সামান্য পাতলা পর্দামাত্র।" তিনি সবিস্ময়ে আরও বলেন, "যখন আমি পাশ্চাত্য জাতিদের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে এত বড়াই করতে শুনলাম, তখন আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। সাধারণ জ্ঞান ? সাধারণ জ্ঞানে কি আসে যায় ? তার নিচে অতলস্পর্শ সাগরের মতো যে মগ্নচৈতন্য এবং উপরে যে পর্বততুল্য উচ্চ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান রয়েছে, তাদের তুলনায় সাধারণ জ্ঞান কিছুই নয় ! এ সম্পর্কে আমার ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আমি কি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দশ মিনিটের মধ্যে লোকের মগ্নচৈতন্য থেকে তার সমগ্র অতীত জেনে নিতে এবং তা থেকে তার ভবিষ্যৎ এবং অন্তরের শক্তি নিরূপণ করতে দেখিনি ?"

প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহিত বিচারবুদ্ধির কখনও বিরোধ থাকিতে পারে না—'রাজযোগে' লিপিবদ্ধ এই উক্তির সত্যতাও নিঃসন্দেহে তাঁহার উপলব্ধির বিস্তৃত জ্ঞানরাজ্যের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। দক্ষিণেশ্বরের ঐ সাধুর নানা অসাধারণ উপায়ে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য বৃথা অভিমানে আত্মহারা হইয়া সাধারণ উপায়ে যাহা নিশ্চিত জানা যায়, তাহা জানিবার জন্য তিনি কখনও অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়াস পাইতেন না। একবার এক অদ্ভুত সাধুবেশধারী ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে আসিয়া বলে যে, সে আহার ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারে। তাহাকে পরীক্ষা করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কোন অলৌকিক দর্শনের সাহায্য লইবার চেষ্টা করিলেন না, কেবল কয়েকজন চতুর প্রকৃতির লোক পাঠাইয়া দিলেন, তাহার উপর নজর রাখিবার জন্য, এবং বলিয়া দিলেন, ঐ ব্যক্তি কি আহার করে এবং কোথায় আহার করে তাহা যেন তাঁহাকে জানায়।

পরীক্ষা না করিয়া কোন জিনিস গ্রহণ করা চলিবে না, এবং স্বপ্ন, পূর্ব হইতে ভাবী ঘটনা দর্শন করা ও তৎসম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদি যে-সব উপায়ে সাধারণ লোক পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য এত চেষ্টা করিয়া থাকে, দেহত্যাগের দিন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ঐ সকল আতঙ্কের বস্তু ছিল। আবার লোকে ঐ সকল তাঁহার নিকট প্রভূত পরিমাণে উপস্থিত করিত। অবশ্য উহা করিবারই কথা, স্বামীজী কিন্তু এ-সব সর্বদা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, যদি উহারা সত্য হয়, তবে তাঁহার না মানা সত্ত্বেও নিজ নিজ ফল প্রকাশ

করিয়া দেখাক। তিনি বলিতেন, কোন ভবিষ্যদ্বাণী কার্যক্ষেত্রে সত্য হইবে কি-না, সে কথা জানা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেবল এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, একবার উহা মানিয়া লইলে আর কখনও তিনি উহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখা যাইত, অলৌকিক দর্শনাদি কেবল পারমার্থিক বিষয়েই প্রযুক্ত হইত; কদাপি উহার ব্যতিক্রম ঘটিত না। বেদিয়াদের মতো গণনা দ্বারা ঐহিক বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি কখনও করিতেন না, এবং তাঁহার শিষ্যগণের মতে ভবিষ্যৎগণনা শক্তির অল্পবিস্তর অপব্যবহারের সূচনা করে। স্বামীজী বলিতেন, "এসব অবান্তর ব্যাপার, প্রকৃত যোগ নয়। অপরোক্ষভাবে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলে এদের কতটা প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। একটু সামান্য আভাসেও মানুষের বিশ্বাস হয় যে স্থূল জড় জগতের বাইরে একটা কিছু আছে। কিন্তু যারা এসব জিনিস নিয়ে সময় কাটায়, তাদের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা আছে।" আর একবার অসহিষ্ণুভাবে তিনি বলিয়া ওঠেন, "এসব 'সীমান্ত-সমস্যার ব্যাপার' (frontier questions). এগুলোর সাহায্যে কোন নিশ্চিত বা দৃঢ় জ্ঞানলাভ করা যায় না। আমি কি বলিনি, ও-সব 'সীমান্ত-সমস্যার ব্যাপার'? সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা সব সময়েই বদলে যাচ্ছে!"

আমাদের সামনে যাহা কিছু আসুক, বিচারপূর্বক উহা বুঝিবার প্রচেষ্টা সর্বদা থাকা চাই। কাহারও অলৌকিক দর্শনাদির কথা শুনিলে বলিতেই হইবে, 'নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করলে তবেই আমি ওটা সত্য বলে গ্রহণ করব।' কিন্তু আমাদের নিজেদের অনুভূতিকেও সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কোন অলৌকিক ঘটনার যে ব্যাখ্যা প্রথমেই মনে আসিল, তাহাকেই সার জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। চট্ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীজী শেষের দিকে পরলোকগত আত্মার পুনরাগমন সম্পর্কে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ইচ্ছাপূর্বক তিনি বলেন, "আমি জীবনে অনেকবার ভূত দেখেছি এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে এক জ্যোতির্ময় অশরীরী আত্মা দেখেছি।" কিন্তু ইহা দ্বারা একথা বুঝায় না যে, ভূতুড়ে কর্তৃক ভূত নামাইবার যে-সকল চেষ্টা ও পরীক্ষা, তাহার অধিকাংশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ একদিনের ঘটনায় জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে উক্ত দলভুক্ত দেখিয়া তিনি বলেন, জাগতিক সকল বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি যে তথাকথিত এক মিডিয়ামের (ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির) সামনে আসিয়াই সমস্ত বলবুদ্ধি খোয়াইয়া বসে, ইহা

বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমেরিকায় কয়েকটি ভূতনামানো ব্যাপারে তিনি দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, এবং ঐ সময়ে প্রদর্শিত অলৌকিক ব্যাপারের অধিকাংশই তিনি মনে করিতেন সম্পূর্ণ জুয়াচুরি। সব দেখিয়া শুনিয়া তিনি সার মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, "সর্বত্রই অতি সহজ উপায়ে অতি বড় জুয়াচুরি চলে থাকে।" আবার তিনি মনে করিতেন যে, এই সকল ঘটনার একটা বড় অংশকে বহির্জগতের সত্য না বলিয়া অন্তর্জগতের ব্যাপার হিসাবে ব্যাখ্যা করিলেই ভাল।[১] যদি এই সকল বাদ দিবার পরেও উহাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেটুকু বাস্তবিক যথার্থ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু যদি এইরূপই হয়, তথাপি এই মায়িক জগতের জ্ঞানলাভ আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দুই-চারিজন ভ্রাম্যমাণ জীবের কোন সূক্ষ্ম জগৎ হইতে স্থূল জগতে প্রত্যাবর্তনের দ্বারা অমৃতত্বের প্রকৃত ধারণা সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করা যায়। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

স্বামীজীর মতে ভূতপ্রেতাদি লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করার ফলে বাসনা ও অহঙ্কারের বৃদ্ধি হয়, এবং অসত্যে পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। যদি আত্মার জন্য জীবনের সাধারণ ভোগ-বাসনাই পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে এইসকল অলৌকিক ক্ষমতা আরও কতক অধিক পরিমাণে ত্যাজ্য! এমনকি, খ্রীস্টধর্মে সিদ্ধাই-এর ব্যাপার যদি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি উহাকে উচ্চতর ধর্ম বলিয়া মনে করিতে পারিতেন। সিদ্ধাই-এর প্রতি ভগবান বুদ্ধের দারুণ ঘৃণা বৌদ্ধধর্মের চিরন্তন গৌরব। উহাদের মূল্য সম্পর্কে বড় জোর এই কথা বলা যায় যে, উহারা বিশ্বাস-উৎপাদনে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে, তাহাও আবার ধর্মশিক্ষার প্রথম স্তরে। বাইবেলের ভাষায়, "সিদ্ধাই প্রভৃতি যাহা কিছু সব লোপ পাইবে। একমাত্র প্রেমই চিরকাল থাকিবে।" যে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এইসব প্রলোভন দূর করিতে পারেন, তাঁহার নিকটেই সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথায়, "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ"—যিনি সিদ্ধিসমূহ

১ যেমন, দাক্ষিণাত্যে একব্যক্তি মনের কথা বলিয়া দিবার ক্ষমতার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। সে বলিত, এক অদৃশ্য স্ত্রীমূর্তি তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়া দিত, তাহাকে কি বলিতে হইবে। স্বামীজী বলিতেন, "এই ব্যাখ্যা আমার পছন্দ না হওয়ায় আমি অপর ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।" তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সে নিজের ভিতর হইতেই ঐসকল তথ্য লাভ করিত

সমূলে পরিহার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারই ধর্মমেঘ নামক সমাধিলাভ হয় ; তিনিই ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু সম্বন্ধে স্বামীজীর শিক্ষা

আমাদের আচার্যদেব যে-সকল উপায় অবলম্বনে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহার মধ্যে অন্যতম অতীব হৃদয়গ্রাহী হইল যে, তাঁহার সান্নিধ্যই শিষ্যের মধ্যে নীরবে অজ্ঞাতসারে একটা পরিবর্তন আনিয়া দিত। তাহার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটিত, কোন একটি নির্দিষ্টভাবে সে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইত, অথবা সহসা দেখিতে পাইত, কোন বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সমগ্র অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে একটি নূতন মতের উদ্ভব হইয়াছে—অথচ ঐ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটি কথারও আদানপ্রদান হয় নাই। মনে হইত, তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থানহেতুই যেন কোন বস্তু তর্কযুক্তির রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং আপনা হইতে ঐ সম্পর্কে জ্ঞান জন্মিয়াছে। এইরূপেই রুচি ও মূল্য-সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন যেন অবাস্তব হইয়া যাইত। এইরূপেই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে ত্যাগের বাসনা জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। আর তাঁহার সান্নিধ্যে মৃত্যু সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণা সঞ্চারিত হইত, তৎসম্পর্কে এই কথাটি সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য।

তাঁহার জীবিতকালে এ-বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন করার ব্যাপারে তিনি ক্রমশঃ অধিকতর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই চিরন্তন সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় তাঁহার মতামত কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিতেন, "আমার মনে হয় এইরকম, আমি ঠিক জানি না।" সম্ভবতঃ তিনি অনুভব করিতেন, ভবিষ্যৎ সুখের আনন্দময় স্বপ্নের মধ্যে একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বার্থপরতা থাকে এবং দেহত্যাগের পরের অবস্থার উপর ঝোঁক দিয়া লোকের বাসনাজনিত অজ্ঞতা বর্ধিত করিতে তিনি ভয় পাইতেন। তাঁহার নিজের পক্ষে জীবন ও মরণে ঈশ্বরই একমাত্র উপায় এবং

নির্বাণই ছিল একমাত্র চরম লক্ষ্য। "সর্বোচ্চস্তরের সমাধিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, বাকি আর সবই বাজে জিনিস।" তথাপি এই তথ্য হইতেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কিরূপে তাঁহার শিক্ষায় লোকের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন ঘটিত, এবং যে দুই-তিনখানি পত্রে ব্যক্তিগত অনুভব ও সহানুভূতির প্রেরণায় এ সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্ট একটি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাই পত্রগুলিকে সমধিক মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে যখন আমি স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করি তার পূর্ব হইতেই এই ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, শরীর ত্যাগের পরেও আমাদের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন বাস্তব কারণ নাই। এরূপ ব্যাপার হয় অসম্ভব, না হয় অচিন্তনীয়। মন ব্যতীত যদি শরীরের অনুভূতি না হয় (কারণ, মন দ্বারাই আমরা ঐ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি), তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, শরীর ব্যতীত মনের অস্তিত্বও আদৌ কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং মন যদি "বীণার তারে ঝঙ্কারের মতো" বাস্তবিক শরীরের পরিণাম না হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও মন উভয়ে একই বস্তুর বিপরীত প্রান্ত মাত্র। শরীর ও মন—জড়পদার্থ ও মন নয়—উহারা একই জিনিস, এবং মৃত্যুর পরেও ব্যক্তিরূপে অস্তিত্বের ধারণা জৈব-সংস্কারপ্রসূত একটা ছায়া মাত্র। নৈতিক আচরণ, এমনকি পূর্ণ আত্মত্যাগে যাহার পরিণতি, তাহাও আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ভোগগুলিকে গ্রহণ করা-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

---

১ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপের মৃত্যু সম্পর্কীয় ধারণা কতকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে। একজন মনীষী বলিয়াছেন, "আত্মা কি বীণার তারে উৎপন্ন ঝঙ্কারের মতো, অথবা বৈঠা ধরিয়া নৌকায় উপবিষ্ট মাঝির মতো?" জড়পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অধুনা প্রচলিত কথাবার্তা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও একথা বলা সহজ করিয়া দিয়াছে যে, "একটা পরিণাম অবস্থা (cycle) কল্পনা করা—উহাকে 'মন' বলিতে পার—যাহাতে জড়পদার্থ একপ্রকার নাই বলিলেই চলে।" কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দেশসমূহের জন্য বিশেষভাবে দেখানো প্রয়োজন যে, কিরূপে ব্যষ্টি শরীর-মন এই সমষ্টি জড়পদার্থ ও মনকে আশ্রয় করে যাহাতে উভয়ই একাকার হইয়া যায়। এখানে একথা বলা অভিপ্রায় নহে যে, সকল ধর্মে নীতিসম্মত আচরণ শেষ পর্যন্ত আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে; এখানে শুধু অজ্ঞেয়বাদী ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বৈপরীত্য তাহাই প্রদর্শন করা হইতেছে। অজ্ঞেয়বাদী নিচ হইতে উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে চাহেন; হিন্দুধর্মমতে বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের দেহবুদ্ধি আধ্যাত্মিক জীবনের স্থূল বিকাশ ও আবরণ মাত্র। এই অধ্যাত্ম-

ভারতের মনীষিবৃন্দ মনকেই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু জ্ঞান করিয়া অভ্যাস অনুযায়ী উহার উপরেই সর্বপ্রকার জোর দিয়া থাকেন। আমার নিজের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ধারণাসমূহ তাঁহাদের ঐ প্রকার চিন্তা দ্বারা ব্যাহত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ব্যক্তির বিশ্বাস যে, মানুষ একটা দেহ। এ বিষয়ে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, কারণ, ঐ সংস্কার তাঁহাদের মজ্জাগত। স্বামীজী যেমন নির্দেশ করিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্যের সকল ভাষায় বলা হয়, মানুষ একটি দেহ এবং তার আত্মা আছে; কিন্তু প্রাচ্য ভাষাগুলিতে বলা হয় যে, মানুষ আত্মা; এবং তার একটা দেহ আছে।"

আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে এই নূতন ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ লোকদের সহিত কথা বলিবার সময় আমি ঐ বিষয়টি পরীক্ষামূলকভাবে নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে, বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিবর্তে আমি তাঁহাদের ভিতরের মনের সহিত কথা কহিতেছি। এই পরীক্ষায় যে বিপুল পরিমাণে সাড়া পাইলাম, তাহাই আমাকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবশেষে বৎসরান্তে সহসা একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, মনকে প্রাধান্য দেওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। ফলে শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিনাশ আমি আর কল্পনা করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক নূতন প্রচেষ্টা এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নিশ্চিতভাবে এই ধারণা হইয়া গেল যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বাস্তবিকই মনঃপ্রসূত; এবং কোন এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে (যেমন, দেহত্যাগকালে) চিন্তারাজ্যে কোন আকস্মিক বিরাট পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা অনেক গভীরতর ছিল। তাঁহার সর্বদা চেষ্টা ছিল কোন প্রকারে যেন দেহাত্মবুদ্ধি না আসিতে পারে। 'আমি' শব্দটি তিনি কখনও এমনভাবে প্রয়োগ করিতেন না, যাহাতে কেহ ঐরূপ অর্থ করিতে পারে; বরং ঈষৎ অঙ্গভঙ্গির সহিত 'এইটা বা এইসব' বলিয়া শরীরকে নির্দেশ করিতেন। অবশ্য পাশ্চাত্যবাসীর কর্ণে উহা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত শুনাইত। কিন্তু সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা সীমিত ইন্দ্রিয়নির্ভর জীবনকে জীবন বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতে চাহিতেন না, কারণ

জীবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আত্মরক্ষার জন্য নহে, আত্মোৎসর্গই উহার উদ্দেশ্য। আধুনিকগণ বিচার দ্বারা দৃষ্ট পদার্থ হইতে অদৃশ্যে পৌঁছাইতে চান, বিশেষ হইতে সামান্যে উপনীত হন; হিন্দুগণ সাধারণ বা সর্বজনীন হইতে বিশেষের বিচার করেন এবং এই অভিমত পোষণ করেন যে, মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিবার উহাই প্রকৃষ্ট বিচার পন্থা, কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমরা একমাত্র আত্মার জীবন সম্বন্ধেই অবগত আছি

উহাতে অনেক গোলমালের আশঙ্কা উঠিতে পারে। জয়-পরাজয়, ভালাবাসা-ঘৃণা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা—প্রত্যেকটি ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ মাত্র এবং সেজন্য কখনই সম্মিলিতভাবে তাহারা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে পারে না। স্বামীজী যেমন বলিতেন, আমাদের বর্তমান জীবনের ন্যায় শত শত জীবন, যথাকালে যাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাহার দ্বারা অমৃতত্ব-পিপাসার নিবৃত্তি কদাপি সম্ভব নহে। অতএব মরণ-রহিত অবস্থালাভ ব্যতীত অপর কিছুই চলিবে না, এবং এই অবস্থাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবনেরই বহুল পুনরাবৃত্তি, অথবা তাহারই কিঞ্চিৎ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থামাত্র বলিয়া কদাপি ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয়তার জন্য ইহজীবনেই অমৃতত্ব লাভ করা প্রয়োজন, নতুবা আর অন্য কোন উপায়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে যে, আমরা শরীরবোধকে অতিক্রম করিতে পারিতেছি? পাশ্চাত্যবাদীরা বলিতে অভ্যস্ত, 'আত্মা আসেন এবং যান'; এইরূপে তাঁহারা দেহাত্মবুদ্ধি প্রবণতার পরিচয় দেন; যেন তাঁহারা এক উচ্চতর সত্তার আগমনির্গম প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সেন্ট অগাস্টিনকে অভিনন্দনপূর্বক কেন্টপ্রদেশবাসী ড্রুইড পুরোহিত প্রদত্ত বক্তৃতাই একশ্রেণীর লোকের ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহাদের মতে, জগৎ একটি উষ্ণ, আলোকিত বৃহৎ কক্ষ, এবং আত্মা যেন একটি পক্ষী, বাহিরে শীত ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য ঐ কক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। তথাপি ইহার বিপরীত ধারণার ন্যায় এই ধারণাতেও, অনুরূপ বহু বিষয় সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি বিচার দ্বারা দৃঢ়ভাবে এই ধারণায় উপনীত হন যে, আমরা আদৌ কতকগুলি ভৌতিক এককের সমষ্টি নই, পরন্তু ভৌতিক পদার্থের সীমানার বাহিরে এক অখণ্ড বস্তু, যাহা ঐ ভৌতিক পদার্থগুলিকে আলগাভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার নিকট সমভাবেই একথা সত্য যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে এইমাত্র জানি "দেহই আসে ও যায়।"

এইরূপে ক্রমাগত মানুষকে শরীরের পরিবর্তে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবার উপর জোর দেওয়ায়, যাঁহারা স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মৃত্যু আর একটা অবশ্যম্ভাবী অন্তিম অবস্থা (যাহার পর আর কিছু নাই) বলিয়া বোধ হয় না; মৃত্যু তাহাদের নিকট আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ শৃঙ্খলের একটা আংটা মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। আলোকিত কক্ষের পরিবর্তে জীবন আমাদের নিকট মোহ ও অজ্ঞানময় কারাগারে অথবা বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক চেতনাময় স্বপ্নে সঞ্চরণ বলিয়া বোধ হইল। বাক্যোচ্চারণ কি চিরকাল মানবীয় ভাষার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও নিয়ন্ত্রিত থাকিয়া যাইবে? মধ্যে মধ্যে

আমরা কি এই সকলের পারে অবস্থিত এমন একটা কিছুর ক্ষণিক আভাস পাই না, এমন এক সত্তার, বাক্যের সাহায্য ব্যতীত যাহা আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত করায়, বাহ্য শিক্ষার অপেক্ষা না করিয়া যাহা আমাদের অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত করে—যাহা অপরোক্ষ, গভীর এবং প্রাণে প্রাণে উপলব্ধিস্বরূপ ? জ্ঞান কি চিরকালই সসীম এবং অস্পষ্ট পুরাতন ইন্দ্রিয়-অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আর চিরদিন কঠোর ও সঙ্কীর্ণ আচরণবিধির মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করিবে ? নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামীজী যেন প্রাণের গভীর কাতরতা হইতে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "অনন্ত অসীম স্বপ্নদ্রষ্টা মানব সান্ত পরিচ্ছিন্ন স্বপ্নে মগ্ন !"

এইপ্রকার ধারণাসমূহ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দর্শন, তাঁহার নিজের সর্বদা মৌনাবলম্বনপূর্বক ত্বগম্বরমাত্র হইয়া গঙ্গার তীরে প্রব্রজ্যার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, সমাধি অবস্থালাভই একমাত্র বাঞ্ছনীয় জ্ঞান বলিয়া অবিরত নির্দেশ প্রদান এবং আত্মার স্বাধীনতার পক্ষে জাগতিক সম্বন্ধগুলি বন্ধন ও বিঘ্নস্বরূপ এই দৃষ্টিভঙ্গি—প্রকৃতপক্ষে এইসকল উপায়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হাতে যেন একটা মাপকাঠি দিয়া গিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা প্রকৃত সত্তা কি, তাহা নিরূপণ করা চলে। ইহার ফলে শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রকৃত সত্তার মধ্যে কোন গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এ ধারণা ক্রমশঃ তাঁহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই ধারণা আমাদের মজ্জাগত হইয়াছিল যে, জীবনের আনুষঙ্গিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের বাহ্য অবয়ব মাত্র, এবং স্পষ্ট বোধ করিতাম, আমাদের এই জীবনযাত্রা মৃত্যুর পূর্বের ন্যায় মৃত্যুর পরেও বর্তমানের মতো অব্যাহত থাকিবে ; কেবল এইটুকু পার্থক্য ঘটিবে যে, মৃত্যুব পরে সূক্ষ্মতর দেহ অবলম্বনহেতু গতির তীব্রতা বর্ধিত হইবে। আর ইহাও আমাদের নিকট স্পষ্টতর হইয়াছিল যে, তিনি যেমন বলিতেন—ইহজীবনের কর্মপ্রসূত 'অনন্ত' স্বর্গ অথবা নরক একটা অবাস্তব কথার কথামাত্র, সসীম কারণ কোন উপায়ের মাধ্যমেই অনন্ত ফল প্রসব করিতে পারে না।

তথাপি স্বামীজী এ বিষয়ে অপরের মানিয়া লইবার জন্য কোন বাঁধাধরা সিদ্ধান্ত নির্দেশ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহাদের তিনি সত্য সম্পর্কে নিজ দর্শন-শক্তি সহায়ে এবং উপলব্ধ সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেন তাহারই প্রভাবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী তাঁহারা যতদূর পারেন ততদূর তাঁহাদেব লইয়া যাইতেন। কিন্তু কোন অপরিবর্তনীয় মতামতের তিনি ধার ধারিতেন না, এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার

একান্ত বিরোধী ছিলেন। যেমন পূর্বেই বলা হইয়াছে, যত দিন যাইতে লাগিল, 'মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয়?'—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার একমাত্র বক্তব্য হইয়া দাঁড়াইল, "আমি বলতে পারি না!" তাঁহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া নিজের বিশ্বাস গঠন করিয়া লইতে হইবে। কাহারও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাধীন পরিণতির পথে তাঁহার মুখের কোন কথা যেন বাধা প্রদান না করে।

তবে কয়েকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পর যাঁহারা অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন সেই সব পবলোকগত ব্যক্তির সহিত আমরা মিলিত হই এবং নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া থাকি, লোকের এই প্রচলিত বিশ্বাস তাঁহারও ছিল বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া খেয়ালী অথচ কোমল ভাষায় হাসিতে হাসিতে তিনি বলিতেন, "যখন বুড়োর সামনে দাঁড়াব, তখন যেন আমাকে জবাবদিহি না করতে হয়।" এই ধারণার বিরুদ্ধে তাঁহাকে প্রবল ওজর-আপত্তি করিতে শুনি নাই। জীবনের নানা সত্য ঘটনার অন্যতমরূপে ইহাকে তিনি অতি সহজভাবে গ্রহণ করিতেন।

যিনি একবার নির্বিকল্প সমাধিতে আরোহণ করিয়াছেন, গন্তব্যপথে তিনি নিশ্চয়ই নানাপ্রকার মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়াছেন, যাহা অশরীরী অবস্থারই অনুরূপ। ঐকালে তাঁহার এমন অনেক উপলব্ধি হইযা থাকিবে, সাধারণতঃ আমরা যাহা হইতে বঞ্চিত। স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন যে, মধ্যে মধ্যে মৃত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হইয়াছে। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে (ভূতপ্রেতাদি) একজন নিজের ভয়ের বিষয় উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলেন, "ইহা কাল্পনিক মাত্র। যেদিন তুমি সত্যই ভূত দেখ্‌বে, সেদিন তোমার আর কোন ভয় থাকবে না।" তাঁহার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একবার মাদ্রাজে কয়েকজন আত্মহত্যাকারীর প্রেতাত্মা স্বামীজীর নিকট আর্বির্ভূত হইয়া তাহাদের দলে যোগ দিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করে। তাঁহার জননী পরলোকগমন করিয়াছেন এই বলিয়া ঐ প্রেতাত্মারা তাঁহাকে বিলক্ষণ বিচলিত করে। অনুসন্ধান দ্বারা স্বামীজী জানিতে পারেন, তাঁহার মাতা কুশলে আছেন। অতঃপর ঐ প্রেতাত্মাগণকে তিনি মিথ্যাভাষণের জন্য তিরস্কার করেন। উত্তরে তাহারা বলে, তাহারা বর্তমানে এত অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে রহিয়াছে যে, সত্য অথবা মিথ্যা বলা সম্পর্কে তাহাদের কোন খেয়াল নাই। মুক্তিলাভের জন্য তাহারা স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করে। তিনিও রাত্রিকালে তাহাদের শ্রাদ্ধকর্ম করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গমন করেন। কিন্তু শ্রাদ্ধকর্ম উপলক্ষে যেখানে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে, সেখানে গিয়া যখন দেখিলেন,

পিণ্ড দিবার কোন ব্যবস্থা নিকটে নাই তখন, প্রথমে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অতঃপর এক প্রাচীন শাস্ত্রবচন তাঁহার মনে পড়িল যে, অন্ন পিণ্ডের অভাবে বালুকার পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া বালুকা গ্রহণ করিয়া সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মৃত ব্যক্তিগণের উদ্দেশে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতে করিতে ঐ পিণ্ড সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সেইসব প্রেতাত্মারাও শান্তিলাভ করে এবং আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই।

আর একটি অভিজ্ঞতাও তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরবর্তী সপ্তাহে তাঁহার চকিত দর্শনলাভ। তখন রাত্রিকাল ; স্বামীজী ও অপর একজন কাশীপুরের বাড়ির বাহিরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। যে দুর্বিষহ শোক ঐকালে তাঁহাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সন্দেহ নাই, তাহারই প্রসঙ্গ চলিতেছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গুরুদেব তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সহসা স্বামীজী দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় মূর্তি উদ্যানে প্রবেশপূর্বক তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁহার বন্ধু রুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওকি দেখলাম, কি দেখলাম ?" দুই ব্যক্তির একই সময়ে কোন ছায়ামূর্তি দর্শনের ঘটনা অতি বিরল। বর্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছিল।

এই প্রকার অনুভূতি যিনি লাভ করেন, তাঁহার মনের মধ্যে উহা সহজেই কতকগুলি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে 'সহস্র দ্বীপোদ্যান' হইতে লিখিত এক পত্রে স্বামীজী উক্ত বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, কেন হিন্দুগণ মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া থাকেন। যাহারা পরলোক গমন করিয়াছে, তাহারাই একমাত্র তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী, কিন্তু তাহারাও অপর সূক্ষ্মদেহধারী মানুষ ব্যতীত আর কিছু নয়। সত্য, ঐ দেহ সূক্ষ্মতর কিন্তু হস্তপদবিশিষ্ট মানুষেরই দেহ। তাহারা এই পৃথিবীর অপর কোন স্তরে বাস করে, এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে, আমাদের মতো তাহাদেরও মন, চৈতন্য ইত্যাদি সবই আছে। অতএব তাহারাও মানুষ। দেবগণ ও দেবদূতগণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ব্রহ্মস্বরূপ হয় এবং ঐ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার জন্য অপর সকলকে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হয়।"

আমাদের গুরুদেবকে 'আপ্তপুরুষ' বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের নিকট পূর্বোক্ত উক্তিসকলের একটি নিজস্ব মূল্য থাকিবে। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব

করিবেন, যেখানে স্বামীজী শুধু কোন অনুমান অথবা মত প্রকাশ করিতেছেন মাত্র, সেখানেও ঐ মতবাদ কোন অনন্যসাধারণ উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমেরিকায় তাঁহার প্রথম পর্বের কাজ প্রায় শেষ হইবার পর, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড আগমনের অব্যবহিত পূর্বে, তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্য সুসম্বদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, প্রথমে তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ অকাতরে দান করিবার পর, তিনি উহাদের বিশালতা উপলব্ধি করেন, স্পষ্টভাবে উহাদের বিশেষত্ব দেখিতে পান এবং বুঝিতে পারেন যে, এখন কয়েকটি প্রধান ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের একত্র গ্রথিত ও সংহত করা চলিতে পারে। সম্ভবতঃ ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, সর্বসম্মতরূপে বেদান্তকে গ্রহণীয় করিতে হইলে দেহান্তে আত্মার গতি সম্পর্কে কিছু বলা অবশ্যই প্রয়োজন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রথম ইংলণ্ড আগমনকালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে লিখিত তাঁহার পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন ধর্মমতকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য, উহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ থাকা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে দুইজন যুবকের সাক্ষাৎকার কর্মকাণ্ডের আবশ্যকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। যুবকদ্বয় সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, "যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিক হইতে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করিয়া থাকেন, অলৌকিক রহস্যাদির সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখেন না।" তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই ব্যাপার আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। সাধারণ লোকের জন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান অত্যন্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ দৃষ্টিতে ধর্ম শুধু প্রতীকাদি ও কর্মকাণ্ডের সাহায্যেই বাস্তব দর্শনে পরিণত হয়। কেবল শুষ্ক দর্শন মানুষের উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।"

এইরূপে যে সংগঠনমূলক কল্পনা (যাহা শুধু ভাঙে না, নূতন কিছু গড়িতে চায়) তাঁহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরি-উক্ত বন্ধুকে লিখিত পরবর্তী দুই-তিনখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জনৈক বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ত্ববিদের সহিত আলাপ-আলোচনার উত্তেজনা তখনও পর্যন্ত মনে ক্রিয়াশীল থাকায় তিনি একখানি পত্রে প্রাণ ও জড়ের সম্পর্করূপ সমস্যাটির সম্মুখীন হন, এবং মৃত্যু সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত যে তথ্য তাঁহার নিকট তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, উহার একটি সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়া দেন। পত্রখানি পড়িলেই সহজেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব

করেন। তিনি লেখেন, "আমাদের বন্ধু বেদান্তোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্বশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন ; তাঁহার মতে এইসব তত্ত্বই কেবল আধুনিক বিজ্ঞানের গ্রাহ্য। এই প্রাণ ও আকাশ উভয়েই সমষ্টি মহৎ বা সমষ্টি মন বা ব্রহ্মা অথবা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। তিনি মনে করেন, গণিতশাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, প্রাণ ও জড় উভয়কেই অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত (রূপান্তরিত) করা যাইতে পারে। আগামী সপ্তাহে তাঁহার নিকট গিয়া ঐ নূতন গণিতের প্রমাণ দেখিয়া আসিব, এইরূপ স্থির আছে।

"তাহা হইলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। বর্তমানে আমি বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবাত্মার গতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এবং একটি তত্ত্বের সরল প্রতিপাদন দ্বারা অপর তত্ত্বটিও সহজ হইয়া যাইবে। পরে প্রশ্নোত্তর আকারে একখানি গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা আছে। ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইবে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক, এবং উহাতে বৈদান্তিক তত্ত্বসমূহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা হইবে।

ব্রহ্ম	=	The Absolute
মহৎ বা ঈশ্বর	=	Primal creative Energy
প্রাণ আকাশ	=	Force Matter

"জীবাত্মার গতি কেবল অদ্বৈত দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করা হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদীর মতে মৃত্যুর পর জীবাত্মা যথাক্রমে সূর্যলোক, চন্দ্রলোক ও বিদ্যুৎ-লোকে উত্তরণ করেন, সেখান হইতে এক অলৌকিক পুরুষ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। (অদ্বৈতবাদী বলেন, সেখান হইতে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন।)

"অদ্বৈতমতে আত্মা গমনাগমন করেন না, এবং এই সব লোক বা জগতের বিভিন্ন স্তর আকাশ ও প্রাণের সংযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ সর্বনিম্ন বা সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত স্থূল স্তর হইল সূর্যলোক—যেখানে প্রাণের প্রকাশ জড়শক্তিরূপে এবং আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থরূপে প্রকাশ পায়। ইহার পর সূর্যলোক বেষ্টন করিয়া অবস্থিত চন্দ্রলোক। চন্দ্রলোক বলিতে আদৌ চন্দ্র বুঝায় না—পরন্তু উহা দেবতাদের আবাসস্থল, অর্থাৎ প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রারূপে প্রকাশ পায়। অতঃপর বিদ্যুৎ-লোক, অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রাণ আকাশ হইতে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, এবং বিদ্যুৎ প্রাণ অথবা জড়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। পরবর্তী স্তর ব্রহ্মলোক, সেখানে প্রাণ বা আকাশ কিছুই নাই, উভয়েই মহৎ অথবা

আদিশক্তিতে লীন হইয়া গিয়াছে। প্রাণ অথবা আকাশ কিছুই না থাকায় এই অবস্থায় জীব সমগ্র জগৎকে সমষ্টি মহৎরূপে ভাবনা করেন। এই অবস্থা বৈরাজ-পুরুষরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি ইহা ব্রহ্ম নহে, কারণ তখনও বহুত্বের ভাব রহিয়াছে। এখান হইতে অবশেষে জীব সেই একত্বে উপনীত হন, উহাই চরম লক্ষ্য। অদ্বৈতবাদ বলে, এই বিভিন্ন অবস্থান্তর বা পরিণাম জীবের মনে ক্রমান্বয়ে উদিত কল্পনামাত্র ; জীব স্বয়ং আসেন না বা যান না ; এবং এইরূপেই বর্তমান পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে, কেবল একটির অর্থ বিকাশ অন্যটির অর্থ সঙ্কোচ।

"এখন যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের মধ্যেই জগৎ উপলব্ধি করিতে পারে, সেই হেতু ঐ জগৎ তাহার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট এবং তাহার মুক্তিতেই উহার লয়—যদিও অন্যান্য বদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বর্তমান থাকে। নাম-রূপ লইয়াই জগৎ। সমুদ্রের একটি তরঙ্গ ততক্ষণই তরঙ্গ, যতক্ষণ উহা নাম-রূপের দ্বারা পরিচন্ন। তরঙ্গ অবস্থা চলিয়া গেলে উহা সমুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু তখন ঐ নাম-রূপ তৎক্ষণাৎ চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব যে জল নাম-রূপ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া তরঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল, সেই জল ব্যতীত তরঙ্গের ঐ নাম-রূপের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কিন্তু নাম-রূপ তরঙ্গ নয়। তরঙ্গ জলে মিলিয়া যাইলেই ঐ নাম-রূপ চিরকালের জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য তরঙ্গের সম্বন্ধে অপরাপর নাম-রূপ তখনও বিদ্যমান থাকে। এই নাম-রূপই মায়া, আর ঐ জল ব্রহ্ম। তরঙ্গ সর্বদা জল ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না, তথাপি যতক্ষণ উহা তরঙ্গপদবাচ্য ছিল, ততক্ষণ উহার নাম-রূপও ছিল। আবার ঐ নাম-রূপ এক মুহূর্তের জন্যও তরঙ্গ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না যদিও জলাকারে ঐ তরঙ্গ অনন্তকাল নাম-রূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু যেহেতু নাম-রূপকে কোন পদার্থ হইতে পৃথক্ করা যায় না, সেই হেতু নাম-রূপ সৎ পদার্থ এ কথা বলা চলে না—অর্থাৎ তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তথাপি তাহারা শূন্য নহে—ইহাই মায়া।

"এই সব আমি সাবধানে ও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে চাই, কিন্তু আপনি এক নজরেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমি ঠিক পথে চলিয়াছি। এই কাজের জন্য আমাকে আরও বেশি করিয়া শারীরবিজ্ঞান পড়িতে হইবে, উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদি কাহার কতটুকু ক্রিয়া প্রভৃতি সব ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এখন আমি

স্পষ্ট আলো দেখিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে আর কোন ভোজবাজি বা অস্পষ্টতা নাই।”

আবার এই পত্রে, অন্যান্য বহুস্থলের ন্যায়, আমরা স্বামীজীর প্রতিভার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সংগঠন করিবার শক্তির পরিচয় পাই। আচার্য শঙ্কর যে উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনরূপ নড়চড় হইবে না। “আত্মা আসেনও না, যানও না”, এই বাক্য চিরকালের জন্য সকল সত্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। কিন্তু যাঁহারা অপর প্রান্ত হইতে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমও বৃথা যাইবে না, অদ্বৈতবাদীর দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং দ্বৈতবাদীর মনের পূর্বাপর বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ—উভয়ই পরস্পরের এবং নূতন ধর্মব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক।[১]

মৃত্যু জিনিসটা অবশ্য বাহির হইতে দেখিলেই যথার্থ অনুধাবন করা যায়। ব্যক্তিগত বিচ্ছেদের মধ্যে এই চিরন্তন নিয়তির মহান সত্যগুলি আমরা তত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না ; গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রভাবে যখন অপরের দুঃখে আমাদের সহানুভূতি বিচিত্রভাবে উদ্বেলিত হয়, তখনই উহাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যে সান্ত্বনার উপর আমরা নিজেদের বেলায় নির্ভর করিতে সাহসী হই না, তাহা অপরের জন্য অন্বেষণ করিতে গেলে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, দৃঢ় বিশ্বাসরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামীজীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি একখানি পত্রের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। পত্রখানি যে আমেরিকাবাসিনী মহিলাকে তিনি ‘ধীরামাতা’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাঁহার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। এই পত্রে তাঁহার বিশ্বাসের সারবত্তা গভীর আত্মীয়তা ও সহানুভূতির দ্বারা সঞ্জীবিত দেখিতে পাই, এবং মৃত্যুর পর আমাদের প্রিয়জনের গতি সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রুকলীন হইতে তিনি এই শোকসন্তপ্তা মহিলাকে লেখেন, “আপনার পিতা যে তাঁহার জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিবেন, তাহার কতকটা আভাস আমি পূর্বেই পাই, আর যখন কোন ভাবী অপ্রিয় মায়ার তরঙ্গ

১ স্বামীজীর প্রশ্নোত্তর আকারে একখানি পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি লণ্ডনে যে-সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা পাঠে সহজেই বুঝা যায় যে, এ-স্থলে তিনি যে-সব ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন, ঐ সম্বন্ধে তখনও চিন্তা করিতেছেন। ‘ব্রহ্ম’ ও ‘মায়া’ ; ‘বহির্জগৎ’ এবং তাঁহার আমেরিকায় প্রদত্ত ‘মানবের প্রকৃত স্বরূপ ও আভাসিক সত্তা’ এবং ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’—বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য

কাহাকেও আঘাত করিতে উদ্যত দেখি, তখন তাহাকে পত্র লেখা আমার
কিন্তু এইগুলিই জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ, এবং আমি জানি, আপনি
আছেন। সমুদ্রের উপরিভাগ পর্যায়ক্রমে উঠে ও নামে বটে, কিন্তু সেই সাক্ষিস্বরূপ, জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন সমুদ্রের গভীরতা এবং তাহার তলদেশস্থ অসংখ্য মণি-মুক্তা ও প্রবালস্তরকে অধিকতররূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্মা কখনও আসেনও না, যানও না। যখন সমুদয় দেশই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, তখন সে স্থানই বা কোথায়, যেখানে আত্মা যাইতে পারেন? যখন সমগ্র কালই আত্মাতে অবস্থিত, তখন সে সময়ই বা কোথায় যখন, আত্মা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ এবং তাহা পরিত্যাগ করিবেন?

"পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহাতেই ভ্রম হয়, সূর্য আকাশ পরিক্রম করিতেছে; সূর্য কিন্তু স্থির আছেন। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া অথবা স্বভাব গতিশীল, পরিবর্তনশীল—আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিতেছেন, এই মহান গ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন, আর সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত, অপরিবর্তিত থাকিয়া জ্ঞানামৃত পানে বিভোর। যত জীবাত্মা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে, অথবা ভবিষ্যতে থাকিবে, সকলেই এখনই রহিয়াছে, আর জড় জগতের একটি উপমা গ্রহণ করিলে বলা যায়, তাহারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত। যেহেতু আত্মাতে দেশবোধ নাই, অতএব যাঁহারা আমাদের ছিলেন, রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের হইবেন, তাঁহারা সকলেই সর্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, সর্বদা সঙ্গে ছিলেন এবং পরেও সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। আমরা তাঁহাদের ভিতর রহিয়াছি, তাঁহারাও আমাদের ভিতর অবস্থিত।

"এই কোষগুলির কথা ধর। যদিও তাহারা প্রত্যেকটি পৃথক্, তথাপি সকলেই ক ও খ-তে সম্মিলিতভাবে যুক্ত। এইখানে তাহারা এক। প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি (বস্তু), তথাপি সকলেই ঐ ক, খ অক্ষরেখায় এক। কেহই ঐ অক্ষরেখা হইতে সরিয়া যাইতে পারে না, এবং উহাদের কোনটি অক্ষরেখা হইতে যতই পৃথক্ হইয়া যাইবার চেষ্টা করুক, তথাপি ঐ অক্ষরেখায় দণ্ডায়মান হইয়া আমরা যে কোন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারি। এই অক্ষরেখাই ঈশ্বর। এখানে আমরা তাঁহার
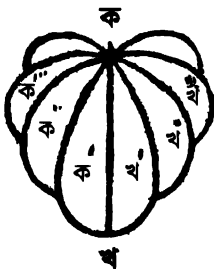
সহিত এক, এখানে আমরা সকলেই পরস্পরের মধ্যে এবং সকলেই ঈশ্বরে অবস্থিত।

"চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিয়া যায়; এবং তাহাতেই ভ্রম হয় যেন চাঁদ চলিয়া যাইতেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ ও জড় পদার্থ সকলেই গতিশীল, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যেন আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখিতে পাই যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবা দৈব প্রেরণা?) বশে সর্বজাতির উচ্চ-নীচ সবরকম ব্যক্তি মৃতব্যক্তিগণের সান্নিধ্য—যেন তাহারা নিকটে আসিয়াছে এইরূপ অনুভব করে, যুক্তির দৃষ্টিতেও উহা সত্য।

"প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটি নক্ষত্রস্বরূপ, আর এই সব নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপী সেই অনন্ত নীলিমায়, সেই অনাদি অনন্ত আকাশে বিন্যস্ত। সেখানেই প্রত্যেক জীবাত্মার মূল, যথার্থ সত্তা এবং প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নিহিত। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা, যাহারা আমাদের চক্রবালের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদের অন্বেষণেই ধর্মের সূত্রপাত, এবং তাহাদের সকলকে সেই ঈশ্বরে এবং আমাদেরও সেই একই স্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে পাওয়ার মধ্যেই ধর্মের সমাপ্তি। সুতরাং সমগ্র রহস্য এই যে, আপনার পিতা পরিহিত জীর্ণ বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যেখানে তিনি অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থিত সেখানেই রহিয়াছেন। এই জগতে বা অপর কোন জগতে তিনি কি আর একখানি অনুরূপ বস্ত্র সৃষ্টি করিবেন? আমার আন্তরিক প্রার্থনা যেন তাঁহাকে আর তাহা না করিতে হয়—যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তিনি উহা পারেন! ভগবৎসমীপে প্রার্থনা, কেহ যেন নিজ কৃতকর্মের অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা বলপূর্বক কোথাও নীত না হয়। প্রার্থনা করি, সকলেই যেন মুক্ত হইয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ জানিতে পারে যে, তাহারা মুক্তই আছে। আর যদি পুনরায় তাহাদের স্বপ্ন দেখিতে হয়, তবে আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি, যেন তাহাদের স্বপ্ন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাধি

যে ব্যক্তি একখানি সরু তক্তার উপর দিয়া কোন গভীর গহ্বর (খাদ) পার হয়, যে কোন মুহূর্তে হঠাৎ তাহার সমস্ত অভ্যস্ত সংস্কার ও অনুভূতির কথা মনে উদিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে যে মনোরাজ্য অবস্থিত তাহাতে মধ্যে মধ্যে মানবের প্রবেশলাভ সম্পর্কে শাস্ত্রে আমরা যে-সকল গল্প লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহারাও অনেকটা এই রকমের। সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে মুহূর্তে পিটারের মনে পড়িল তিনি কোথায় রহিয়াছেন, অমনি তিনি ডুবিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। পর্বতপার্শ্বে নিদ্রিত কয়েকজন ক্লান্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পর দেখিলেন, তাঁহাদের আচার্যদেব সম্পূর্ণ নূতন আকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া সম্মুখে বিদ্যমান। কিন্তু আবার তাঁহারা এই পার্থিব জগতে নামিয়া আসিলেন; আর ইতিমধ্যেই সেই অপূর্ব দর্শন অন্তর্হিত হইয়া স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। রাত্রিকালে ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া মেষপাল পাহারা দিতে দিতে মেষপালকগণ অস্ফুটস্বরে উচ্চ ধর্ম-প্রসঙ্গ করিতেছে, সহসা তাহারা দেবদূতগণের আর্বির্ভাব দেখিতে পাইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত কয়টি চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে এবং কালে মনের সেই উচ্চ অবস্থাও চলিয়া গেল; আর একি! সেই দেবদূতগণও আকাশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন! তাঁহাদের শ্রোতৃবৃন্দ নিকটবর্তী গ্রামে যে অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য সাধারণ লোকের ন্যায় পদব্রজে যাইতে বাধ্য হইল।

ভারতীয় আদর্শ ইহার বিপরীত। তিনিই ভারতের আদর্শ পুরুষ, মনের প্রবৃত্তিসমূহ যিনি এমন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছেন যে, যে-কোন মুহূর্তে চিন্তাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া ইচ্ছামত সেখানে অবস্থান করিতে পারেন; যিনি দুর্দম তন্ময়তাস্রোতে সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়া যাইতে পারেন—সহসা ঐ ভাব ভঙ্গ হইয়া অপ্রত্যাশিতভাবে পুনরায় ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য শিক্ষার গভীরতা ও অনুভূতির গাঢ়তা এই শক্তিলাভের সহায়ক হয়। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একমাত্র উপায় হইল কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ—এত কঠোর যে, সাধক যেন ইচ্ছামাত্র চিন্তারও বাহিরে চলিয়া যাইতে পারেন। যিনি নিজ মনকে এরূপ একাগ্র করিতে পারেন যে, ইচ্ছামাত্র উহাকে সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে সমর্থ, তাঁহার নিকট মন আজ্ঞাবাহক ভৃত্য, অথবা দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং শরীরও মনের অনুগত প্রজারূপে পরিণত হয়। এরূপ ক্ষমতা লাভ না করা পর্যন্ত সিদ্ধি—সম্পূর্ণ অবিচলিত আত্মসংযম—আসে না। একপুরুষে এরূপ কয়জন জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা এইরূপ উচ্চাধিকারী হইতে পারেন? এইরূপ মহাপুরুষের কার্য ও কথায় এমন একটা জ্যোতি, এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, যাহা বুঝিতে ভুল

হয় না। বাইবেলের ভাষায়, "তাঁহারা এমনভাবে কথা বলেন, যেন তাঁহাদের 'চাপরাস' আছে, তাঁহারা কেবল পুঁথিপড়া পণ্ডিতমাত্র নন।"

একথা নিঃসন্দেহ যে, বালক নরেন্দ্রকে প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার কর্তৃক কোন প্রবাহের বেগ নিরূপণের ন্যায় ইতিমধ্যেই বালক কতদূর মানসিক উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাও তিনি ধরিতে পারেন। আগ্রহের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি ঘুমুবার আগে একটা জ্যোতি দেখতে পাও?" সবিস্ময়ে বালক উত্তর দিলেন, "কেন, সকলেই কি দেখে না?" পরবর্তী কালে প্রায়ই তিনি এই প্রশ্নটির উল্লেখ করিতেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে জ্যোতি দেখিতেন, তাহার বর্ণনা দিতেন। কখন কখনও ঐ জ্যোতি একটি গোলকের মতো হইত, এবং একটি বালক পা দিয়া উহা তাঁহার দিকে ছুঁড়িয়া দিত। ক্রমে উহা নিকটবর্তী হইলে, তিনি উহার সহিত এক হইয়া যাইতেন এবং সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইতেন। কখনও উহা অগ্নিপুঞ্জের মতো দেখাইত, এবং তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেন। বিস্মিতচিত্তে আমরা ভাবি, যে নিদ্রার প্রারম্ভ এইরূপ তাহা কি আদৌ সেই নিদ্রা—যাহা আমরা সচরাচর নিদ্রা বলিতে বুঝিয়া থাকি? সে যাহা হউক, যে-সকল ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়স্ক যুবক ছিলেন, তাঁহারা বলেন, বিবেকানন্দ নিদ্রিত হইলে তাঁহাদের গুরুদেব তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া অপর সকলকে বলিতেন, 'উহাকে নিদ্রিত বলিয়া মনে হইতেছে মাত্র' এবং এখন ধ্যানাবস্থার কোন্ স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর উদ্যানে পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় একদিন স্বামীজী ঐরূপ কয়েকঘণ্টাকাল যেন নিদ্রাই যাইতেছিলেন বলিয়া সমীপস্থ ব্যক্তির মনে হয়। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি সহসা চিৎকার করিয়া ওঠেন, "আমার শরীর কোথায়?" তাঁহার সঙ্গী—বর্তমানে গোপালদাদা নামে পরিচিত বৃদ্ধ সাধু দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে গিয়া সজোরে সমস্ত অঙ্গ ডলিয়া দিয়া মস্তকের নিম্ন হইতে শরীরের লুপ্ত অনুভূতি ফিরাইয়া আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। যখন তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং নরেন্দ্র তখনও বিশেষ কষ্ট ও আতঙ্ক অনুভব করিতেছেন, তখন গোপালদাদা দৌড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়া শিষ্যের অবস্থা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "থাক ঐরকম! কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকলে ওর কোন ক্ষতি হবে না। ঐ অবস্থা লাভ করবার জন্য সে আমাকে অনেক জ্বালাতন করেছে।" পরে তিনি গোপালদাদা ও অন্যান্য সকলকে বলেন, নরেন্দ্রের

নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইয়াছে; এখন তাহাকে কাজ লইয়া থাকিতে হইবে। স্বামীজী স্বয়ং পরে এই অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের নিকট এইরূপ বর্ণনা করেন ঃ "মাথার ভেতরে যেন একটা আলো দেখতে পাচ্ছিলাম; সেটা এত উজ্জ্বল যে, আমি ধরেই নিয়েছিলুম আমার মাথার পিছনে কেউ একটা উজ্জ্বল আলো রেখে গিয়ে থাকবে।" অতঃপর ইন্দ্রিয়ানুভূতির সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় তিনি সেই রাজ্যে উত্তরণ করেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', একথা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

বুঝিতে হইবে যে, মনকে একাগ্র করিবার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের দেহকে ভুলিতে পারা চাই। এই উদ্দেশ্যেই লোকে তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাস করিয়া থাকে। কিছুকাল কঠোর তপস্যায় কাটাইবার চিন্তা আজীবন স্বামীজীর নিকট আনন্দদায়ক ছিল। নির্ভীকভাবে বিজয়ীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও প্রায়ই তিনি তপস্যা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। সুদক্ষ অশ্বারোহী যেমন অশ্বের লাগাম ধরিয়া দেখে, অথবা প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদ যেমন বাদ্যযন্ত্রের পর্দার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া দেখে, তিনিও সেইরূপ বার বার দেখিতে ভালবাসিতেন, শরীরটা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বশে চলে কি-না—যন্ত্রের উপর এখনও তাঁহার পূর্ববৎ দখল আছে কি-না, নূতন করিয়া দেখিতে তিনি প্রীতি অনুভব করিতেন। জীবনের অন্তিমকালে তিনি বলেন, "দেখছি, আমি এখনো যা ইচ্ছা করতে পারি।" ঐ সময় কলকাতার গ্রীষ্মকালের কয়মাস তিনি জলপান না করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হন। অবশ্য মুখ ধুইবার নিষেধ ছিল না। সেই সময় তিনি দেখেন যে, একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে গেলেও তাঁহার গলার পেশীসমূহ আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত, সুতরাং ইচ্ছা করিলেও তিনি জল পান করিতে পারিতেন না। কোন ব্রত উপলক্ষে যখন তিনি উপবাস করিতেন, তখন তাঁহার নিকট অবস্থানকালে অপরেরও খাদ্যসামগ্রী অনাবশ্যক বোধ হইত, এবং চেষ্টা করিয়াও ঐ বিষয়ে রুচি হইত না। একটি ঘটনার কথা আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, তিনি বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল; মনে হইতেছিল, ঐ সকল কথা তিনি শুনিতেছেন না। হঠাৎ তাঁহার হস্তস্থিত একটি শূন্য কাচের গ্লাস মাটিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল— ঐ তর্কে তাঁহার যে কষ্টবোধ হইতেছিল, ঐটুকুই তাহার নিদর্শন!

যে কঠোর সাধনার দ্বারা এই আত্মসংযমশক্তি বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে! হয়তো কত ঘন্টা পূজা ও ধ্যানে অতিবাহিত হইয়াছে, কতক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল আহার ও নিদ্রা

পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে! শেষোক্ত ব্যাপারে বস্তুতঃ এক সময়ে পঁচিশ দিন ধরিয়া তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র আধঘন্টা নিদ্রা যাইতেন। আবার এই অর্ধঘন্টা নিদ্রা হইতেও তিনি নিজেই জাগিয়া উঠিতেন। সম্ভবতঃ ইহার পর নিদ্রা আর কখনও তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে বা বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার 'যোগীর চক্ষু' ছিল। বাল্যকালে যখন তিনি গঙ্গাবক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বজরায় উঠিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?"—তখন তিনি তাঁহাকে একথা বলেন। যোগীর চক্ষু কদাপি সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় না, এবং সূর্যোদয় হইবামাত্র একেবারে উন্মীলিত হইয়া যায়, ইহাই প্রবাদ। পাশ্চাত্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত একগৃহে অবস্থান করিতেন, তাঁহারা শুনিতে পাইতেন, রাত্রিশেষে স্নান করিবার সময় তিনি 'পরব্রহ্ম' অথবা ঐ জাতীয় কোন নাম সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহাকে কঠোরতা অভ্যাস করিতে কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবন এরূপ প্রগাঢ় তন্ময়তাপূর্ণ ছিল যে, অপর কাহারও নিকট উহাই কঠোর তপস্যা বলিয়া প্রতীত হইত। আমেরিকার ন্যায় রেলরাস্তা, ট্রাম প্রভৃতি যানবহুল ও জটিল নিমন্ত্রণ-তালিকার দেশে প্রথমদিকে তাঁহাকে ধ্যানে তন্ময় হইবার প্রবণতা কিরূপ কষ্টে দমন করিতে হইত, তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণকারী জনৈক ভারতবাসী বলেন, "ধ্যান করতে বসলে দশ মিনিট যেতে না যেতেই তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন, যদিও তাঁর শরীর মশায় ছেয়ে যেত।" এই অভ্যাস তাঁহাকে দমন করিতে হইত। প্রথম দিকে, লোকে হয়তো রাস্তার অপর প্রান্তে অপেক্ষারত, এদিকে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ইহাতে তিনি বিশেষ লজ্জিত হইতেন। একবার নিউ ইয়র্কে একটি ক্লাসে তিনি ধ্যান শিক্ষা দিতেছেন, শেষে দেখা গেল কিছুতেই তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না ; অতঃপর ছাত্রগণ একে একে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। পরে এই ব্যাপারটি শুনিয়া তিনি অতীব মর্মাহত হন এবং পুনরায় কখনও ক্লাসে ধ্যান শিক্ষা দিতে সাহস করেন নাই। নিজের ঘরে দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া ধ্যান করিবার সময় তাহাদের কোন একটি কথা বলিয়া দিতেন, যাহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু ধ্যানের সময়ের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও তিনি প্রায় সর্বদাই চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। দশজনে মিলিয়া গল্প গুজব, হাস্য-পরিহাস চলিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, তাঁহার নয়নদ্বয় স্থির হইয়া গিয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া অবশেষে একেবারে স্থির ; তারপর ধীরে ধীরে পুনরায় পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি। তাঁহার

বন্ধুগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং সেইমতো ব্যবস্থা করিতেন। দেখা করিবার উদ্দেশ্যে কাহারও বাড়িতে প্রবেশ করিয়া যদি তিনি কথা কহিতে ভুলিয়া যাইতেন, অথবা যদি তাঁহাকে কোন ঘরে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না, যদিও কখন কখনও তিনি নিজেই উঠিয়া মৌনভঙ্গ না করিয়াই আগন্তুককে সাহায্য করিতেন। এইরূপে তাঁহার মন অন্তরেই সমাহিত থাকিত, বাহিরের বস্তু অন্বেষণ করিত না। তাঁহার চিন্তার উচ্চতা ও পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্তাই ছিল আমাদের নিকট ইঙ্গিত। তাঁহার প্রসঙ্গ ছিল সর্বদা নির্গুণ তত্ত্ব সম্পর্কে। যাহাকে লোকে সচরাচর ধর্মপ্রসঙ্গ বলিয়া অভিহিত করে, উহা ঠিক তদনুরূপ ছিল না—তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কেও ঐকথা প্রযোজ্য। অনেক সময়েই প্রসঙ্গের বিষয় ছিল ঐহিক। কিন্তু উহার পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত। যাহার মধ্যে কদাপি কোন নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, বা ক্ষুদ্রতা থাকিত না; কোথাও সহানুভূতি সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইত না। এমনকি, তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনাও মনে হইত—কেবল সংজ্ঞানির্দেশক ও বিশ্লেষণমূলক, কোনপ্রকার বিদ্বেষ বা ক্রোধ উহাতে থাকিত না। নিজের সম্বন্ধে তিনি একদিন বলেন, "আমি একজন অবতারের পর্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারি, অথচ তার দ্বারা তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি, অধিকাংশ লোকই তা পারবে না, তাদের পক্ষে নিজ নিজ ভক্তিটুকু বাঁচিয়ে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ।" তাঁহার বিশ্লেষণ শ্রবণে শ্রোতার মনেও আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কোন বিরাগ বা ঘৃণার ভাব অবশিষ্ট থাকিত না।

জগতের প্রতি এই উদার ও মধুর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার গুরুভক্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। একবার তিনি বলেন, "আমার ভক্তি কুকুরের প্রভুভক্তির মতো। আমি কারণ খুঁজি না। পদানুসরণ করেই আমি সন্তুষ্ট।" শ্রীরামকৃষ্ণেরও নিজ গুরু তোতাপুরীর প্রতি অনুরূপ মনোভাব ছিল। এই আচার্যশ্রেষ্ঠ একদিন আম্বালার নিকটবর্তী কৈথাল নামক স্থানে নিজ শিষ্যগণকে এই বলিয়া চলিয়া আসেন, "আমাকে বাংলাদেশে যেতে হবে। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি যে, সেখানে একজন মুমুক্ষুর এখন আমার নিকট সাহায্যের দরকার।" দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কার্য শেষ হইলে তিনি পুনরায় নিজ শিষ্যগণের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু যাঁহাকে তিনি দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করিতেন যে, কদাপি তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না। "ন্যাংটা আমাকে একথা বলত"—এইরূপেই তিনি

তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেন। জগতের প্রতি পূর্ণ প্রেম এবং মানবের উপর পূর্ণ বিশ্বাস কেবল সেই হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যিনি কাহারও মধ্যে নিজ আদর্শ সম্যকভাবে রূপায়িত হইতে দেখিয়াছেন।

কিন্তু দেহবোধের পারে যাইবার শক্তিই আমাদের গুরুর ন্যায় চরিত্রবিকাশের একমাত্র কারণ নহে। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চরমশক্তি বিকাশের জন্য প্রথম আবশ্যক প্রগাঢ় অনুভব শক্তির জাগরণ, কিন্তু পরে উহাকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। এই ব্যাপারটি এমন এক অনুভূতির রাজ্যের ইঙ্গিত প্রদান করে, যাহা আমাদের অধিকাংশের নিকটেই কল্পনাতীত ; তথাপি শিষ্যাবস্থায় স্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনা হইতে উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার বয়স তখনও খুব অল্প, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পিতার মৃত্যু পরিবারের মধ্যে দারুণ বিপর্যয় আনয়ন করে। তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং প্রতিদিন সকলের জন্য চিন্তায় তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার প্রিয়জন, তাঁহাদের কষ্টে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, এবং সহসা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌভাগ্যপূর্ণ জীবনের বিপরীত অবস্থা তাঁহাকে বিমূঢ় করিয়া তুলিল। তাঁহাদের বিপদের গুরুত্ব দেখিয়াও তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

অবশেষে মর্মবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার গুরুর নিকট একদিন ছুটিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া সস্নেহে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যা বাবা, ওখানে যা, মা-কালীর কাছে প্রার্থনা কর ; তুই যা চাইবি, মা তোকে নিশ্চয় তাই দেবেন।"

অতি সাধারণ দৃষ্টিতে এই অঙ্গীকারের মধ্যে কিছুই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক ছিল না ; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ধনী ও মাড়োয়ারী ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্য সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিতেন। গুরুর উপদেশের শান্তভাব ও দৃঢ়তায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বালক সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরে গেলেন প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ অতীত হইবার পর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ সময়ে যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলেন, তাঁহার আকৃতিতে যেন একটা বিহ্বল ভাব ছিল, এবং কথা বলিতে যেন কষ্টবোধ হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রার্থনা করেছিলি ?" শিষ্য উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, করেছি।"

গুরু আবার বলিলেন, "মার কাছে কি চেয়েছিলি ?"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "পরাভক্তি ও জ্ঞান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মন্তব্য না করিয়া সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, 'আবার যা।' কিন্তু কোন পরিবর্তন হইল না। তিনবার তিনি ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রেরিত হন, তিনবারই প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি একই উত্তর দেন। জগজ্জননীর সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আর সব বিস্মৃত হইয়া যান ; কি প্রয়োজনে সেখানে আসিয়াছেন, সে কথা পর্যন্ত তাঁহার মনে পড়ে না। আমাদের মধ্যে কেহ কি সেই উচ্চ অবস্থায় কখনও উপনীত হইয়াছেন, যে অবস্থায়—আমরা যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের কল্যাণ-কামনায় তন্ময়ভাবে প্রার্থনা করিতে গিয়া এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে? তাহা হইলে ভেদবৈচিত্র্যময় আপেক্ষিক সাধারণ জগৎ হইতে এই অনুভূতির অনন্তগুণ পার্থক্য হয়তো আমরা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

কথা কহিতে কহিতেই স্বামীজীর চিন্তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করিত। চিন্তাটা কি অন্তরাত্মা অথবা আদি শক্তির বিকাশের অন্যতম রূপমাত্র ? উহাতে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহা কি যিনি চিন্তা করেন, তাঁহার কল্যাণের দিক হইতে দেখিলে বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া ধরিতে হইবে ? প্রথমে কতকগুলি ঘটনার পরিধি, অতঃপর কতকগুলি চিন্তার পরিধি এবং সর্বশেষে সেই পরব্রহ্ম ! যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষগণ কর্তৃক নিজ নিজ চিন্তা-সম্পদ অপরের সহিত একত্র সম্ভোগের ন্যায় মহত্তর নিঃস্বার্থ কার্য আর কিছু নাই। তাঁহাদের কল্পনারাজ্যে প্রবেশের অর্থই মোক্ষদ্বার উন্মোচন ; কারণ, ঐকালে শিষ্যের মানসে প্রত্যক্ষভাবে একটি বীজ উপ্ত হয়। যাহা মনোজগতে আত্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বিনষ্ট হয় না।

আমাদের গুরুর চিন্তা ছিল কতকগুলি আদর্শের সমষ্টিস্বরূপ, কিন্তু ঐ আদর্শগুলিকে তিনি এমন জ্বলন্ত, জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, কেহ মনে করিতে পারিত না উহারা বস্তুতন্ত্র নিরপেক্ষ। ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই তিনি সমভাবে তাহাদের আদর্শের মাধ্যমে, তাহাদের নৈতিক উন্নতির মাপকাঠিতে বিচার করিতেন। অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—স্বভাব অনুযায়ী তাঁহাদের এক শ্রেণী সব জিনিসকে দুইভাগে ভাগ করিতে চাহেন, অপরশ্রেণী তিনভাগে। স্বামীজীর সর্বদা তিনভাগে ভাগ করার দিকেই প্রবণতা দেখা যাইত। কোন গুণের দুইটি বিপরীত সীমা (যেমন শীত-উষ্ণ, ভাল-মন্দ) তো তিনি স্বীকার করিতেনই, অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে যে সংযোগস্থল, তাহাও দেখিতে ভুলিতেন না, যেখানে উভয় দিক সমান হওয়ায়, কোন গুণই নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা কি প্রতিভারই একটি সর্বজনীন লক্ষণ, অথবা শুধু হিন্দুমনেরই একটি বিশেষত্ব ?

কেহই বলিতে পারিত না, কোন্ বস্তুতে তিনি কি দেখিতে পাইবেন, কোন্ জিনিস তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইবে। অনেক সময় কথা অপেক্ষা চিন্তার উত্তর তিনি অধিকতর সহজে ও উত্তমরূপে দিতে পারিতেন। কি অদ্ভুত ভাব-তন্ময়তার মধ্যে তিনি অবস্থান করিতেন, তাহা এখানে-সেখানে, এক-আধটু আভাস-ইঙ্গিত হইতেই ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যাইত—সকল কথা ও চিন্তা তাহারই সহচরী মাত্র ছিল। কাশ্মীরে গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করিবার পর তবে তিনি আমাদের বলেন যে, তিনি সর্বদা জগন্মাতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে চলাফেরা করিতেছেন। আবার জীবনের শেষ শীত-ঋতুতে তিনি শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে বলেন, কয়েকমাস ধরিয়া তিনি দেখিতেছেন যেন দুইখানি হাত তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া আছে। তীর্থযাত্রাকালে কেহ কেহ দেখিত, তিনি একান্তে মালা জপ করিতেছেন। গাড়িতে তাঁহার পিছন দিকে উপবিষ্ট থাকাকালীন কেহ কেহ শুনিতে পাইতেন, তিনি কোন একটি মন্ত্র বা স্তোত্র বার বার আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যূষে উঠিয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তির অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম, যখন তিনি একদিন জনৈক কর্মীকে সংসার-সমরাঙ্গণে প্রেরণকালে বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যহ সকালে অন্য কোন কাজ করবার আগে নিজের ঘরে দুঘণ্টা ধরে 'সচ্চিদানন্দ', 'শিবোঽহম্' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতে করতে পায়চারি করে বেড়াতেন।" সর্বসমক্ষে এই ইঙ্গিত প্রদান ব্যতীত আমরা আর কিছু শুনিতে পাই নাই।

সুতরাং অবিরাম ভক্তিই ছিল তাঁহার অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা রক্ষা করিবার উপায়। তিনি সর্বক্ষণ যে-সব অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আভাস দিতেন, ধ্যানই তাহাদের মূল কারণ। তাঁহার কথাবার্তায় যোগদান ছিল, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এক গভীর কূপে পাত্র ডুবাইয়া সেখান হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও শীতল বারি আনয়ন করা। তাঁহার চিন্তারাশির সৌন্দর্য অথবা গভীরতার ন্যায় উহাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যও ইহাই প্রকাশ করিত যে, ঐ সকল চিন্তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ চিরতুষারাবৃত পর্বতশিখর হইতে প্রাপ্ত।

তাঁহার বক্তৃতাকালীন অনুভূতিসমূহের যে-সব গল্প তিনি করিতেন, তাহা হইতে এই তন্ময়তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইত। তিনি বলিতেন, পরদিন বক্তৃতায় তিনি যে-সব কথা বলিবেন, রাত্রে তাঁহার নিজের ঘরে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে তাহা বলিয়া দিত এবং পরদিন তিনি দেখিতেন যে, বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া সেই কথাগুলিই তিনি আবৃত্তি করিতেছেন। কখন কখনও তিনি দুইজনের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেন, তাহারা পরস্পরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। আবার কখনও বোধ হইত ঐ কণ্ঠস্বর যেন

বহুদূর হইতে আসিতেছে—যেন একটি দীর্ঘ পথের অপর প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। অতঃপর ঐ স্বর যেন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া অবশেষে চিৎকারে পরিণত হইত। তিনি বলিতেন, "ঠিক জেনে রেখো যে, পুরাকালে ঈশ্বরীয় বাণী (inspiration) বলতে লোকে যাই বুঝে থাকুক, তা নিশ্চয় এই ধরনের একটা কিছু হবে।"

কিন্তু এইসব ব্যাপারের মধ্যে তিনি অতিপ্রাকৃত কিছু দেখিতে পাইতেন না। উহা মনেরই স্বয়ংক্রিয় কার্যমাত্র; মন যখন চিন্তাপ্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট নিয়মে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া যায়, তখন ঐ চিন্তাগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে আর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, আপনা হইতেই তাহাদের সংসাধন ঘটে। যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন, 'শেষে মনই গুরু হইয়া দাঁড়ায়'—সম্ভবতঃ উহা সেই অনুভূতিরই একটা চরম আকার। ইহা হইতে আরও আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়দ্বয় প্রায় সমভাবে বিকাশলাভ করিলেও দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একজন যেমন বলিয়াছিলেন, "নিজের মনের বিভিন্ন অবস্থা তিনি সম্পূর্ণ যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারতেন।" কিন্তু ঐ সবল কণ্ঠস্বর স্বসংবেদ্য ব্যাপার ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া অনুমান করিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা তাঁহার ছিল না।

আর একটি অনুভূতি সম্পর্কে, যাহা আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তাহাতে মনের ঐরূপ স্বতঃপ্রবৃত্তক্রিয়াই প্রকাশ পায়, হয়তো ততখানি বিকাশপ্রাপ্ত নয়। যখনই কোন অপবিত্র চিন্তা ও আকৃতি তাঁহার সম্মুখে আসিত, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতেন,যেন ভিতর হইতে মনের উপর একটা ধাক্কা আসিয়া পড়িত—ও তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ, অসাড় করিয়া দিত! অর্থাৎ—"না ওরকম হতে পারবে না।"

অপরের মধ্যে যে কার্যগুলি প্রথমে মনে হয় সহজাতপ্রবৃত্তি দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিগত, উচ্চতর জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত— তাহাদের তিনি অতি সহজে ধরিতে পারিতেন। যে বস্তু যথার্থ ঠিক, কেন তাহার কারণ কেহ নির্দেশ করিতে পারে না, অথচ যাহা সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করিলে ভুল বলিয়া বোধ হয়, এইরূপ স্থলে তিনি এক উচ্চতর শক্তির প্রেরণা দেখিতে পাইতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সকল অজ্ঞান সমান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত না।

নির্দিষ্ট কার্য শেষ হইলে স্বামীজী আবার তাঁহার নির্বিকল্প সমাধিরূপ আম্রের আস্বাদন করিতে পারিবেন, গুরুদেবের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁহার যৌবনের সঙ্গিগণ

কদাপি বিস্মৃত হন নাই। কেহই জানিত না, কোন্ মুহূর্তে তাঁহার ঐ কার্য সমাপ্ত হইবে, এবং চরম অনুভূতি যে আসন্ন, কেহ কেহ তাহা সন্দেহও করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ বৎসরে কয়েকজন সঙ্গী অতীত দিনের আলোচনা করিতেছিলেন, ঐ প্রসঙ্গে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথাও উঠিল, "নরেন যখনই জানতে পারবে, সে কে এবং কি, তখন তার শরীর রাখবে না।" তাঁহাদের মধ্যে একজন কতকটা হাস্যচ্ছলে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, তুমি কি এখন জানতে পেরেছ তুমি কে?" অপ্রত্যাশিত উত্তর আসিল, "হাঁ, এখন জেনেছি।" ত্রস্ত হইয়া সকলে গম্ভীর ও নীরব হইয়া গেলেন। ঐ বিষয়ে তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে কাহারও সাহস হইল না।

শেষ সময় যতই নিকটতর হইতেছিল, ধ্যান ও তপস্যা অধিকাংশ সময় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। যে-সকল বস্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল,তাহারাও এখন আর তাঁহার চিত্তকে তেমন করিয়া আকৃষ্ট করিতে পারিত না। অবশেষে শেষ মুহূর্তে যখন তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন, তখন ঐ বিরাট অতীন্দ্রিয় শক্তির ছটা যেন নিকটে ও দূরে যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদেরও স্পর্শ করিয়াছিল। একজন স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন পুনরায় সেই রাত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, সংবাদবাহক দ্বারে অপেক্ষারত। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের অপর একজন দেখিয়াছিলেন, তিনি যেন উল্লাসের সহিত নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, "শশী, শশী, শরীরটাকে থু্ থু করে ফেলে দিয়েছি।" আরও একজনকে সেই সন্ধ্যাকালে কে যেন জোর করিয়া ধ্যানের ঘরে লইয়া গিয়াছিল ; তিনি দেখিলেন, তাঁহার আত্মা এক অসীম জ্যোতির সম্মুখীন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল 'শিব গুরু' এবং ঐ জ্যোতির সম্মুখে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
স্বামীজীর মহাসমাধি

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজী যে-সকল বন্ধুর সহিত মিশরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহসা তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, "তাঁকে খুব ক্লান্ত বোধ হতো।" যখন তিনি কাইরোর নিকটবর্তী পিরামিডসমূহ, নারীমুখবিশিষ্ট সিংহমূর্তিটি (the sphinx) এবং অন্যান্য বিখ্যাত দৃশ্যগুলি দেখিতেছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি যেন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি অভিজ্ঞতারূপ মহাগ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতেছেন। ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ আর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না।

অপরদিকে তাঁহার স্বদেশীগণকে সর্বদা 'নেটিভ' বলিয়া অভিহিত হইতে শুনিয়া এবং নিজেকে ঐ সময়ে তাহাদের পরিবর্তে বরং বিদেশীর সহিত সমপর্যায়ভুক্ত হইতে দেখিয়া তিনি মর্মাহত হন। বস্তুতঃ এই দিক দিয়া তিনি যেন মিশর অপেক্ষা কনষ্টান্টিনোপ্‌ল বিশেষ উপভোগ করেন, কারণ জীবনের শেষভাগে তিনি বারংবার এক বৃদ্ধ তুর্কীর উল্লেখ করিতেন। ঐ ব্যক্তির একটি হোটেল ছিল এবং সে এই বিদেশী যাত্রিদলকে—যাহাদের মধ্যে একজন ছিল ভারত হইতে আগত—কোনরূপ পয়সা না লইয়া আহার করাইবার জন্য বিশেষ জিদ্ প্রকাশ করিয়াছিল। সত্য সত্যই আধুনিক বিষয়বুদ্ধিবর্জিত প্রাচ্যবাসীর নিকট সকল পর্যটকই তীর্থযাত্রী, এবং সকল তীর্থযাত্রীই অতিথিরূপে গণ্য।

পরবর্তী শীতকালে তিনি ঢাকায় গমন করেন এবং বিরাট দলবলসহ ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামের একটি তীর্থে স্নান করিতে যান। যাঁহারা তাঁহার অতি নিকটে থাকিতেন, তাঁহারাই কেবল জানিতেন, স্বামীজীর স্বাস্থ্য এই সময়ে কত দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছিল। আমরা দূরে ছিলাম বলিয়া ঐ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি বেলুড়ে যাপন করেন 'এই আশা লইয়া যে, বাল্যকালে বৃষ্টিপড়ার যে শব্দ শুনিতেন, পুনরায় উহা শুনিবেন।' আবার যখন শীত আসিল, তিনি এত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল।

তথাপি ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আরও একটি তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেন। প্রথমে বুদ্ধগয়া এবং তারপর বারাণসী। উহা যেন তাঁহার সকল পর্যটনের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি। শেষ জন্মদিনের প্রভাতে তিনি বুদ্ধগয়ায় উপনীত হন। মহন্তজীর আদর-আপ্যায়নের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে এবং পরে কাশীতেও নিষ্ঠাবান হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট তিনি এত অধিক পরিমাণে সমাদর ও বিশ্বাস অর্জন করেন যে, লোকের হৃদয় তিনি কতটা অধিকার করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিজেই বিস্মিত হন।

বুদ্ধগয়া এখন যেমন তাঁহার শেষ তীর্থযাত্রা, তেমন উহাই ছিল তাঁহার সর্বপ্রথম তীর্থদর্শন। আর ঐ প্রথম তীর্থদর্শনের কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশীধামেই একজনের নিকট বিদায়গ্রহণকালে বলিয়াছিলেন, "যতদিন না আমি সমাজের উপর বজ্রের মতো পড়ছি, ততদিন আর এখানে আসব না।"

স্বামীজীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর দূর দূর দেশ হইতে বহু শিষ্য তাঁহার নিকটে সমবেত হন। যদিও তাঁহাকে পীড়িত দেখাইতেছিল, তথাপি কেহই সম্ভবতঃ অনুমান করিতে পারেন নাই যে, অন্তিমকাল কত নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তথাপি সাগরবক্ষে অর্ধপৃথিবী অতিক্রম করিয়া লোকের যাতায়াত, দেখা-সাক্ষাৎ এবং পরস্পরের নিকট বিদায় সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাঁহারা তাঁহার নিকটে অবস্থান করেন, তাঁহাদের স্বাধীনভাবে কার্য করিতে দিবার জন্য তাঁহার কিছুদিন দূরে সরিয়া থাকা আবশ্যক।

তিনি বলেন, "কতবার দেখা যায় যে, মানুষ দিনরাত তাঁর শিষ্যদের কাছে থেকে তাদের নষ্ট করে ফেলে! একবার তাদের তৈরি হয়ে যাবার পর এটা বিশেষ প্রয়োজন যে, নেতা তাদের কাছে থেকে দূরে থাকবেন, কারণ তাঁর অনুপস্থিতি ব্যতীত তারা নিজেদের বিকাশসাধন করতে পারে না।"

বিদেশিগণের সহিত যে সংস্পর্শ তাঁহার পরিণত জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছিল, তাহারই সর্বশেষ ফলস্বরূপ যেন ধর্মের মধ্যে গার্হস্থ্য- জীবনের নিষ্ঠারূপ উচ্চ আদর্শের কী মূল্য তাহা তিনি সহসা উপলব্ধি করেন। কেবল কথায় ও কার্যে নহে, পরন্তু অধিকতর আন্তরিকতা ও আবেগের সহিত এবং প্রাণপণ চিন্তার দ্বারা সন্ন্যাসিগণ নিজেদের ব্রতগুলি সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন বলিয়া সামাজিক জীবনের আদর্শসমূহ তাঁহাদের নিকট সচরাচর নিতান্ত অসাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্বামীজী সহসা হৃদয়ঙ্গম করেন, যে-জাতি বিবাহিত জীবনের

সম্বন্ধকে পবিত্র জ্ঞান করে না, সে-জাতির মধ্যে কখনও নিষ্ঠাবান যাজককুল অথবা উচ্চস্তরের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় উদ্ভূত হইবার আশা নাই।

যেখানে বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য বলিয়া সম্পূর্ণরূপে গৃহীত, কেবল সেখানেই দাম্পত্যজীবনের বাহিরের পথেও লোকে নিষ্ঠার সহিত চলিতে পারে। সামাজিক আদর্শকে পবিত্র জ্ঞান করিলেই সমাজবন্ধনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সন্ন্যাসজীবনকে পবিত্র জ্ঞান করা সম্ভব।

এই অনুভূতিই তৎপ্রচারিত দর্শনের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ। ইহাই 'মহামায়ার খেলা'র শেষ চিহ্ন সূচিত করে। সন্ন্যাসজীবনের সম্ভাবনা-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সমগ্র সমাজে উন্নতিলাভের প্রচেষ্টা ও উহার প্রাপ্তি। সনাতন ধর্মে নিষ্ঠাবান সাধুর যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন নিষ্ঠাবান গৃহস্থের। বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সন্ন্যাসব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা—উভয়ই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সমাজে উন্নতচরিত্র গৃহস্থ না থাকিলে শক্তিশালী সন্ন্যাসীবৃন্দের উদ্ভব হইতে পারে না। গার্হস্থ্য ব্যতীত সন্ন্যাস জীবন হয় না, ঐহিক কল্যাণ ব্যতীত পারমার্থিক জীবন সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সবই এক, তথাপি ইচ্ছাপূর্বক কাহারও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হইতে দেওয়া চলিবে না ; কারণ প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন সেই ভূমা। বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই পুরাতন বাণী নূতন আকারে মাত্র। তিনি এবং তৎপূর্বে তাঁহার গুরুদেব যেমন বার বার বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন—ভাবোন্মত্ততা অপেক্ষা চরিত্রের বিশুদ্ধতাই ভগবৎ সেবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কোন জিনিস ধরিয়া রাখিবার শক্তি না থাকিলে শুধু ত্যাগেও কোন বাহাদুরি নাই।

তাঁহার সম্মুখে সর্বদা যে-সব কার্য আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহাদের খাতিরে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে স্বামীজী একবার তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করেন, এমনকি, তিনি কবিরাজী চিকিৎসা শুরু করেন, যাহার জন্য এপ্রিল, মে ও জুন এই তিনমাস ধরিয়া তিনি একবিন্দু ঠাণ্ডা জল পান করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে শরীরের কতদূর উপকার হইয়াছিল বলা যায় না ; তবে ঐ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বল অব্যাহত আছে দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন।

জুন মাস শেষ হইলে কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, অন্তিমকাল নিকটবর্তী। দেহত্যাগের পূর্ব বুধবারে তিনি নিকটস্থ একজনকে বলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

আর আমরা যদিও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, অন্ততঃ তিন-চার বৎসরের পূর্বে তিনি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তথাপি জানিলাম, কথাগুলি সত্য। জগতের খবরাখবর শুনিয়া তিনি নামমাত্র উত্তর দিতেন। সাময়িক কোন সমস্যা সম্বন্ধে আর তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা অনর্থক। শান্তভাবে তিনি বলিতেন, "তোমার কথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু এ-সব ব্যাপার আমি আর আলোচনা করতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি।"

কাশ্মীরে অবস্থানকালে একবার পীড়া হইতে আরোগ্যলাভের পর তাঁহাকে দুইখণ্ড পাথর উঠাইয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, "যখনই মৃত্যু কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ, বা বাহ্য জগতের চিন্তা, এ-সব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকি। তখন আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই"—তিনি দুই হাতে পাথর দুইখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—"কারণ, আমি শ্রীভগবানের পাদস্পর্শ করেছি।"

নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধি সম্পর্কে তিনি কদাচিৎ উল্লেখ করিতেন, সেজন্য ঐ কথাগুলি আমরা কখনও বিস্মৃত হই নাই। আবার সেই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালেই অমরনাথ গুহা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অমরনাথের নিকট ইচ্ছামৃত্যু-বর লাভ করিয়াছেন। এই বরলাভের ফলে মৃত্যু তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিবে না, ইহা যেন নিশ্চিত ছিল এবং উহার সহিত "ও নিজেকে জানতে পারলে আর এক মুহূর্তও দেহ রাখবে না—শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর এত চমৎকার ঐক্য ঘটিয়াছিল যে, এ সম্পর্কে সকল চিন্তা আমাদের মন হইতে এককালে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। এমনকি, এই সময়ে তাঁহার নিজ মুখের গম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ কথাগুলিও আমাদের উপরি-উক্ত কথা মনে করাইয়া দিতে পারে নাই।

অধিকন্তু তাঁহার যৌবনকালের সেই অদ্ভুত নির্বিকল্প সমাধিলাভের কথাও আমাদের মনে ছিল। ইহাও জানিতাম, উক্ত সমাধি-অন্তে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "এই তোমার আম। আমি এটা বাক্সে চাবি দিয়ে রাখলাম। তোমার কাজ শেষ হলে আবার তুমি এটা আস্বাদ করতে পারবে।"

যে সাধু আমাকে এই গল্পটি বলেন, তিনি ঐ প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি। সময় এগিয়ে এলে আমরা ঠিক জানতে পারব। কারণ, তিনি আমাদের বলতেন যে, পুনরায় তিনি তাঁর আম আস্বাদন করেছেন।"

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিয়া এখন কতই আশ্চর্য মনে হয় যে, কতভাবেই না প্রত্যাশিত ইঙ্গিত আসিয়াছিল! কিন্তু তখন আমরা শুনিয়াও শুনিতে চাহি নাই, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই।

বস্তুতঃ সর্ববিধ দুর্বলতা ও আসক্তি দূরে পরিহার করিলেও একটি বিষয়ে যেন ব্যতিক্রম ছিল। যাহা চিরকাল তাঁহার নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল, তাহা এখনও তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে পারিত। দেহান্তের অব্যবহিত পূর্বে রবিবারে জনৈক শিষ্যকে তিনি বলেন, "দেখ, এই-সব কাজই আমার চিরকাল দুর্বলতার জায়গা! যখন ভাবি, এ-সব নষ্ট হয়ে যাবে, তখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি।"

ঐ সপ্তাহের বুধবারে—সেদিন একাদশী—স্বামীজী সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত শিষ্যকে প্রাতঃকালীন আহার্য স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। আহারের মধ্যে ছিল কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদা ভাত এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা-করা দুধ। প্রত্যেকটি জিনিস পরিবেশন করিবার সময় সেগুলি সম্বন্ধে স্বামীজী হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। সর্বশেষ আহারান্তে তিনি নিজেই শিষ্যের হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন।

স্বভাবতই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, এ-সব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।"

কিন্তু তাঁহার উত্তর ছিল অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্যপূর্ণ—"ঈশা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।" শিষ্যের মুখে উত্তর আসিতেছিল, "কিন্তু সে তো শেষ সময়ে!" কথাগুলি যেন কিরূপে বাধিয়া গিয়া অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। ভালই হইয়াছিল। কারণ, এখানেও শেষ সময় আসিয়া গিয়াছিল।

এই কয়দিন স্বামীজীর কথাবার্তা ও চালচলনে কোন বিষাদগম্ভীর ভাব ছিল না। পাছে তিনি অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করেন—এই আশঙ্কায় ইচ্ছাপূর্বক কথাবার্তা যতদূর সম্ভব লঘু বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা হইত। তাঁহার পালিত পশু, বাগান, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রন্থ, দূরদেশে অবস্থিত বন্ধুবর্গ—এই সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইত। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমরা তাঁহার মধ্যে এক জ্যোতির্ময় সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতাম, বোধ হইত তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহার একটি ছায়া বা প্রতীক মাত্র তথাপি কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এত শীঘ্র শেষ সময় আসিয়া যাইবে—বিশেষতঃ—সেই ৪ জুলাই, শুক্রবারে—কারণ, সেদিন বহুবৎসর ধরিয়া তিনি যেমন ছিলেন, তাহার

অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর সুস্থ ও সবল দেখাইতেছিল, এবং সেজন্যই ঐ দিনটিকে মনে হইয়াছিল আনন্দময়।

ঐদিন তিনি বহু ঘণ্টা রীতিমত ধ্যানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর বহুক্ষণ ধরিয়া সংস্কৃত ক্লাস লন। অবশেষে মঠের ফটক হইতে বহুদূর পর্যন্ত বড় রাস্তা ধরিয়া বেড়াইয়া আসেন।

ভ্রমণান্তে তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। অতঃপর প্রথম হইতে যে মুহূর্তের কথা তাঁহার গুরুদেব ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, সেই শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল ; তারপর সেই ধ্যানরূপ পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া পরমধামে চলিয়া গেল—যেখান হইতে আর পুনরাবর্তন ঘটে না, শরীরটা ভাঁজ-করা পোশাকের মতো পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

উপসংহার

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে বড়দিনের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন শিষ্য ঐ উৎসব পালন করিবার জন্য কটকের নিকটস্থ খণ্ডগিরিতে সমবেত হন। সন্ধ্যাকাল; আমরা একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের গুঁড়ির চারিধারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপার্শ্বে পাহাড়গুলি উঠিয়াছে; পাহাড়ের গায়ে গুহা এবং খোদাই করা পাথরের মূর্তি, চারিদিকে বায়ুবিকম্পিত সুপ্ত অরণ্যানীর অস্পষ্ট শব্দ। অতীতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'ক্রিসমাস ইভ' (খ্রীস্টজন্মদিনের পূর্ব নিশা) যেরূপভাবে উদ্‌যাপিত হইত, স্থির করিয়াছিলাম, আমরাও সেইভাবে যাপন করিব। সাধুদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল মেষ তাড়াইবার মতো একগাছা লম্বা বাঁকানো ছড়ি, এবং আমাদের সঙ্গে ছিল সেন্ট লুক প্রণীত ঈশার জীবনী ও বাণী—যাহা হইতে দেবদূতগণের আবির্ভাব এবং জগতে প্রথম 'গ্লোরিয়া' (গৌরব গাথা) নামক স্তুতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্য রজনীর কল্পনা করিতে হইবে।

কিন্তু গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা তন্ময় হইয়া গেলাম; খ্রীস্ট জন্মের পূর্বরজনীর বর্ণনা পাঠেই শেষ হইল না; একের পর এক ঘটনা পড়া চলিতে লাগিল। এইরূপে সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশ আলোচিত হইবার পর অবশেষে মৃত্যু এবং সর্বশেষে পুনরুত্থান। আমরা গ্রন্থের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে উপনীত হইলাম, এবং এক এক করিয়া পড়া হইতে লাগিল।

কিন্তু গল্পটি আমাদের কানে এমন শুনাইতে লাগিল, যাহা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। সন তারিখযুক্ত এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আইনসঙ্গত এক দলিলের পরিবর্তে—যাহার সত্যাসত্যের যাচাই নির্ভর করে বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জলতা এবং পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার উপর—এখন মনে হইল ইন্দ্রিয়ের অগোচর এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে এমন কেহ যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে অর্ধ উচ্চারিত ভাষায় ঐ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পুনরুত্থানের বর্ণনাটি আর আমাদের মনে হইল না কোন ঘটনার বিবরণ, যাহা ত্যাজ্য অথবা গ্রাহ্য বলিয়া বোধ

হইতে পারে। চিরকালের নিমিত্ত উহা এক দিব্যানুভূতির বর্ণনারূপে স্থান লাভ করিল—যাঁহার ঐ অনুভূতি হইয়াছিল, তিনি উহাকে ভাষায় গ্রথিত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বদা সফলতা লাভ করেন নাই, এই পর্যন্ত। সমগ্র অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ, আকারে-ইঙ্গিতে বলা—যেন কেহ আগ্রহের সহিত কেবল পাঠকের নয়, কতকটা স্বয়ং লেখকেরই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে।

কারণ, আমরাও কি ঐরূপ এক পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস পাই নাই—পূর্বোক্ত ইতিহাসের সহিত যাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে? গুরুদেব স্বয়ং স্পষ্টভাবে এবং বিশেষ চিন্তাপূর্বক যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা সহসা মনে পড়িয়া গেল এবং উহার অর্থও বোধগম্য হইল—"জীবনে বহুবার আমি পরলোকগত আত্মাদের প্রত্যাবর্তন করতে দেখেছি; এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরবর্তী সপ্তাহে যে মূর্তি দর্শন করি, তা ছিল জ্যোতির্ময়!" যিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন, সেই প্রভুকে (ঈশাকে) আর একবার দর্শন করিবার জন্য শিষ্যগণের যে আকুল আকাঙ্ক্ষা আমরা কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম না, পরন্তু বিরহ-কাতর শিষ্যগণকে সান্ত্বনাপ্রদান ও আশীর্বাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে পুনরাগমনের জন্য সেই অবতারপুরুষের যে গভীরতর আকাঙ্ক্ষা—তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম।

"পথপার্শ্বে যতক্ষণ তিনি আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ আমাদের হৃদয় কি তীব্র আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল!"—আমাদের গুরুদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আমরাও কি কত মুহূর্তে বাইবেলে উক্ত ঐরূপ অপূর্ব অনুভূতির অজস্র প্রমাণ পাই নাই! সেই সব মুহূর্তে আমাদের প্রায় দৃঢ় ধারণা জন্মিত, তিনি সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন!

বাইবেলে বর্ণিত, "রুটিপ্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার সময় তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন"—উহাও সত্য। কখনও একটু আভাস, কখনও একটি কথা, কখনও বা এক ক্ষণস্থায়ী মধুর অনুভূতি, অথবা সহসা অন্তরে জ্ঞানালোকের চকিত প্রকাশ—প্রথম কয়েক সপ্তাহে এই সকলের কোন একটি বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠিত; মনে হইত ঐ বুঝি আকাঙ্ক্ষিত দর্শন মিলিয়াছে, ঐ তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংশয় ও নিশ্চয়তা উভয়ই মিশিয়া থাকিত।

সে রাত্রে খণ্ডগিরিতে আমরা পুনরুত্থানের বর্ণনার সেই অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়া গেলাম, কাহিনীর যে-সকল অংশ মনে হয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া অপর কেহ পরবর্তী কালে সংযোজন করিয়াছে। পুরাতনের উপর নূতন

চূণকাম করা বিবরণের প্রাচীনতর অংশের উপরেই আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছিল—সেই সাদাসিধা প্রাচীন বিবরণ, বার বার চকিতের ন্যায় প্রভুর দর্শন ও অদর্শনজনিত আনন্দ-বিষাদের করুণ চিত্রে যাহা পূর্ণ ; যে বিবরণের মধ্যে দেখা যায় কতবার প্রভুর একাদশ শিষ্য একত্র হইয়া অস্ফুটস্বরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেছেন, "দেখ, দেখ, সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন," এবং পরিশেষে তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া সকলে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

পড়িতে পড়িতে মনে হইল, ঐ প্রাচীন কাহিনীতে ঈশার স্থূলদেহের পুনরাবির্ভাবের কথা আদৌ বিবৃত হয় নাই ; উহা শুধু আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভু ও শিষ্যগণের ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন, জ্ঞান ও প্রেমের পুনরাবর্তন, প্রার্থনাকালে ক্ষণিক তন্ময়তালাভের বিবরণ। প্রভু তখন স্বীয় জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, অন্তরতম এক সূক্ষ্ম আকাশে বিরাজমান , ইন্দ্রিয়রাজ্যে আবদ্ধ জীব আমরা ঐ স্তরের কথা ধারণাও করিতে পারি না।

আবার ঐ-সকল ঘটনা এত স্থূল ছিল না যে, সকলে সমভাবে সেই অর্ধশ্রুত, অর্ধদৃষ্ট ক্ষণিক ইঙ্গিত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। স্থূলদৃষ্টিতে উহা একেবারেই ধরা পড়ে নাই। এমনকি যাঁহারা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহাদের নিকটেও ঐ-সব বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল ; আগ্রহ সহকারে আলোচনাপূর্বক সমগ্র অংশ ক্রমানুসারে একত্র করিয়া অনুধাবন এবং সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। খ্রীস্টের শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অতি অন্তরঙ্গ এবং সর্বজনস্বীকৃত, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ হয়তো উহা একেবারেই বিশ্বাস করেন নাই। তথাপি সেই রাত্রে খণ্ডগিরির গুহা ও অরণ্যের মধ্যে খ্রীস্টানদের এই পুনরুত্থান-কাহিনী পড়িতে পড়িতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ইহার মধ্য দিয়া একটি সত্য সূত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে ; বিশ্বাস হইল, কোথাও কোন সময়ে এক মানবাত্মা প্রকৃতই এই ক্ষণিক উপলব্ধির স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, এবং আমরা তাহাই অনুধাবন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। এইরূপই আমরা বিশ্বাস করিলাম, এইরূপই অনুভব করিলাম, কারণ অতীব ক্ষণস্থায়ী হইলেও ঐ সময়ে ঐরূপ ধরনেরই এক অনুভূতি আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

ঈশ্বর করুন, আমাদের গুরুদেবের এই জীবন্ত সত্তা, যাহা হইতে আমাদের বঞ্চিত করা স্বয়ং মৃত্যুরও সাধ্য ছিল না, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট মাত্র স্মরণীয় বস্তু না হইয়া জ্বলন্ত জাগ্রতভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকে।